প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

মানুষের আবির্ভাব-লগ্ন থেকেই কাহিনীর সুরু। সাহিত্যের সুরুও কাহিনী দিয়ে, সাহিত্যে অন্যান্য উপাদান এসেছে পরে। আজকের কথাসাহিত্য যে পরিমাণে আধুনিক, তার ইতিহাস তেমনই পুরোণো। উপাখ্যান বা গল্পের তুলনায় উপন্যাসের ইতিহাস বরং সাম্প্রতিক কালের। মানবজীবনের অগ্রগতির তালে তালে সাহিত্যকেও এগিয়ে যেতে হয়। তেলুগুভাষী জনজীবনের ক্রমপরিবর্তনের রূপটিকে ফুটিয়ে তুলেছে তেলুগু গল্প।

তেলুগু সাহিত্যের পরম গৌরব যে মহাকবি গুরজাড আপ্পারাও তেলুগু ভাষায় গল্প রচনাশৈলীর প্রথম পথিকৃৎ। তেলুগু গল্পের ইতিহাস ষাট বছরের বেশি নয়। পাশ্চাত্য সাহিত্যের দৃষ্টান্তই এই অভিনব রচনাভঙ্গীর মূল উৎস। এই রচনা-নৈপুণ্যই পাঠককে আবিষ্ট করে রাখে। উন্মেষ থেকে আধুনিক কাল অবধি গল্প রচনাকে নিত্য-নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে পাঠকসমাজের কাছে তুলে ধরেছেন কয়েকজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ কাহিনীকার।

আধুনিক তেলুগু গল্পের কারুকার্য দেখা যায় 'স্থালীপুলাকব্য' গল্পে। তেলুগু গল্পের কথা মনে হলেই কয়েকজন মনীষীর কথা মনে পড়ে। তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন না করে এই প্রসঙ্গে কিছু লেখাই চলে না।

'ব্যারিষ্টার পার্বতীসম'-এর লেখক মোক্ষপাটি নরসিংহ শাস্ত্রী, 'বটীরাবু কথলু' (বটীরাওর গল্প)-এর লেখক শ্রীচিন্তা দীক্ষিতুলু, 'কান্তম্ কথলু' (কান্তমের কাহিনী)-র রচয়িতা শ্রীমুনিমানিকয়ম নরসিংহ রাও, 'পিতলের দরজা'র লেখক শ্রীভেলুরি শিবরাম শাস্ত্রী, 'এমি অনুবন্ধস্' (এটা কিসের অনুবন্ধন ?) শীর্ষক অবিস্মরণীয় গল্পের লেখক শ্রীবিশ্বনাথ সত্যনারায়ণ, 'অসংভেরী' 'অল্লো নেরেড়ু' 'মুনি গোরিন্তা' প্রভৃতি কাহিনীর স্রষ্টা শ্রীমল্লাদি রামকৃষ্ণ শাস্ত্রী, 'অরিকালু ক্রিন্দ মণ্টলু' (পায়ের চেটোর জ্বলুনি) কাহিনীর যশস্বী লেখক শ্রীপাদ সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রী, 'করুণকুমার' গল্পের লেখক করুণকুমার— এঁরা সবাই আধুনিক তেলুগু গল্পকে হৃদয়গ্রাহী করে তুলেছেন। এঁদের সঙ্গেই 'সাহিতী' পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যার লেখক শ্রীত্রিপুরারি মটুলা বীর রাঘবস্বামী, শ্রীকোডভটি গণ্টিভেঙ্কট সুব্বারায়ার নামও উল্লেখযোগ্য।

গুরজাড-এর সময় থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত তেলুগু গল্পের যে বিবর্তন তাতে কাহিনীর পটভূমি, রচনাশৈলী, শিল্পচাতুর্য এবং ভাষাসৌকর্যের যথেষ্ট শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছে। কাহিনী এখন অনেক বেশি গতিময় ও সুষমামণ্ডিত। এই সংকলনে যে সব গল্প স্থান পেয়েছে তাদের মধ্যেই তেলুগু গল্পের বৈচিত্র্য ফুটে উঠেছে। দেশীয় কিংবা অন্তর্দেশীয় গল্পের মাপকাটিতে তেলুগু গল্প নীরস নয়।

প্রকাশিত সহস্র সহস্র তেলেগু গল্পের মধ্য থেকে এই সংকলনের জন্য প্রতিনিধিস্থানীয় গল্পগুলি নির্বাচন করা বড় সহজ নয়। একটি-মাত্র সংকলনের মাধ্যমে এ কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে এরকম চিন্তা করাও উচিত হবে না। তেলুগু গল্পের প্রতি সুবিচার করতে হলে গত ষাট বছরকে ছয়টি পৃথক ভাগে বিভক্ত করে প্রত্যেক দশকের জন্য

এক একটি সংকলন বার করা উচিত। আমাদের ধারণা, এই সংকলনে পাঠকরা তেলুগু গল্পের ধারা ও প্রকৃতির শুধুমাত্র একটু পরিচয় পাবেন।

ন্যাশনাল বুক ট্রাষ্ট প্রতিটি ভারতীয় ভাষার সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যকৃতি অন্য ভাষাভাষী পাঠক সাধারণের কাছে পরিচিত করার উদ্দেশ্যে এই 'আদান-প্রদান' সিরিজের প্রবর্তন করেছেন ও তাতে তেলুগু গল্প প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এঁদের দেওয়া গল্পচয়নের নির্দেশ অনুযায়ী সাতাশটি গল্প এই সংকলনে প্রকাশ করা হ'লো।

স্বর্গীয় গোপীচন্দের গল্প দিয়ে এই সংকলনের সুরু। আর নার্ল চিরঞ্জীবীর গল্প দিয়ে এর শেষ। দুজনেই তেলুগুভাষী কৃষকদের গ্রাম্যজীবনকে ফুটিয়ে তুলেছেন। যে সব লেখকের গল্প এতে আছে তাঁদের পরিচিতি এই সংকলনের অন্যত্র দেওয়া হয়েছে। ন্যাশনাল বুক ট্রাষ্টের উদ্দেশ্যকে সফল করতে এই সংকলন কিছুটা সাহায্য করবে। কিন্তু আগেই বলেছি, সবদিক বিচার করলে এই সংকলন সম্পূর্ণতার দাবী করতে পারে না। স্থানাভাবে অনেক গল্পই এই সংকলনের অন্তর্ভুক্ত করা যায়নি। আক্ষেপ এইখানেই যে অনেক ভালো ভালো গল্প বাদ পড়ে গেল। এই সংকলনের গল্পগুলি পড়ে পাঠকরা যদি এতটুকুও আনন্দ পান, তবে আমাদের প্রয়াস সার্থক।

পুরাণম্ সুব্রহ্মণ্য শর্মা
বাকাটি পাণ্ডুরঙ্গ রাও

সূচীপত্র

ভূমিকা পাঁচ

মমতা : গোপীচাঁদ 1

নৌকোযাত্রা : পালগুম্মি পদ্মরাজ্ 10

দোষ-গুণ : গুডিপাটি ভেঙ্কটচলম 24

অনুতাপ নয় : বুচ্চিবাবু 55

পার্বতী-পরিণয় : কোডক্টিগণ্টি কুটুম্ব রাও 73

আম গাছ : রাজকোণ্ড বিশ্বনাথ শাস্ত্রী 86

আশা-কিরণ : বাল গঙ্গাধর তিলক 102

বেহালা : চাগণ্টি সোময়াজুলু 118

পূর্ণাহুতি : পেদ্দিভোটল সুব্বরামইয়া 132

ঠাকুরের পাল্কী : অবসরাল রামকৃষ্ণ রাও 151

যন্ত্রজীবি : কোম্মূরি বেনুগোপাল রাও 167

কাক : পুরাণম্ সূর্যপ্রকাশ রাও 194

উপহার : মুললপূডি ভেঙ্কটরমন 207

সুখী হাওয়ার ছোঁয়া : মধুরান্তকম্ রাজারাম 220

ঘুমোচ্ছি : শ্রীমতী অব্বূরি ছায়া দেবী 232

খালি বোতল : স্মাইল 241

এক লাখ : বীরাজী 255

নেউলের গল্প : বলিওয়াড কান্তা রাও 282

থাঙ্কস্ ফর দি পি. এম. : শ্রীমতী বীণা দেবী 296

সূচিপত্র

মরীচিকা : শ্রীমতী আচন্ট শারদা দেবী 319
নো রুম : কালীপটনম্ রামা রাও 330
হাতলওয়ালা চেয়ার : শ্রীপতি 357
কাজের খোঁজে : আদি বিষ্ণু 373
বাংলো বাড়ী : শ্রীমতী মালতী চন্দূর 387
আমরা আবার ররযাত্রী : শ্রীমতী তুরগা জানকী রাণী 400
ছেঁড়া চাদর : বোম্মিরেড্ডি পল্লি সূর্যা রাও 406
বটের ছায়া ও বেলফুলের গাছ : নার্ল চিরঞ্জীবী 414

লেখক পরিচিতি 430

মমতা

লাঠিতে ভর দিয়ে মামা জোগায়য়া খালের ধারে একটা জাম গাছের ছায়ায় এসে বসল। রোদে চোখের ওপর হাতের আড়াল দিয়ে নিজের খেতের দিকে তাকাল। খেতের ধারের বাবলা গাছগুলো তার বহুদিনের চেনা। জোগায়য়ার সঙ্গেই এরা জন্মেছে, বড় হয়েছে। একবার হালের জন্যে বাঁশের দরকার। দুটো গাছ কেটে ফেলে। আজও ঐদিকটায় তাকালে তার বড় ফাঁকা লাগে। মনে হয় নিজের হাতে মানুষ-করা দুটো ছেলে তার যেন চলে গেছে।

একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল। মামা জোগায়য়া মাথার পাগড়িটা খুলে গাছের তলায় বিছিয়ে বসে। তার তিন ছেলে ও দুই মেয়ে। বড় নরসইয়া খেতখামার নিয়ে থাকে। মেজ দোরইয়া কাপড়ের দোকান দিয়ে দু'পয়সা রোজগার করতে শিখেছে। ভেঙ্কট সুব্বাইয়া সবার ছোট, দুপাতা ইংরিজি পড়েছে।

সবাই বাবাকে খুব ভালোবাসে। বাপেরও ছেলেমেয়েঅন্ত প্রাণ। দরকার হলে ছেলেমেয়েদের না দেখেও একদিন থাকতে পারে, কিন্তু নিজের খেত না দেখে এক মুহূর্তও নয়। তার সব ছেলেমেয়েই খেতের কাজ করুক, এই তার ইচ্ছে। তার ধারণা, খেতের কাজ করলেই ওদের জীবন সার্থক হবে। মেজ ছেলের ওপর তাই একটু চটা। বলে 'ছেলে আমার ভালই ছিল, বউ'য়ের কথায় বিগড়ে গেছে।'

তার তখন প্রায় একশো একর জমি। নিজে হাড়ভাঙা খাটুনি খেটেই জমি বাড়িয়েছে। তার কাছে জমির চেয়ে বেশি প্রিয় আর কিছুই নয়, জমি প্রাণের চেয়ে প্রিয়। জমির দেখাশোনাতেই তার সব আনন্দ। ভালো ফসল ফলাতে সে সব-কিছুই করতে রাজী। প্রাণ হাতে নিয়ে আশেপাশের জমির বাঁধ ভেঙে দিয়ে নিজের খেতে জল আনে। 'কই দেখি, কে বাধা দেয়, সাধ্যি থাকে তো এগিয়ে আয়' বলে মোটা একটা লাঠি হাতে নিয়ে জমির আলের ওপর দাঁড়িয়ে যখন চিৎকার করে তখন সারা গাঁ ভয়ে থরহরি কম্প। শুকনো জমি যখন সোঁ সোঁ করে জল টেনে নিতে থাকে তখন তার মন পরম তৃপ্তিতে ভরে ওঠে। কোলে করে শিশুকে দুধ খাইয়ে মায়ের দেহমন যেরকম তৃপ্তি পায় এও অনেকটা তাই।

ছেলেমেয়েরা বড় হয়েছে। বলে, 'আমরা এখন বড় হয়েছি, তুমি খেত নিয়ে এত পরিশ্রম কর কেন? এখন একটু আরাম করো, নিশ্চিন্তে ভগবানের নাম জপো।' জোগয়য়া মনে মনে ভাবে, 'এরা এখনও সত্যিই ছেলেমানুষ, এই খাটুনিতেই আমার কত আনন্দ এরা কি করে বুঝবে।'

প্রায় মাসখানেক হল তার বউ অসুস্থ। ক্রমশই তার অবস্থা খারাপের দিকে যায়। গত দশ দিন ধরে যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে। জোগয়য়ার কোনো হুঁসই নেই। এ নিয়ে বাড়ীর কেউ কিছু বললে কথা এড়াতে শুধু বলে, 'রোগ মানুষের হবে না তো কার হবে?'

ফসল কাটার সময়। তার এখন নিঃশ্বাস ফেলার যো নেই। এত তাড়াতাড়ি বউয়ের এত বাড়াবাড়ি অসুখ হবে জোগয়য়া ভাবতেও পারে নি।

'বাবা, তুমি মার কাছে একটু বোসো, আমি খেতের কাজ দেখছি।'

বড়ছেলে অনুনয় করে। কিন্তু জোগয়য়া বাড়ীতে স্থির থাকতে পারে না। এমনিতেই ভীষণ জলকষ্ট, কে জানে কে কখন কোথায় জল আটকে দেবে। বড় ছেলে খুবই হুঁসিয়ার, কিন্তু স্বভাবটা একটু নরম। কেউ একটু রুখে দাঁড়ালে পিছু হটে আসে। সমস্ত খেতে ঠিক মতো জল দিতে না পারলে, খেত করে কোনো লাভ নেই তা জোগয়য়া জানে। তাই সাত-পাঁচ ভেবে জোগয়য়া গাঁয়ের বৈদ্যকে ডেকে আনে। চারটে গুলি আর একটু জল বউকে খাইয়ে দেয়। বলে, 'চোখ বন্ধ করে একটু শুয়ে থাকো, এক্ষুনি ঘুম এসে যাবে।'

নিজে খেতমুখো হয়। গাঁয়ের বাইরে তেঁতুল গাছের কাছ বরাবর পৌঁছতেই একজন লোক বড় ছেলের খবরটা তাকে জানায়। ওদিকের খেতের লোকেরা বর্শা ও বল্লম নিয়ে বড়বাবুকে মারার জন্যে উঁচিয়ে আছে। বড়বাবুর হাত উঠছে না।

জোগয়য়া তাড়াতাড়ি খেতের দিকে পা চালায়। খেতে পৌঁছেই খালের বাঁধ ভেঙে দেয়। হু হু করে খেতে জল ঢুকে পড়ে। বর্শা নিয়ে যারা তার বড় ছেলের দিকে তেড়ে এসেছিল তারা চুপচাপ দাঁড়িয়ে দেখে, কিছুই করতে পারে না। খেতে সোঁ সোঁ করে জল ঢুকতে থাকে। এই দেখে জোগয়য়া সব-কিছু ভুলে যায়। খেতের আলের ওপর দাঁড়িয়ে পড়ে।

'মা কেমন আছে?' নরসাইয়া জিজ্ঞেস করে

'ঐ একই রকম।'

'কষ্টটা একটু কমেছে?'

'একটু কমেছে নিশ্চয়।'

'আমি তা হলে বাড়ী ফিরি।' নরসইয়ার কথা শুনে জোগয়য়া চমকে ওঠে। বলে, 'পুরোটা খেত জলে না ভরলে কি করে যাব?'

'কিন্তু ঘরে যে কেউ নেই, বাবা, কখন কি হয়, বলা যায় না তো?'

'তুই চলে যা, আমি এখানে থাকবখন।'

বাবা যে এখান্ থেকে এখন যাবে না নরসইয়া তা খুব ভালো-ভাবেই জানে। ব্যাপারটা নরসইয়ার মোটেই ভালো লাগে না। কিন্তু আর উপায় নেই দেখে বাবাকে ছেড়ে বাড়ীমুখো হয়।

কাকটা কা কা করে ডেকে চলেছে। জোগয়য়াকে তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরতে হবে। বউ আর বেশিক্ষণ বাঁচবে না সে কথা জোগয়য়া জানে। কিন্তু খেতের একদিকটা তখনও যে জলে ভরে নি! সারা খেতে জল না এলে জোগয়য়া যায় কি করে!

খানিক পরেই সারা খেত জলে ভরে গেল। বউকে দেখতে জোগয়য়া বাড়ীর দিকে ছুটল। বাড়ী ফিরে দেখে বউ এখন যায় তখন যায় অবস্থা। তখনও সে সংসারের কথা বলে চলেছে। 'ছোটুর বিয়ের জন্যে কতবার তোমায় বললাম, কিন্তু আমার কথায় তুমি গা করলে না।' স্বামীর কাছে অনুযোগ করে। ছোট বউ তার কথা শোনে না, এ নিয়েও কতবার বলেছে। 'ইঁদুর কাটছে···।' আবার কাউকে বলে, 'ইঁদুরের গর্ত বন্ধ করে দাও, যাতে ইঁদুর না বাইরে আসে।' কখনও বা ধোপাকে বলে, 'কাপড়ের মাড় ঠিক হচ্ছে না।' মাখন তোলার জন্যে ধড়মড়িয়ে উঠে পড়ে। বলে, 'বড় বউ মাখন তুলতে জানে না, দইয়ে অর্ধেকটা মাখন লেগে থাকে।' ওর এক চিন্তা—ও মরলে এই সংসারের কি হাল হবে?

'এ সব কথা ভেবে আর কি হবে,' জোগয়য়া বউকে সান্ত্বনা দেয়। 'এখন একটু আরাম করো।'

কিন্তু কথা তার কানে যায় না। যতক্ষণ বেঁচে ছিল, অনর্গল সংসারেরই কথা বলেছিল। মুখ দিয়ে আর কথা সরে না, জোগয়য়ার

হাতটা জোরে চেপে ধরে। জোগয়য়ার হাত ধরেই সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে।

আজ ঠিক এক মাস হল জোগয়য়ার বউ মারা গেছে। বউয়ের স্বাস্থ্যের দিকে নজর দেয় নি ; নিজের জীবনকে বিপন্ন করে জোগয়য়া যে খেতে সেচ করেছিল, তাতে আজ ফসল ফলেছে। চাষীরা খেত পরিষ্কার করতে ব্যস্ত। মনের আনন্দে মেয়েছেলে সবাই মিলে একসঙ্গে গান ধরেছে।

জোগয়য়া জাম গাছের তলায় একভাবে বসে। আগের মতো আর মনের জোর নেই। মারা যাবার সময় বউ সংসার সংসার করেই গেছে। আজও জোগয়য়ার মনে পড়ে সে-সব কথা। জোগয়য়া আগেই বুঝতে পেরেছিল যে ও আর বাঁচবে না। কিন্তু তবু এমন করে বলত যেন মনে হত, এই ঘুম থেকে উঠে বুঝি বউ আবার কাজে লেগে যাবে। জোগয়য়া ভেবে পায় না— দুনিয়া ছেড়ে চলে যাবার সময় এরা এত কথা বলে কেন? এ-সব কথায় কারুরই তো কোনো লাভ নেই। সবাইকেই তো একদিন যেতে হবে। খেত থেকে গান ভেসে আসে।

জোগয়য়া একবার খেতের চারিদিকটা ভালো করে দেখে নেয়। কদিন আগেই তার নাতি তার সঙ্গে খেত দেখতে এসেছিল। ‘দাদু, আমাদের খেত কোথায়?’ নাতি আব্দার করে। ‘সামনে যতদূর দেখতে পাস সবই আমাদের খেত, বুঝলি ব্যাটা!’ জোগয়য়া সস্নেহে বলেছিল।

একশো একর জমি। সমুদ্রের পাড় যেমন দেখা যায় না, জোগয়য়ার জমিরও তাই। নাতিকে জমি দেখানোর সময় জোগয়য়ার মন আনন্দে ভরে ওঠে। বলদ বিক্রি করতে প্রথম সে এই গ্রামে

এসেছিল। যে বাড়ীতে বলদজোড়া বিক্রি করেছিল, পরে সেই বাড়ীরই জামাই হয় জোগয়য়া। বিয়ের পর মাত্তর কয়েকদিন সে শ্বশুরবাড়ী ছিল। তার ব্যবহারে খুসী হয়ে শ্বশুর-শাশুড়ী তাকে ঘর-জামাই করে রাখে। সেই থেকেই জোগয়য়া খুব পরিশ্রম করত। তার বিয়ের সময় ওর শ্বশুরের মাত্তর পাঁচ একর জমি ছিল। দেখতে দেখতে দশ বছরের মধ্যে হাড়ভাঙা খাটুনি খেটে গতর জল করে জোগয়য়া পাঁচ একর জমি দশ একরে দাঁড় করাল। জোগয়য়া শ্বশুরের প্রিয়পাত্র হয়ে উঠল। মরণকালে শ্বশুর জোগয়য়াকে কাছে ডেকে বলেছিল, 'জোগয়য়া, তোমায় আমি আশ্রয় দিয়েছিলাম, তুমি আমার মান রেখেছ।' শুনে জোগয়য়ার মনে হয়েছিল তার সব পরিশ্রম আজ সার্থক। শ্বশুর মারা যাবার আগেই জোগয়য়া পাঁচ একর জমিকে বাড়িয়ে একশো একর করেছিল। খেটেখুটে একটু একটু করে সে জমি বাড়িয়েছে। তখন যে আনন্দ পেত তা আজ আর নেই। রোজ খেতে যাওয়া, খেতটা ঘুরে খুঁটিয়ে দেখা আর চাষীদের হুকুম দেওয়া— এখন এটাই তার কাজ। কাজে আর তার আনন্দ নেই, শুধু রোজকার অভ্যেস-মত কাজ করে যাওয়া।

মামা জোগয়য়া আজ জাম গাছে ঠেস দিয়ে বসে। দুপুর হয়ে এল, জাম গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে রোদ তার মুখে এসে পড়েছে। গরম লাগতে চোখ মেলে দেখে। খেতে চাষীদের দেখতে না পেয়ে তাড়াতাড়ি উঠে পড়ল। দেখে চাষীরা গাছের ডালে ঝোলানো পুঁটলি থেকে খাবার বের করে খাচ্ছে। কেউ বা খাচ্ছে, কেউ বা আবার পাগড়িটা খুলে মাথায় দিয়ে শুয়ে আছে।

'আরে ওঠো! উঠে পড়ো!' জোগয়য়া হাঁক দেয়। এত বয়স,

তবু বাবুজী চারিদিকে কত খেয়াল রাখেন, বলে সবাই হেসে ওঠে।

'বাবুজী, এই সবে খেতে বসেছি,' একজন অনুনয় করে বলে। তারপর একে একে সবাই খেতের দিকে চলে যায়।

জোগয়য়া একবার গ্রামের দিকে তাকাল। তুপুরে জাম গাছটার তলায় বসে সেও খাবার খায়। তার নাতনী রোজই তার জন্যে খাবার নিয়ে আসে, দূরে খাবার কৌটোটা মাথায় নিয়ে তার নাতনীকে আসতে দেখে। আকাশে ঘন মেঘ, বৃষ্টির সম্ভাবনা। নিজে ভিজলে তুঃখ নেই, কিন্তু যদি নাতনী ভিজে যায়…! এখনই জোরে বৃষ্টি এলে তাকে কাঁঠাল গাছের তলার ঐ চালাঘরে আশ্রয় নিতে হবে। চালাঘরটা আজকের নয়। যখন জোগয়য়া এই খেত কিনেছিল তখনকার। ঝড়-জল সব মাথায় করে আজও চালাটা খাড়া হয়ে আছে।

'দাত্থ, এই নাও, তোমার খাবার' বলতে বলতে নাতনী কৌটোর ওপরকার ঢাকনাটা খুলে দেয়। একদিকে গোঁগূরের (এক রকমের শাক) চাটনী, দেখতে কালোই, চকচক করে। অন্যদিকে লাল আমের আচার, জিভে জল আসে। তুয়ের মাঝে সাদা চালের ভাত।

'দাত্থ, তুমি খেয়ে নাও, সেই ফাঁকে আমি একবার খেত ঘুরে আসি' বলেই সে খেতের দিকে দৌড় দিল। মামা জোগয়য়া আস্তে আস্তে উঠে বসল। জামাকাপড় ঝেড়ে পরিষ্কার করে নেয়। পাগড়িটা মাথায় লাগিয়ে লাঠি ভর দিয়ে খালের দিকে আস্তে আস্তে এগিয়ে যায়। খালের জলে মুখহাত ধুয়ে আবার ধীরে ধীরে ফিরে এসে গাছের ছায়ায় বসে। লাঠিটা পাশে রেখে খাবার কৌটোটা কাছে টেনে নেয়। আঙুলে আমের আচার তুলে

নিয়ে মুখে দিয়ে টাক্‌না দেয়। কিন্তু টাক্‌নার শব্দ হয় না। অভ্যেসমত সেই স্বাদই পায়।

চাষীরা খেতে আগাছা তুলতে ব্যস্ত। মামা জোগয়য়ার নাতনী খেতের ধারে বসে এই-সব দেখছিল। চাষীরা তাকে ছোট মেম-সাহেব বলে ক্ষেপায়। ঘাঘ্‌রাটা পায়ে পায়ে লেগে যাচ্ছিল। তাই তার একটা দিক হাতে ধরে খেতের আল দিয়ে সে দাত্থর দিকে ছুট মারল। পথে বাপের সঙ্গে দেখা।

'জরির ঘাঘরাটা পরে খেতে এসেছিস কেন মা, এখানে যে কাদা আছে?'

'আমি পরি নি বাবা, দাত্থ আমায় এটা পবে আসতে বলেছিল। ঘাঘরা পরে আমায় কেমন দেখায়, দাত্থ তাই দেখতে চেয়েছিল' মেয়ে জবাব দেয়।

'ও তাই বুঝি, দাত্থ তোমায় দেখেছে তো?'

'কই না, ভুলেই গেছে।'

'হ্যাঁরে, দাত্থ খেয়েছে তো?'

'খাবার তো দিয়ে এসেছি।'

'দাত্থ কোথায়?'

'ঐ জাম গাছের তলায়।'

দুজনেই জাম গাছের দিকে এগিয়ে গেল। চারিদিকে ঘন কালো মেঘ; এইবুঝি বৃষ্টি নামে। বাপের এই ষাট বছর বয়সে খেতের কাজকর্ম দেখাশোনা করাটা নরসইয়ার মোটেই ভালো লাগত না। খেতে খাবার নিয়ে এসে খাওয়াটা সে একেবারেই বরদাস্ত করতে পারে না। নরসইয়া গ্রামের পঞ্চায়েত বোর্ডের সভাপতি। নিজের পদমর্যাদা নিয়ে থাকতে চায়। কিন্তু এ-সব

ভেবেই বা লাভ কি ? বাবা তো কোনো কথাই শুনবে না। উল্টে আবার প্রশ্ন তোলে, 'খেত খামারে খেলে কি মানইজ্জত চলে যায় ?'

হঠাৎ মেঘ ডেকে ওঠে ; বিদ্যুত চমকায়। ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি পড়ে। বৃষ্টির জলের কি রকম স্বাদ তা দেখতে নরসইয়ার মেয়ে জিভ মেলে ধরে। নরসইয়া জামগাছের দিকে জোরে পা চালায়। দেখে, বাবা তখনও গাছে হেলান দিয়ে বসে।

লাঠি আর পাগড়ি, দুই-ই পাশে পড়ে। চোখ বুঝে বাবা কি যেন ভাবছে। চিন্তার কিছু থাকুক বা না থাকুক, ভাবনা তো হয়ই। মুঠোয় কিছু নিয়ে শুঁকছিল মনে হয়। মুঠোয় কি আছে ! ফুল ? না। দোক্তা ? না। মাটি··· শুধু মাটি। জামগাছের তলার ভিজে মাটি।

'বাবা ! বাবা !!' সাড়া পায় না। আবার ডাকে, 'বাবা !'

'কি বাবা !'··· জোগয়য়া ক্ষীণ গলায় জবাব দেয়।

হাতের মুঠো খুলে যায়, হাতটা মাটিতে এলিয়ে পড়ে। হাতের মাটি ঝরে পড়ে, মাটিতেই মিশে যায়।

'বাবা ! বাবা !!'

আর সাড়া মিলল না।

নৌকোযাত্রা

সূর্য অস্ত গেছে। চারিদিকে যেন একটা বিষণ্ণতা ছড়িয়ে পড়েছে। নদীর বুকে নৌকোটা ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছে। নৌকোর গায়ে ধাক্কা খেয়ে কলকল রবে বয়ে যায় জল। চারিদিক নিঝুম, নিস্তব্ধ। 'ঝুমঝুম' একটানা শব্দ, দেহমনকে যেন আচ্ছন্ন করে ফেলে, মনে একটা শিহরণ জাগায়। জীবনের অন্তিম সময়ের একটা নৈরাশ্যের ছায়া যেন ফুটে ওঠে। দূরের গাছগুলো এগিয়ে আসে, সামনের গাছগুলো এলোচুল পেতনীর মত পেছনে সরে যেতে থাকে। নৌকোটা নিশ্চল, নদীর পাড়ই যেন এগিয়ে চলেছে। নদীর জলের ভেতর দিয়ে অন্ধকারের বুক চিরে দৃষ্টি মেলে ধরি। অসহায় আকাশের তারা ঢেউয়ের দোলায় দুলতে দুলতে চোখ খুলেই যেন ঘুমিয়ে পড়েছে।

এতটুকু হাওয়া নেই। দাঁড় টানার সঙ্গে সঙ্গে পালের দড়ি কখনও ঢিলে হয়ে যায়, কখনও বা দড়িতে টান পড়ে। নৌকোর পেছন দিকে আঙ্গেঠিতে আগুন জ্বলছে। থেকে থেকে আগুনটা বাড়ে আবার কমে। নৌকোয় খানিকটা জলও ঢুকে পড়েছে। বালতি করে একটা ছেলে তা বাইরে ফেলে দিতে থাকে। নৌকোটায় রয়েছে ধান, গুড়, নুন আর তেঁতুলের কয়েকটা বস্তা। আমি শুয়ে আছি ছাদে। ভেতর থেকে চুরুটের গন্ধ ভেসে আসে। কয়েকজনের গলার আওয়াজও পাচ্ছি। মুন্সী যে ঘরটায় বসে আছে সেখানে

ছোট একটা প্রদীপ টিম্‌টিম্‌ করে জ্বলছে। নৌকো এগিয়ে চলে। •কে যেন ডাক দেয়, 'ওহে মাঝিভায়া, নৌকোটা এদিকে ভেড়াও না একবার।'

পাড়ে লাগতেই দুজন লোক নৌকোয় উঠে পড়ল। নৌকোটা একটু ঝুঁকে পড়ে।

'আরে ভাববার কিছু নেই, আমরা ছাদে বসব।' একটি মেয়ের গলার স্বর শোনা গেল।

'এতদিন কোথায় ছিলি? একেবারে যে পাত্তা নেই।' পালের ওধারে-বসা লোকটা প্রশ্ন করে।

'সোয়ামীর সঙ্গে বিজয়নগর, বিশাখাপত্তনম ঘুরে এলাম। অপপন্নার টিলাতেও গেছিলাম।'

'এখন কোথায় চল্‌লি?'

'মণ্ডপাক। ঠাকুরপো ভালো তো? পুরানো মুনশিজীই তো আছেন?'

'হ্যাঁ।'

সঙ্গের পুরুষটি ছাদের ওপর উপুড় হয়ে শুয়েছিল। মুখে একটা চুরুট। মুখ থেকে চুরুটটা নিয়ে ভদ্রমহিলা নিভিয়ে দিল।

'ওগো, উঠে ঠিক করে বোসো-না।'

'চুপ কর··· খান্‌কী। তুই কি ভেবেছিস আমি নেশা করেছি? মাজা ভেঙে দেব।' বলে পাশ ফিরে শুল।

একটা কাপড় দিয়ে মেয়েটি তাকে ঢেকে দিল। এবার নিজেই একটা চুরুট ধরাল। দেশলায়ের আলোতে ওর মুখটা দেখলাম। কালো রঙ, আগুনে লাল হয়ে উঠেছে।

গলার স্বরে পুরুষের গাম্ভীর্য। কথা বলার মধ্যেও বেশ-একটা আত্মীয়তার সুর, মনে ভরসা জাগায়। চেহারায় আকর্ষণ করার মতো

কিছুই নেই। এলোমেলো চুল, মুখে বার্ধক্যের ছাপ। রঙটা কালো বলেই মনে হল, অন্ধকারে সঠিক ঠাহর হল না। চোখ দুটো জ্বল জ্বল করছে। দেশলায়ের আলোয় সে আমায় দেখল, আমি তার পাশেই শুয়ে।

'অরে, পাশে কে শুয়ে আছে রে!' বলে সঙ্গের পুরুষটাকে ধাক্কা দিয়ে তুলল।

'নিকুচি করেছে, এসে শুয়ে পড় মাগী। বেশি চেঁচামেচি করেছিস তো পেটের নাড়িভুঁড়ি টেনে বার করে দেব।' লোকটা অনেক কষ্টে একটু নড়েচড়ে আবার শুয়ে পড়ল।

এতক্ষণে মুন্সীজি প্রদীপ হাতে নৌকোর ধারে এসে বলল, 'রঙ্গী, এ লোকটা কে রে?'

'বাবু, ও আমার সোয়ামী। ওর সম্বন্ধে কিছু লিখ না যেন।'

'আচ্ছা, এই হল সেই পদ্দাল। নামিয়ে দে ব্যাটাকে। একটা বেশ্যার ছেলে। বলি তোর কি কোনো আক্কেল নেই, আবার এই মাতালটাকে নৌকোয় তুলেছিস?'

'আমি নেশা করেছি? কে বলছে আমি মাতাল।' পদ্দাল ঝাঁপিয়ে ওঠে।

'কে আছিস রে, একে ধরে নামিয়ে দে তো। বড্ড বেশী টেনেছে দেখছি।'

'বেশি না, একটু।'

'চুপ কর মিন্সে। কার সঙ্গে কথা বলছিস, জানিস। আমরা মণ্ডপাকে নেমে যাব বাবু!'

'মুন্সীজি! পেন্নাম হই। আমি এক ফোঁটাও খাই নি বাবুজী।'

'হাল্লা করেছিস কি, জলে ফেলে দেব, বুঝলি।' বলেই মুন্সীজি

নিজের ঘরে চলে গেল। পদ্দাল উঠে বসল। খুব একটা বেশি টানে নি সে।

'জলে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেবে। শালা কোথাকার।' পদ্দাল খুব আস্তে আস্তে বলল।

'চুপ কর মিন্সে, সব গড়বড় হয়ে যাবে।'

'কাল সকালে নৌকো দেখলে বাছাধন বুঝতে পারবে। বড্ড বড়ফাট্টাই হয়েছে শালার।'

'চুপ, ওদিকে একজন শুয়ে আছে।'

'কে ?··· শুয়ে আছে,' পদ্দাল চুরুট ধরাল।

পদ্দালের মুখ লম্বাটে, গোঁফ জোড়া ঘন কালো। পুরুষ্ট চওড়া বুক। ছিপছিপে গড়ন, কেমন যেন বেপরোয়া ভাব।

নৌকো নিঃশব্দে চলেছে। পেছন দিকের আগুনটাও নিভে গেছে। মাঝিরা খাওয়া-দাওয়া সেরে গল্প করতে করতে বাসন মাজছে।

ঠাণ্ডা বিশেষ নেই, তবুও চাদরটা গায়ে টেনে নিলাম। চারিদিক অন্ধকার। অসহায় একটা ভাব, গা না ঢেকে শুতে ভয় ধরছে। বেশ জোরে হাওয়া বয়ছিল। নারীর কোমল স্পর্শেরমত নৌকোটা জলের ওপর দিয়ে মন্থর গতিতে চলেছে। এত কমনীয় যে প্রকাশ করার মতো নয়। চারিদিকে একটা স্নিগ্ধ ও কোমল পরিবেশ। একটা অতি পুরনো করুণ কাহিনী মনে পড়ে গেল। নারী চিরকালই তার জীবনের কমনীয়তা দিয়ে পুরুষকে ভুলিয়ে রাখে। আস্তে আস্তে এটাই ভাবতে থাকলাম।

যেখানে আমি শুয়েছিলাম তার একটু দূরেই দুটো চুরুট জ্বলছে। মনে হল জীবনের ভারবোঝা নিয়ে ওখানে চুরুট ধরিয়ে কে যেন আকাশ-পাতাল ভাবছে।

‘সামনের ওটা কোন গাঁ ?’ পদ্দাল জিজ্ঞেস করে।

‘কান্দারী,’ রঙ্গী জবাব দেয়।

‘এখনও তো বেশ দূর।’

‘আজ থাকতে দে ! না··· না··· সুযোগ বুঝলে পরে। কিরে আমার কথা শুনলি না।’ রঙ্গী মিনতি করে বলল।

‘খানকীর বুঝি ভয় করছে,’ কথাটা বলতে বলতে পদ্দাল রঙ্গীর কোমরে আঙুল দিয়ে এক খোঁচা মারল।

‘বাপ রে,’ বলে রঙ্গী নিজের কথা ভুলে যায়। আকাশের দিকে তাকিয়ে অন্ধকারের মুখটা দেখতে থাকে। এই রকম কোমল স্পর্শ সব সময় যাতে পায়, আকাশের কাছে এটাই যেন প্রার্থনা।

আস্তে আস্তে আমিও ঘুমিয়ে পড়লাম। ঘুমিয়ে পড়েছে সবাই। স্রোতের টানে নৌকোটা আপনি ভেসে চলেছে। একটু দূরে ওরা দুজনে শুয়ে খানিকক্ষণ গুনগুনিয়ে গান করল। আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, কিন্তু তেমন গাঢ় ঘুম নয়। নৌকো চলেছে, নীচে জল সরে সরে যাচ্ছে, গাছগুলো সামনে এসে আবার পেছনে মিলিয়ে যাচ্ছে, সবই যেন অনুভব করতে পারছি। নৌকোর দাঁড় আর কেউ টানছে না, সবাই বসে ঢুলছে। আমার পাশ থেকে রঙ্গী উঠে গিয়ে পালের কাছে বসল।

‘ঠাকুরপো ! কি খবর ?’ রঙ্গী জিজ্ঞেস করে।

‘তোর কি খবর ?’ পালের কাছে বসে যে পাহারা দিচ্ছিল সে জিজ্ঞেস করে।

‘কত অদ্ভুত জিনিসই না আমায় দেখিয়েছে ; সিনেমা দেখলাম, নৌকো দেখলাম। এই রকম নৌকো নয়, আমাদের গাঁয়েরমত

বড় নৌকো। পাল যে কোথায় তা কেউ জানে না।' রঙ্গী অনেকক্ষণ ধরে এই-সব বলে চলে। ওর এই-সব কথাবার্তা শুনে আমার আরও বেশী ঘুম পাচ্ছিল।

'রঙ্গী, আমার বড্ড ঘুম পাচ্ছে।' পালের লোকটা বলে।

'পাল আমি সামলে নেবোখন ঠাকুরপো; তুমি এপাশে একটু শুয়ে নাও,' রঙ্গী জবাব দেয়।

নৌকো ধীরে ধীরে চলেছে। চারিদিকে একটা থমথমে ভাব। মিষ্টি গলায় রঙ্গী গান ধরে:

> কোথায় গেছে আমার প্রিয় কোথায় গেছে।
> সাজিয়ে খাবার থালি পথ চেয়ে বসে আছি
> নিদ্রাবিহীন সারাটি নিশি, আমার প্রিয় কোথায় গেছে।
> ঠাণ্ডা মিষ্টি হাওয়া মনে হচ্ছে বিছের ছোবল,
> সারাটি আকাশ কুঁকড়ে যেন ছোট হয়ে গেল,
> আমার প্রিয় কোথায় গেছে—
> গরম লেপেরমত তোমার শরীর যখন আমায়
> ফেলবে ঘিরে তখনই আমি মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচব,
> আমার প্রিয় কোথায় গেছে।

রঙ্গীর মিষ্টি গলায় বেশ সুর। গান শুনতে শুনতে সবাই ঘুমিয়ে পড়ল। সেই চিরন্তন প্রেমের কথা, বিচিত্র উদাস গানের সঙ্গে চোখের সামনে ভেসে ওঠে। চারিদিকের পৃথিবী গানে মুখর হয়ে উঠল। মনে হল গানের সুরের স্রোতে পৃথিবীটা ভেসে চলেছে। মানব জীবন এই প্রেমে নিবিড়ভাবে মিশে যেন বিচিত্র ও ভারী হয়ে গেছে।

খানিকটা দূরে মাথায় চাদরটা জড়িয়ে পদ্দাল বসে আছে। রঙ্গী আর পদ্দালের মধ্যে যেন এক গভীর ব্যবধান। ছাদ থেকে নেমে

পদ্দাল নৌকোর ভেতরে চলে গেল। একা আমিই এই-সব দেখছিলাম। রঙ্গী তখনও গান গাইছে।

আমার চোখে ঘুম জড়িয়ে আসে। রঙ্গীর গান যেন সারা ছুনিয়া ঘুরে এসে আমার মনকে স্পর্শ করল। আমি ঘুমিয়ে পড়ি। ঘুমের মধ্যে বিশ্বপ্রকৃতির প্রেমের আলোড়ন। গাঁয়ের চাষীর মেয়েরা তাদের প্রেমিকের সঙ্গে লুকোচুরি খেলতে খেলতে গানের মধ্যে হারিয়ে যায়। স্বপ্নে এমন এক নতুন জগৎ দেখলাম, যা আগে কখনও দেখি নি। রঙ্গী আর পদ্দাল নানারূপে, নানাবেশে ঘুরে বেড়াচ্ছে। গানটা আস্তে আস্তে আমার স্মৃতিপথ থেকে দূরে সরে যায়। আমি ঘুমঘোরে আচ্ছন্ন।

হঠাৎ নৌকোর মধ্যে একটা চেঁচামেঁচি, একটা জোর হট্টগোল শুনতে পেয়ে চোখ রগড়াতে রগড়াতে উঠে পড়লাম। নৌকো তীরে ভেড়ান হয়েছে। হাতে ছুটো লণ্ঠন নিয়ে মাঝিরা শশব্যস্তে ছুটোছুটি করছে। পাড়েতে রঙ্গীকে ছুটো লোক জোরে ধরে আছে। ওদের মধ্যে একজন হল মুন্সীজি, হাতে একগাছি দড়ি। রঙ্গী মার খেয়েছে নিশ্চয়। আমি তাড়াতাড়ি নীচে নেমে পাড়ে লাফিয়ে পড়লাম। জিজ্ঞেস করলাম 'কি হয়েছে?'

'ঐ বদমাইস চোরটা পালিয়েছে। শালা, মাল নিয়ে পালিয়েছে। এই মাগীটা নৌকোটাকে কিনারায় লাগিয়ে দিয়েছিল। খান্‌কী পালের কাছে পৌঁছে গেছিল।' মুন্সীজী হতাশ হয়ে রাগে গর-গর করছিল।

'কি চুরি গেছে?' জিজ্ঞেস করলাম।

'ছুটো গুড়ের আর তিনটে তেঁতুলের বস্তা। এই জন্যেই আমি একে চড়তে দিচ্ছিলাম না। যে-সব মাল চুরি গেছে তার পুরো

দাম মালিক আমার কাছ থেকে আদায় করবে। বল বেটি, ঐ সব মাল কোথায় নামিয়ে দিয়েছিস?'

'কান্দারীতে।'

'ধ্যেৎ, বেটী খানকী, কান্দারীতে আমি জেগে ছিলাম।'

'তাহলে নিডড্রাওলত হতে পারে।'

'এর পেট থেকে কিছু বার করা যাবে না। কাল অত্তিলিতে পুলিশের হাতে দিয়ে দেবো। চল ভাই, চল সব।'

'আমাকে এখানে ছেড়ে দিন বাবুজী।'

'বাজে বকিস না, চল বেটী নৌকোর ওপর মুনশিজী এক ধাক্কা দিলেন। দুজন মাঝি তাকে নৌকোয় উঠিয়ে নিলো।

'নিষ্কর্মার দল সারাক্ষণ ঘুমোচ্ছে। একটু দেখবি তো কোথায় কি হচ্ছে। ওর হাতে পালের দড়ি গেলো কি করে? ঘটে যদি একটু বুদ্ধি থাকে।' সবায়ের ওপর খিঁচিয়ে উঠে মুনশিজী নিজের ঘরে চলে গেলো।

রঙ্গীকে জোর করে ধরে ছাদের ওপর বসিয়ে রাখলো। আমিও ছাদে গিয়ে উঠলাম। নৌকো আবার চলতে স্নুরু করলো। একটা চুরুট ধরালাম।

'ঠাকুরপো, আমাকে পুলিশে দিয়ে তোমাদের কি লাভ হবে?'

'মুনশিজী তোমায় ছাড়বে না,' মাঝি জবাব দেয়।

'পদ্দালের সঙ্গে তোমার কি সম্পর্ক, ও কি তোমার স্বামী?' আমি জানতে চাইলাম।

'হ্যাঁ, ও আমার বাবু,' রঙ্গী বলল।

'একে ভাগিয়ে নিয়ে গেছিলো, বিয়ে করে নি। ওর আর-এক

রক্ষিতা আছে, সে এখন কোথায় থাকে রে রঙ্গী?' মাঝি রঙ্গীর দিকে কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাকায়।

'কোব্বুর-এ, খুব সাজগোজ করে, বেশ আনন্দেই আছে। আমার মত মার খেতে হলে ওকেও আমার মতই হতে হবে। চালাঘরের মাগী।'

আমি না বলে পারলাম না, 'তাহলে ওর সঙ্গে যাস কেন?'

'ও যে আমার বাবু, সাহেব।' এই এক কথায় রঙ্গী আমার সব কথার উত্তর দিয়ে দিল।

'কিন্তু তুই যে বলছিলি ও অন্য কারুর সঙ্গে যাচ্ছিলো?'

'তা হলে কি হয়, ও আমার কাছে ঠিকই আসে। হাজার হোক পুরুষ তো, যত জনের কাছেই যাক না কেন। তাতে কি আসে যায়। বাবুসাহেব, ও তো রাজা লোক, এমন লোক আর পাবো না।'

'আপনি ওর কতটুকু আর জানেন। আমাকে জিজ্ঞেস করুন। আপনি তো জানেন না কত আরামে ওকে রাখে। একবার ওকে চালাঘরে পুরে আগুন লাগিয়ে দেয়। ভেতরে দম বন্ধ হয়ে মারা যাবার জোগাড়। এখনও মরার দিন আসে নি তাই…।' মাঝিটা বলে চলে।

'তখন সামনে পড়লে ওর গলা টিপে দিতে ইচ্ছে করতো। চালার ওপর থেকে একটা জ্বলন্ত কাঠ পিঠে পড়েছিলো।' বলতে বলতে পিঠের জামাটা একটু উঠিয়ে রঙ্গী দাগটা দেখায়। অন্ধকারেও সাদা দাগটা পরিষ্কার দেখা গেলো।

'তোমায় এত যখন কষ্ট দেয়, তখন ওর জন্যে তোমার এত দরদ কেন?'

'কি করি বাবুসাহেব? সামনে এলে সব-কিছু ভুলে যাই। বড় কাকুতি মিনতি করে। এই একটু আগে সন্ধ্যেবেলায় আমরা কোব্বুর থেকে বেরিয়েছি। সারা রাস্তা কি রকম কাকুতি মিনতি করলো। নৌকোয় উঠেই যা পারে ও সরাতে চাইছিলো। আমাকে বাদ দিয়ে এ-কাজ করা ওর পক্ষে সম্ভব ছিলো না। সোজা পথ দিয়ে নদীর পাড়ে পৌঁছে গেলাম...।'

'মাল কোথায় নামালি?'

'জানি না, মনে নেই।'

'বেটি, চোরের খান্‌কী।' মাঝি হেসে বলে।

রঙ্গীর মুখের ভাবটা দেখবার ইচ্ছে ছিলো, কিন্তু অন্ধকারে তা সম্ভব হ'লো না।

নৌকো খুব মন্থর গতিতে এগোচ্ছে। মাঝ রাতের পর একটু ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে। গাছের পাতাও নড়ছে। মাঝিরা আবার দাঁড় টানতে লাগলো। আর ঘুম এল না। খানিক পরে পাহারাওলা ঢুলতে ঢুলতে ঘুমিয়েই পড়লো। রঙ্গী আর পালাবার কোনো চেষ্টা করলো না। নিশ্চিন্তমনে চুরুট ধরিয়ে টানতে থাকলো।

'তোর বিয়ে কি সত্যি হয়েছে?' জানতে চাইলাম।

'হয় নি। ছেলেবেলাতেই পদ্দাল আমায় ভাগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলো।'

'তোর কোন গাঁ?

'ইড্রপালেম...। তখন জানতাম না মদ খায়। ...এখন তো আমিও খাই। খাওয়াতে কি আপত্তি। কিন্তু খেলে যে আমাকে মারে।'

'তাহলে ছেড়ে যাস না কেন?'

'মার খেয়ে সেটাই ভাবি। কিন্তু এ রকম লোক আর পাবো না। আপনি জানেন না, যখন নেশা করে না মনটা তখন ওর ঠিক যেন মাখনের মতন নরম। একশোটা বেশ্যামাগীর কাছে গেলেও আমার কাছে ঠিক আসবে। ওকে ছেড়ে দিলে বুক ফেটে মরে যাবো।'

অদ্ভুত লাগে রঙ্গীর কথাগুলো। দু'জনার সম্পর্কও ঠিক বুঝে উঠতে পারলাম না। রঙ্গী আবার নিজের কথা বলে চলে, 'কোনো কাজেই আমাদের মন বসল না। শেষবেশ এই চুরি করা ধরলাম। পরশুদিনই আমার মা মারা গেছে। সব সময়ই আমাকে নিষ্কর্মা ঢেঁকি বলত। একদিন পদ্দাল ঐ বেশ্যাটাকে আমার কাছে নিয়ে আসে।'

'কাকে ?'

'ওটাকে। যার কাছে এখন গেছে। আমার বাড়ীতে আমার সামনে ওকে নিয়ে শুলো। আমার নাকের ওপর। সেদিন খুব টেনে এসেছিলো। আমার সতীনও খুব টেনেছিলো। ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ওকে খিমচোতে লাগলাম। পদ্দাল আমাকে মারতে থাকলো। ঐ মেয়েছেলেটাকে নিয়ে মাঝরাতে অন্য জায়গায় চলে গেল। আবার ও আমার কাছেই ফিরে এলো। আমি যাচ্ছেতাই গালিগালাজ করলাম। ভেতরে আসতে দিলাম না। তখন দরজার কাছে বসে বাচ্চাদের মত কাঁদতে থাকলো। আমি আর স্থির থাকতে পারলাম না। ওর কাছে যেতেই আমায় কোলে বসিয়ে আমার হারটা চাইলো। আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'কেন ?' বললে, 'ও চাইছে।' মাথায় আমার রক্ত [illegible]লো। গালমন্দ করলাম। আবার ও কাঁদতে লাগলো। [illegible] 'ওকে ছেড়ে আমি বাঁচতে পারবো
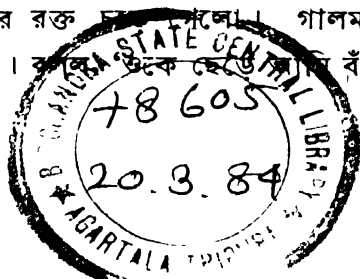
না।' শুনে পিত্তি চটে গেলো। ওকে বাড়ী থেকে দূর করে দিয়ে খিল লাগিয়ে দিলাম। অনেকক্ষণ দরজা ধাক্কাধাক্কি করলো। তারপর চলে গেলো। অনেকক্ষণ আমার ঘুম এলো না। ঘুমোবার সঙ্গে সঙ্গে বাড়ীতে আগুন লেগে যায়। দরজার হুড়কোটা বাইরে থেকে তুলে দিয়ে ও ছাদে গিয়ে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিলো। কেউ এলো না। তখন সবে মাঝরাত। ক্লান্তিতে শরীর অবসন্ন। অনেকক্ষণ দরজা ধাক্কাধাক্কি করে অজ্ঞান হয়ে পড়লাম। বাইরে থেকে কেউ হয়তো দরজা খুলে দিয়েছিলো। পরের দিন পুলিশ ওকে ধরে নিয়ে গেলো। আমায় জেরা করল পুলিশ। 'কে আগুন লাগিয়েছে?' আমি বলেছিলাম, 'ও নয়।' সন্ধ্যেবেলা আমার কাছে এসে ও আবার কাঁদতে থাকলো। মদ খেলেই কাঁদতে থাকে। বাকী সময় হাসে। এক ফোঁটা ভেতরে গেলেই বুক ঠেলে কান্না বেবিয়ে আসে। ঠিক বাচ্চার মত খালি কাঁদে। আমি হারটা ওকে দিয়ে দিলাম।'

'এতশতোর পরও কেন তুই ওকে চুরি করতে সাহায্য করিস?'

'কি করি বাবুসাহেব। যদি ঝগড়া করে তবে··· ?'

'কিন্তু তুই যে বলছিলি তোকে বিজয়নগরম্ আরও কোথায় যেন নিয়ে গেছিলো?'

'সব মিথ্যা কথা। এমনি বলেছিলাম। এই মাঝিমাল্লারা আমায় খুব বিশ্বাস করে। এই নৌকোয় এর আগেও দুবার চুরি হয়ে গেছে।'

'পুলিশ তোকে ধরলে, তুই কি করবি?'

'কিচ্ছু করবো না। ওরা আমাকে ধরে করবেটা কি? আমার কাছে তো আব চোরাই মাল নেই। না আমি জানি কে নিয়েছে। প্রথম দিন মারবে, পরের দিন ছেড়ে দেবে।'

'আর পদ্দাল যদি ধরা পড়ে? চোরাই মাল সমেত ধরা পড়লে?'

'ও ধরা পড়বে না। এতক্ষণে মালও পাচার হয়ে গেছে। আমি নৌকোতেই থাকব।' একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বিড় বিড় করে বলে, 'আর এই-সব পয়সা ঐ মাগীটার হাতেই যাবে। যতক্ষণ টাকা থাকবে ততক্ষণ ওকে নিয়ে পড়ে থাকবে। যত ঝামেলা আমি পোয়াবো, আর ঐ বদমাইস মাগীটা ফুর্তি মারবে।'

রঙ্গীর কথায় কোনো রাগ বা আক্রোশ ছিল না। পদ্দালের সব দোষ-গুণ জেনেই রঙ্গী ওকে স্বীকার করে নিয়েছে। পদ্দালের জন্যে ও সব কিছু করতে রাজী। এটা কোনো আদর্শ, শ্রদ্ধা বা প্রেমের জন্যে করে না। ঈর্ষা, অনুরাগ আর এই ধরনেরই ভাবে-ভরা ওর নারীহৃদয়। সব কিছু থেকেও তার আসক্তিটা ঐ একটা জায়গায় আবদ্ধ— পদ্দালের জন্যে সব সময়ই ও বিচলিত। পদ্দালের ব্যবহারে ত্রুটি থাকুক বা না থাকুক, আচারব্যবহার নীতিসঙ্গত কিনা, তা নিয়ে রঙ্গী মাথা ঘামাতো না। দোষে-গুণে-মানুষ পদ্দালকে রঙ্গী দূরে ঠেলতে পারে নি। রঙ্গীর জীবনটা ওর নিজের কাছেই যেন একটা বোঝা, কিন্তু কে জানে আমার জীবন তার চেয়ে বেশি কিনা।

একটু জোরে হাওয়া বইছে। বেশ ভালো লাগছে। নৌকোর গতিও বেড়ে চললো। ক্লান্তিসুপ্ত এই সংসার ঊষায় যেন জেগে উঠছে। এধারে, ওধারে, ক্ষেতের আলে চাষীদের দেখা যায়। শুকতারা তখনও ওঠে নি। হাঁটু গুটিয়ে জড়সড় হয়ে বসেছে রঙ্গী। উদ্দেশ্যহীনভাবে তাকিয়ে আছে। 'ও আমার মিন্‌সে, যেখানেই যাক না কেন, শেষবেশ আমার কাছে ফিরে আসবেই।' নিজের

মনে বিড় বিড় করতে থাকে। ওর এই কথায় ওর আশা, ওর ধৈর্য ও বিশ্বাস মূর্ত হয়ে ওঠে। আর এটাই হয়তো ওর জীবনের আধার। ওকে দেখে যুগপৎ ভয় ও করুণা জাগে, শ্রদ্ধা হয়। আমি চুপ করে থাকি। বাকী রাতটুকু এই ভাবেই কেটে যায়।

নৌকো থেকে নেমে ওর হাতে একটা টাকা দিয়ে আমি হন্ হন্ করে গাঁ-মুখো চললাম। ওর উত্তরের প্রতীক্ষায় আর দাঁড়ালাম না। পরে ওর কি হ'লো জানি না।

দোষ-গুণ

'রাজপুত্রের অভিষেক হবার পর রাজা ও রানী বাকী দিনকটা বেশ আনন্দে কাটাতে লাগলেন।' সমুদ্রের ধারে বসে ঠাকুর্দা নাতি-নাতনীদের গল্প শোনাচ্ছিলেন। কাল রাতে দেখা 'মঁগম্মশপথম্' ছবিরই গল্প। খানিকদূরে মিউনিসিপ্যালিটির কয়েকজন কর্মচারী বসে মন দিয়ে গল্প শুনছিলো। সিনেমার গল্পে এদের কোনো আগ্রহই নেই। কিন্তু ঠাকুর্দার রসিয়ে গল্প বলার অদ্ভুত ক্ষমতা। তাই এদেরও এত আগ্রহ। ঠাকুর্দা নাতি-নাতনীদের নিয়ে উঠে পড়লেন। রেডিওতে তখন গান বাজছে। গান শুনতে শুনতে তারা লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে উঠছে। ঠাকুর্দাও তাদের সঙ্গে তাল দিচ্ছেন। দেখে রঙ্গমের হিংসে হয়। বলে, 'দেখো, আগেকার দিনের লোকেরা কত স্ফূর্তিবাজ। আমরা এতদিন বাঁচব না, বাঁচলেও ঐ বয়সে এত প্রাণশক্তি থাকবে কিনা সন্দেহ।'

'মানুষের জীবন এতো বদলে যাচ্ছে কেন?' সুরী জিজ্ঞেস করে।

'আরে কলিযুগ।'

'ননসেন্স! আমাদের অভ্যেস, শহুরে জীবনযাত্রা, মেসিনে-ছাঁটাই চাল, মাখনহীন ঘোল—সব-কিছুই আমাদের কম জোরী করে দিচ্ছে।'

'এ সবের মূলে ঐ সরকারী নীতি।'

'বাঃ, তা কেন? সরকার তো ঢেঁকিছাঁটা চাল খেতে মানা করে নি।'

'বারণ করে নি ঠিকই। কিন্তু মেসিনে-ছাঁটাই চাল খেতে যতদিন না সরকার বারণ করবে, ততদিন লোকে তা খাবেই।'

'আমাদের ব্যক্তিস্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা হচ্ছে বলে আমরাই যে আবার চিৎকার শুরু করবো। রাশিয়ার লোকেরাও ঠিক এই বলেই চেঁচাচ্ছে, বলছে, সরকার তাদের জবরদস্তি আরামে রেখেছে, তাই নয় কি?'

'যাই বলো না কেন, আগেকার দিনই ভালো ছিল। ডেমোক্রেসি, কম্যুইনিজম্‌, জন-শাসন— সবই অশান্তি আর উপদ্রবের কারণ। রাজতন্ত্রই ভালো। কারুর কিছু জারীজুরী চলে না।'

'সে তো ডিকটেটরই হল, নয় কি?'

'সবাই ডিকেটটার হতে চায়।'

'এ সবের চেয়ে রাজাই ভালো।'

'মঁগম্মশপথম্‌'-এ যেমন দেখালো। সবাই সেজেগুজে আনন্দ আর স্ফূর্তি করার জন্যে রাজা সাজে। শাসন করার সঙ্গে ওদের সম্পর্ক কি?'

'আচ্ছা বলো তো ওর মধ্যে শপথটা, কি হ'লো। পৌরাণিক গল্পের তো কিছু অর্থ থাকবে।'

'ছেলের অভিষেকের সময় রানীর কত বয়স ছিল? অন্ততঃপক্ষে চল্লিশ। রাজার বয়সও পঞ্চাশ। এই বয়সে ওদের সুখস্বাচ্ছন্দ্যেই বা কি লাভ? সারা যৌবনটাই তো আজে বাজে শপথে কেটে গেছে। হরিশ্চন্দ্র, রামচন্দ্র— এঁরা সবাই সারা জীবনটা যন্ত্রণার মধ্যেই কাটালেন, জীবনের শেষ কটা দিন সুখে কাটিয়েই বা এঁদের কি লাভ হয়েছিলো?'

'যাঁরা আদর্শের পথে জীবন কাটাতে চান তাঁদের জীবন এইভাবেই কাটে।'

'হয়তো কাটে। তাঁদের জীবনে কিছুটা সুখ দেখিয়ে লেখক আমাদের চোখে ধুলো দিতে চান।'

'এমন অনেক লোক আছেন, যাদের জীবনের শেষ কটা দিনও সুখে কাটে না।'

'যাঁরা কোনো একটা আদর্শ নিয়ে জীবন কাটাতে চান এই আদর্শের জন্যে তাঁদের সারাটা জীবনই সংগ্রাম করতে হয়। আর এই পরম দুঃখভোগটাই পরম আনন্দের। ওঁদের মনে মহৎ কাজের একটা তৃপ্তিও থাকে। কিন্তু এমন অনেক সাধারণ লোক আছে যাদের জীবনটা দুঃ ' মধ্যেই কাটে।'

'এর জন্যে দায়ী কিন্তু ামাদের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা। আসলে এই দারিদ্র্য সকল দুঃখের মূল।'

'তাহলে এই হত্যাকাণ্ড, অত্যাচার আর শঠতা কেন?'

'এটাই অদৃষ্ট।'

'আমরা কোনো যুক্তি যখন দেখাতে পারি না, কিছু বুঝতে পারি না, নিজের অজ্ঞানতাকেও স্বীকার করি না, তখনই আমরা এই কথা বলি। কেউ কেউ বলে, 'সবই তাঁর ইচ্ছা'; আর কেউ কেউ বলে 'অদৃষ্ট'; এইভাবে জীবনের সমস্যাকে আমরা স্বীকার করে নিই।'

'শুধু সমস্যাই নয়, সব অন্যায়, সব স্বার্থবিরোধী বিধান আর এই ধরনেরই যত কিছু নিয়মকানুন সবাই ভগবানের নামে চালায়। ঠিক এই জন্যে রাশিয়াতে ভগবানের কোনো অস্তিত্ব নেই।'

'আমি একটা ঘটনা জানি, তবে বলি। শুনে আপনাদের মতামত

দেবেন।' জনের মামা ডাঃ জোসেফ বললেন। এতক্ষণ ইনি চুপচাপ বসেছিলেন।—

চার বছর আগেকার কথা। তখনও রিটায়ার করি নি, সামনের ঐ হাসপাতালে কাজ করি। আমার ওয়ার্ডের সামনে সব সময় একটা বুড়ী দাঁড়িয়ে থাকতো। কাঁদারও ক্ষমতা ছিল না বুড়ীর। তাই দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে সারাক্ষণ বিড় বিড় করতো। ডাক্তাররাও সব সময় হাসপাতাল নিয়েই ব্যস্ত। এই ধরনের হতভাগাদের আকছার দেখে দেখে এঁদের গা সওয়া হয়ে গেছে। এদের অবস্থা যতই মর্মান্তিক হোক ডাক্তাররা মোটেই বিচলিত হতেন না। সব কটা রুগীই মরমর। যমের সঙ্গে লড়াই করে এদের বাঁচাতে হয়। কারুর মাথা ফাটা, কারুর বা পা ভাঙা, কারুর নাড়িভুঁড়ি বেরিয়ে এসেছে— সবায়ের এক রা, 'ডাক্তারবাবু, আমার কথা শুনুন, এই যে আমাকে আগে দেখুন' একসঙ্গে সবাই ডাকতে থাকে। ওদের ডাকে বিচলিত হলে কাজ করা অসম্ভব। বড় বড় হাসপাতালে আরও বিপদ। রুগী তো আছেই, তাদের সঙ্গে আবার আত্মীয়-স্বজনেরা এসে চেঁচামেচি, কান্নাকাটি জুড়ে দেয়। দরকার তো সবায়েরই। ডাক্তারের যদি একটু মায়াদয়া থাকে তো কথাই নেই। নিজের ওয়ার্ড তো আছেই, অন্য ওয়ার্ডের রুগীরাও বিরক্ত করে। ক্ষিদেয় যারা মরতে বসেছে তাদের ওষুধ দিয়ে কি লাভ। সে কথা থাক। কাজে ব্যস্ত থাকায় এই বুড়ীর কথা প্রায় ভুলেই গেছিলাম। মনের কোণে একটা আবছা ছায়া ছিল। নার্সদের একদিন এই বুড়ীটাকে নিয়ে কথা বলতে দেখে জানতে চাইলাম, বুড়ীটা কে? শুনলাম, আমার ওয়ার্ডের এক রুগীর মা। ফুসফুসে ফোঁড়া হওয়ায় তার অবস্থা খুবই খারাপ। রুগীর বয়স প্রায় চল্লিশ।

ঐ বুড়ী ছেলের কাছে গেলেই ছেলে ওকে গালমন্দ করে, ঘর থেকে বার করে দিতে বলে। তাই সে ঘুমোলে বুড়ী এসে ছেলেকে দেখে আর চোখের জল ফেলে। বাকী সময় বাইরে দাঁড়িয়ে থাকে। শোনার পর মনটা আমার খারাপ হয়ে গেলো। বিকেলে বুড়ীর সঙ্গে কথা বললাম। কেঁদে কেঁদে বার বার মিনতি করল, ওর ছেলেকে যেন বাঁচিয়ে তুলি। এই রকম পরিস্থিতিতে ডাক্তারের কি করা উচিত? মিথ্যে আশা দিয়ে ওকে সান্ত্বনা দেবে, না সত্যি বলে ওর মনকে আঘাত করবে। কোনটা যে ঠিক, চল্লিশ বছর ডাক্তারী জীবনে আজও আমি তা বুঝে উঠতে পারলাম না।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'তোমার ছেলে তোমার ওপর এত চটা কেন?' শুধু বললে, অদৃষ্ট। ওর ছেলেকে প্রশ্ন করি, 'তোমার মা তোমার জন্যে এত কান্নাকাটি করে, অথচ তুমি অতো রেগে যাও কেন? যতই মনের গরমিল থাকুক, এই সময় কথা বলা উচিত।'

'ওর স্বভাব খারাপ, ওর কথা আমার কাছে পাড়বেন না।'

'এমন কি করেছে যে তুমি ক্ষমা করতে পার না। হাজার হোক তোমার মা তো!'

'মা? আমার মা? অন্য সব কিছুরই ক্ষমা আছে। ও আমার জীবনটা বরবাদ করে দিয়েছে। ও যে কাজ করেছে, তার জন্যে গত চল্লিশ বছর ধরে আমি শুধু অনুশোচনায় মরে যাচ্ছি। শুধু ভেবেছি, কেন ওর গর্ভে আমি জন্মালাম। ওর কথা আমার কাছে বলবেন না।'

রুগীটার জন্যে আমার কোনো সহানুভূতি হ'লো না। হতে পারে ও যা বলছে সবই ঠিক। কিন্তু বুড়ীর ওর জন্যে যে বেদনা,

যে ভালোবাসা, সেটাও তো সত্যি। রুগীকে দেখেও বদমাইস মনে হয় না। সে একা, স্ত্রীপুত্র নেই, শিক্ষিত, সংস্কারাচ্ছন্ন, কাকে কি বলবে।

মা-বাপের স্নেহভালোবাসা নিঃস্বার্থ। ছেলেমেয়েদের মনে কৃতজ্ঞতাবোধ থাকতে পারে, ভক্তিশ্রদ্ধাও থাকতে পারে, কিন্তু ভালোবাসা নয়। আমাদের কেউ ক্ষতি করলে তা আমরা চিরকাল মনে রাখি, কিন্তু অন্যের ক্ষতি করলে তা একেবারে ভুলে যাই। এই আক্রোশ, প্রতিহিংসার ভাব সংসারকে বিষিয়ে দেয়। সংসারে স্নেহ, মমতা, দয়া ও ক্ষমা আছে বলেই আমরা বেঁচে থাকতে পারি।

রাতারাতি রুগীর চেয়ে রুগীর মার ওপর আমার সহানুভূতি জাগলো যদিও জানি ঐ বুড়ীকে কেউই শ্রদ্ধা করে না। ছেলে আর ছেলের প্রাণ-ভিক্ষা ছাড়া বুড়ীর মনে আর কোনো চিন্তা ছিল না। যে কেউ প্রশ্ন করুক, যা কিছু প্রশ্ন করুক। বুড়ীর কিন্তু সেই এক কথা, 'ওকে সারিয়ে দাও বাবা, ওর প্রাণ ফিরিয়ে দাও!'

'তোমার নাম শুনলে তো সে ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নেয়, এমন ছেলে মরলো বা বাঁচল তাতে তোমার কি?' একদিন অধৈর্য হয়ে বুড়ীকে বলেই ফেললাম। কোনো জবাব দেয় না।

'ছেলের ওপর ভরসা করে যে ও দিন কাটাচ্ছিলো, তাও নয়। বুড়ী কারুর বাড়ী কাজ করে নিজে পেট চালায়। এখন সে কাজও ছেড়ে দিয়েছে। হাসপাতালে বুড়ী যেন পাপের প্রায়শ্চিত্ত নিজেই করছে।'

এই ঘটনার দুদিন পরে আমি একদিন ছুটি নিই। বাড়ীতে গেস্ট আসার কথা ছিলো।

'গেস্ট আসবে বলে ছুটি নিলে কেন?' রঙ্গম প্রশ্ন করে।

'তাতে তোমার কি ? ছুটি নিয়েছিলাম শুনে রাখ। গল্প শোনো।'

'খালি তো বুড়ীর কথাই বলো, একটু নিজের জীবনের কাহিনীও শোনাও না আঁকেল ?' জন হাসতে হাসতে বলে।

'অতিথি স্ত্রী না পুরুষ ?' স্নুরী কৌতূহল চাপতে পারে না।

'স্ত্রী, আমার শাশুড়ী। প্রায় কুড়ি বছর হল মারা গেছেন।'

'টেম্পোরারী শাশুড়ী বোধ হয়।'

'বলি গল্পটা শুনবে না কি ?' ডাক্তার চটে উঠলেন।

'শুনবো না কেন ? বলে যান।'

'কিন্তু অতিথি এলেন না।'

'বেচারী।'

'সেদিন রুগীদের যা হাল হয়েছিলো তা একমাত্র ঈশ্বরই জানেন।' স্নুরী বললো।

'নার্সরা কি ছিলো না, ডাক্তার ?'

'তাহলে আমি চলি।' ডাক্তার হেসে ফেলেন।

'আচ্ছা, বকবক করবো না, বলুন।'

'সেদিন বাড়ীতে আমি একলা।'

'এটাই মোদ্দা কথা।'

'চুপ করে গল্প শোনো। বাড়ীতে বসে বসে বিরক্ত হয়ে হাসপাতালে যাই। বারান্দায় একটা চেয়ার টেনে নিয়ে তাতে পা এলিয়ে দিয়ে সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে থাকি। বারান্দার ওদিকটায় দুজন নার্স ও তিনজন ছাত্রের কথাবার্তা কানে এল। আমার মতোই ওরা সেদিন গল্প করছিলো গুছিয়ে ওদের গল্পটাই বলছি।—

'জোঁকের মত যে তোমার পিছু নিয়েছিলো, ওটা কে ?' ছাত্র ভেঙ্কটপ্পা জানতে চায়।

'আমাদেরই গাঁয়ের লোক।' শ্রীনিবাস বলে।

'তোমার বয়স কত?' ভেঙ্কটপ্পার প্রশ্ন।

'অতোশতো জানি না। ওর ছেলে আমার দাদার ক্লাশ-ফেলো। কে যেন বলেছিল ওর অতীতটা বড় রোমান্টিক ছিল।'

কথাটা শুনতে পেয়ে আমি কান খাড়া করলাম। পুরোনো ছেঁড়া ক্যানভাসের পর্দার মধ্যে দিয়ে সকালবেলার সূর্যের আলোয় আমি ওদের আবছা আবছা দেখতে পাচ্ছি।

'আচ্ছা, তাই তুমি ওর সঙ্গে অত কথা বলছিলে।'

'আমি নই, আমার বাবা, শুনেছি ওর জন্যে অনেক চেষ্টাচরিত্র করেছেন।'

'তাতো বুঝলাম। কিন্তু তোমার জন্যে ও কি করেছে, বলো তো দেখি।'

'ওর ছেলে এই ওয়ার্ডে আছে।'

'কে? ঐ একুশ নম্বরের রোগী? বুড়ী কত যে কাঁদে। ইংরিজিতে কথা বলার চেষ্টা করে।' নার্স বালম্মা বলে।

ওষুধপত্তরের নাম ছাড়া বালম্মা বেশ ইংরিজি জানে।

'ঠিক আছে, মা হয়েছে বলে···'

'রুগী ওর সঙ্গে কথাও বলে না, তাকায়ও না। কথা শুনলে চটে ওঠে।' বালম্মা বলে।

'ও তো মাকে গালিগালাজও করে। বলে তোমার মুখ দর্শনও করতে চাই না।'

'হ্যাঁ ভাই শ্রীনিবাস! তুমি তো বলছিলে ও তোমার গাঁয়ের লোক। ওর অতীতও খুব অদ্ভুত। তা তুমি কিছু জানো না কি?'

'কিছুই জানিটানি না। অনেকদিন হ'লো ওরা আমাদের গাঁ ছাড়া।'

'চলো, যাওয়া যাক।' তৃতীয় ছাত্রটি নিজের ঘড়ির দিকে তাকায়।

'আরে এত তাড়া কিসের?' দ্বিতীয় নার্স এলিজাবেথ ছাত্রটির দিকে আড়চোখে তাকিয়ে বলে। পুরুষগুলো মুগ্ধ হয়ে ওদের পিছু পিছু কেন যে ঘোরে না, নার্সরা তা বুঝতে পারে না। সিনেমা-থিয়েটারে হাত ধরে বসে থাকলেও, আলো জ্বলে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে মুখের দিকে তাকিয়ে মুখ ফিরিয়ে নিতে হয়। ওদের বেশভূষা দেখে একবার ওদের খুব কাছে এলে জীবনের মতো আর আসতে ইচ্ছে করে না। দূরে দূরে থাকতে হয়।

'তুমি বলছ তাড়া কিসের। আজ অপারেশনের দিন। থিয়েটারে পৌঁছোতে এক মিনিট দেরী হলে ঐ নাপিত-ডাক্তার রোগীর জায়গায় আমাকেই টেবিলে শুইয়ে দেবে।' শ্রীনিবাস বলে।

ছাত্র তিনজন চলে যাওয়ায় নার্স দুটি সেলাই হাতে গল্পগুজব করে। গাছপালার পরশ নিয়ে, মৌমাছির মনে শিহরণ জাগিয়ে আপন মনে বয়ে চলেছে সমুদ্রের ঠাণ্ডা হাওয়া। এদের মনে কোনো অনুভূতি নেই। দেয়ালে স্নিগ্ধ স্বচ্ছ জলের প্রতিবিম্ব, তাও এদের মনে রেখাপাত করে না। গতরাতে হেড নার্সের ঘরে পোলাও পৌঁছেছিল। সেটা বকশিস না অন্য কিছু তা নিয়ে আলোচনা চলছিলো। এই পোলাও এসেছিলো এক পুলিশ ইন্সপেক্টারের কাছ থেকে। আলোচনা ক্রমে নিচু ধাপে নামে। পুলিশ ইন্সপেক্টারও এই চল্লিশ বছরের নার্সকে রোজ আরাম করে এক খাটে শুতে দেখার কল্পনাও। তারপর এই পুলিশ ইন্সপেক্টার ও চল্লিশ বছরের নার্সের মধ্যে কি ঘটনা ঘটেছিলো, তাও বর্ণনা করতে এ:া

পিছপাও ছিল না। কিন্তু একেবারে নগ্ন অশ্লীল বলে মুখে আটকে যায়।

'ওয়ার্ড থেকে বেরিয়ে এসে ডাঃ কামেশ্বর রাও বলেন, 'আপনারা এখানে বেশ আরামে বসে আছেন, ওদিকে যে বারো নম্বর রুগীর মুখ থেকে রক্ত উঠছে।'

'তা আমরা কি করবো? ওষুধ দিন, রক্ত বন্ধ হয়ে যাবে।'

'দিচ্ছি তো। কিন্তু ···।'

'সব সময়ই তো কারুর না কারুর কিছু না কিছু বেরুচ্ছে। আমরাও তো মানুষ। আপনাদের আর কি? দু'কলম লিখে দিয়ে বাড়ী গিয়ে আরাম করে তাস খেলবেন।'

'গত হপ্তায় স্বাস্থ্যমন্ত্রী যে ভাষণ দিয়েছেন তা নিশ্চয়ই আপনারা শুনেছেন।'

'হ্যাঁ, খুব মন দিয়েই শুনেছি। তারপর রেডিওতে শুনেছি, খবরের কাগজে পড়েছি। মন্ত্রীমশায়ের ভাষণের ওপর হেড নার্সও এক লম্বাচওড়া ভাষণ শুনিয়েছেন। এর আগে যিনি স্বাস্থ্যমন্ত্রী ছিলেন তিনিও এই একই কথা বলেছিলেন, ভবিষ্যতে যিনি স্বাস্থ্যমন্ত্রী হবেন তিনিও এই একই কথার পুনরাবৃত্তি করবেন। আমরা যখন মাগ্গী ভাতার কথা বলি, তখন সব চুপচাপ, কোনো কথা নেই।' বালম্মা বলে চলে, 'বলেন, রুগীরাই আমাদের ছেলেমেয়ে।'

'দূর পাগলী, জানিস না, আমাদের মন্ত্রীমশায়ের এগারোটি ছেলেমেয়ে।' এলিজাবেথ টিপ্পনী কাটে।

'আচ্ছা ধরেই নিলাম, রুগীরা আমাদের ছেলেমেয়ে। আর ছেলে-মেয়েদের বাপ?'

'ডাক্তাররা,' বলে এলিজাবেথ হেসে ফেলে কামেশ্বর রাও-র দিকে তাকায়।

'সরকার এই রকম যদি একটা জারী করে…' বালম্মা হাসতে হাসতে মন্তব্য করে।

'মাগ্‌গী ভাতা বাড়ানোর কথা বললেই পয়সা নেই।'

'কিন্তু ওষুধের ইনডেনট নিয়ে হু'লাখ টাকার যে মামলাটা তার কি হ'লো?'

'কাকে জিজ্ঞেস করছো?'

'অন্ততঃ…' ইতিমধ্যে দেখতে পায় তিনজন ছাত্র দৌড়তে দৌড়তে আসছে।

'আচ্ছা, এত তাড়াতাড়ি অপারেশন হয়ে গেলো?'

'আজ শুধু একটা অপারেশনই করেছেন।'

'কেন?'

'তাড়াতাড়ি বাড়ী ফেরার জন্যে?'

'এতো তাড়া কিসের?'

'ওর ঐ যে গেস্ট ইংলণ্ড থেকে এসেছে, নিউজ-প্রিণ্ট এজেণ্ট যে। ওঁর স্ত্রীর সঙ্গে গেস্ট একা থাকবেন, এটা মোটেই ওঁর পছন্দ নয়। তাই সবায়ের ওপরই আজ ঝাঁঝিয়ে উঠছেন।'

'একজন যার অপারেশন হয়েছে, সে পেসেণ্ট শুনলাম মরে গেছে।'

'একেই বলে কপাল।'

'হাসপাতালে আবার কপাল কি? বাড়ীতে কেমন কপাল ছিলো কে জানে।'

'আচ্ছা ডাক্তার, এই ওয়ার্ডের একুশ নম্বর পেসেণ্ট সম্বন্ধে আপনি

কিছু জানেন? ও তো আমাদেরই গাঁয়ের লোক, তাই না।' শ্রীনিবাস জিজ্ঞেস করে।

'একুশ নম্বরের বিষয় কিছু জানি না তবে···'

'মা-বেটায় মোটেই বনে না।···'

'সে-সব কিছু জানি না। কিন্তু ওর মার কেসটা মেডিকেল পয়েণ্ট থেকে খুব ইনটারেস্টিং। যদি শুনতে চান তো বলতে পারি।'

'হ্যাঁ, বলুন। বেলা একটার আগে তো খাবারের কোনো তাড়া নেই।'

'ওয়ার্ডের রুগীগুলোকে ভগবানের নামে ছেড়ে দিয়ে কামেশ্বর রাও বলতে সুরু করলেন—

'আমি তখন হাইস্কুলে পড়ি। আমাদের ক্লাসে কনকয়্যা বলে একটা ছেলে ছিল। ক্লাসের সেরা ছাত্র। মা-বাপ খুব গরীব। হঠাৎ একদিন সে জ্বরে পড়ল। জ্বর ক্রমশ বাড়ছিলো। গাঁয়ে তখন একটিমাত্র ইংরেজ ডাক্তার। গাঁয়ের হাসপাতালেও এক মুসলমান ডাক্তার। তিনি ওষুধ দিলেন। কিন্তু পরের দিন কনকয়্যা অজ্ঞান হয়ে পড়ল, ডিলিরিয়াম সুরু হয়ে গেলো। এমনি একটু জ্বরেই ও ভুল বকতো। সাধারণত ভালো ছেলেরা যেমন নার্ভাস প্রকৃতির হয়, সেও তেমনি। আমরা ও আমাদের মাস্টারমশাই সকালবিকাল ওর খোঁজখবর নিতাম। আমাদের হেডমাস্টারমশাই ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করে জানতে পারলেন যে ওর সেপ্‌টিসিমিয়া হয়েছে, শিগ্‌গিরই ভালো হয়ে উঠবে। পরের' দিন জ্বর আরো বাড়লো। গাঁয়ের সবাই হয়রান। গরীব ছিলো বলে কনকয়্যা পালা করে এক-এক জনের বাড়ী খেতো আর বাড়ী বাড়ী ঘুরে টাকা জোগাড় করে ইস্কুলের মাইনে দিতো ওর বাবা ঐ গাঁয়ের পুরোহিত ছিল। বাপ-বেটাকে সবাই ভালোবাসতো।

'সবাই ভয় পেয়ে কবিরাজ গোপয়্যাকে ডেকে আনলো। রুগীর নাড়ী টিপেই কবিরাজ বললেন, 'এটা দোষ-গুণ ব্যাধি। এর একই ওষুধ। যে স্ত্রীর সঙ্গে সহবাসের সময় এই দোষ-গুণের ব্যাধি হয় তার উরুর থেকে রক্ত নিয়ে রুগীর চোখে লাগালে রোগ ভালো হয়ে যায়।' কবিরাজের এই কথা কেউ মানতে রাজী নয়। কনকয়্যা ছেলেমানুষ, দেখতে বিশেষ ভালো নয়, মুখে বসন্তের দাগ। পড়া-শুনা ছাড়া আর সে কিছুই জানে না। তখনকার দিনে বিশেষ করে আমাদের মতো ছোট গাঁয়ে বিলিতি ওষুধকে একটু যেন সন্দেহের চোখে দেখতো।'

'সন্দেহের নজরে দেখা মানে?' এলিজাবেথ বুঝতে না পেরে প্রশ্ন করে।

'মানে দোষ-গুণ স্ত্রীলোকের সংস্পর্শে এলে হয় না।'

'আর ওটাই বা কি?'

'অসুস্থ অবস্থায়…'

'কিন্তু মেডিকেল বইয়েতে এ বিষয়ে কোনো কিছু লেখা নেই।'

'ইংরিজি বইয়েতে নেই।'

'কিন্তু আপনি কি এটা বিশ্বাস করেন?'

'সেইটাই তো আসল কথা। গল্পটা শুনে আপনারা নিজেরাই সিদ্ধান্ত নেবেন, আগে গল্পটা শুনুন।—

'ও না হয় নির্দোষ, ধরে নিলাম। কিন্তু কে বলতে পারে ওকে কবে কোন ডাইনী ভুল রাস্তায় টেনে নিয়ে গেছে। কে জানে কার মতিভ্রম হয়েছিলো। মিষ্টি কথায় কিংবা পয়সা দিয়ে ফাঁসিয়েছে?' সবাই ভাবতে থাকে।

মুসলমান ডাক্তারকে একথা জানালে তিনি তেড়ে বলেন, 'ননসেন্স। দোষ-গুণ নামে কোনো রোগই নেই। এসব বাজে কথা ছেড়ে দাও।' ডাক্তারের এই কথায়, গাঁয়ের লোকেরা ডাক্তারের ওপর বিশ্বাস একেবারে হারাল। এদের এখন একটিমাত্র চিন্তা স্ত্রীলোকটি কে। 'ও স্ত্রীলোকটি কে?' সারা গাঁয়ে সোরগোল পড়ে গেলো। খবরের কাগজে গভর্নর জেনারেলকে গুলি করে মারার খবরে যত না সেনসেশান হয়েছিল তার চেয়ে বেশী হ'লো এই ব্যাপারে। রুগীকে জিজ্ঞেস করবার উপায় নেই, কেন না সে বেহুঁস। তা হলে খোঁজটা পাওয়া যাবে কী করে। গাঁয়ে শার্লক হোমসের মতো কেউ ছিলো না, সবাই ডিটেকটিভ। শেষ পর্যন্ত গাঁয়ের বাইরে কুঁড়ে ঘরে যে নাগীটা থাকত সবাই তাকে সন্দেহ করলো। মাঝরাতে সবাই নাগীর কুঁড়ে ঘরে গিয়ে হামলা করলো। লোকেদের ধারণা নাগী ছাড়া গাঁয়ের আর সব স্ত্রীরাই পতিব্রতা। সবাইর মনে ভয়। নাগীকে এরকমভাবে হামলা না করলে গাঁয়ের সব মেয়েদের ওপরই সন্দেহ আসবে। কনকয়্যার গাঁয়ের সব স্ত্রীলোকদের সঙ্গে বিশেষ করে বিধবাদের সঙ্গে বেশ মেলামেশা ছিল। কেউ ওর চুল আঁচড়ে দিত, কেউ বা ওর জামা সেলাই করে দিত, আবার কেউ আদর করে গালে চুমু খেতো। সবাইর আতঙ্ক, বাজটা তার ঘরে না পড়ে। তাই সবাই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করে নিলো যে তাদের স্ত্রীরা সবাই পতিব্রতা। আর সবাই মিলে নাগীর কুঁড়েতে ধাওয়া করলো। না জানি সেদিন নাগীর কি অবস্থা হ'তো। নাগীর সৌভাগ্য যে রামন্না মদে চুর হয়ে নাগীর ঘরে শুয়ে ছিলো। চেঁচামেচি শুনে বঁটি হাতে রামন্না বেরিয়ে আসে— এসো, কে কত বীরপুরুষ দেখি? এগিয়ে এসো— ওর এই চিৎকার

শুনে সবাই ঘরে ফিরে গেলো। সবাই ভাবলো নাগীর ওপর তাদের সন্দেহ ভিত্তিহীন। একে একে সবাই বাড়ী ফিরে গেলো।

বাড়ীতে কনকয়্য়ার মা-বাপ মহা দুশ্চিন্তায় পড়লেন। কনকয়্য়াই জ্বর আসা থেকে শারদাম্বা বলে ভুল বকছিলো।

শারদাম্বাকে গাঁয়ের সবাই সাক্ষাৎ দেবী মনে করতো। রূপে গুণে আদর্শ গৃহিণী। ভালো ঘরের মেয়ে, তার একমাত্র ছেলে কনকয়্য়াদের দূর সম্পর্কের আত্মীয়। হাইস্কুলে পড়া আরম্ভ করাতে কনকয়্য়া সপ্তাহে তিন দিন ওদের ওখানেই খেতো। টাকাপয়সাও বেশ কিছু পেতো।

তার সামনে পরপুরুষের নাম করার সাহস কারুর ছিল না। যমরাজও না—এমনি সীতার অগ্নিপরীক্ষা যিনি করিয়েছিলেন সেই রামচন্দ্রেরও না। কথাটা কনকয়্য়ার মা-বাপের মনে ধরে না। শারদাম্বা তো সাক্ষাৎ ধর্মাবতার। গাঁয়ের সবাই তাকে মা বলে ডাকে।

গোড়ায় ওর মুখে শারদাম্বার কথা শুনে সবাই ভেবেছিলো যে ওর চিকিৎসার ত্রুটির কথা মনে করে ও শারদাম্বার কথা স্মরণ করছে। অথবা শারদাম্বা ওর কাছে থাকলে ওর কষ্টের লাঘব হবে।

শারদাম্বা কনকয়্য়াকে দুবার দেখতে এসেছিলেন, কান্নাকাটি করে চলে গেছেন। তাঁর বাড়ীতে নবরাত্রির পুজো ও ব্রাহ্মণভোজন চলছিলো বলে তিনি কনকয়্য়াকে দেখার জন্য খুব বেশী আসতে পারছিলেন না। তা নাহলে অষ্টপ্রহর এখানেই বসে থাকতেন। ওঁর ভাবনা-চিন্তা দেখে লোকে আশ্চর্য হয়ে যায়। ভাবে কত করুণা ওঁর।

কবিরাজের দোষ-গুণ রোগনির্ণয় আর কনকয়্য়ার অহরহ

শারদাম্বা শারদাম্বা ভুল বকায় কনকয়্য়ার মা-বাপেরা একবার ভাবলেন যদি শারদাম্বার মত পাওয়া যায় তো ওঁর রক্ত দিয়ে ছেলেকে বাঁচাবার শেষ চেষ্টা করা যেতে পারে।

কিন্তু শারদাম্বার কাছে একথা কে পাড়বে ?

নিরুপায় হয়ে জ্বরে বেহুঁশ ছেলেকে নাড়া দিয়ে মা জিজ্ঞেস করেন, 'বাবা, সোনা আমার, তুমি বার বার শারদাম্বার নাম কেন করছো, কি হয়েছে বাবা, খুলে বলো, আমরা কাউকে বলবো না।' কিন্তু বার বার জিজ্ঞেস করা সত্ত্বেও কোনো সাড়া মিললো না বেহুঁস ছেলে হয় তো কিছু শুনতেই পেল না। কিংবা জবাব দেবে না বলেই দিলো না।

জ্বর ক্রমে বাড়ছে। চব্বিশ ঘণ্টা আর কাটবে কিনা সন্দেহ হতাশ হয়ে মা ভোর হতেই শারদাম্বার খিড়কীতে গিয়ে বসে পড়লে —শারদাম্বার আসার প্রতীক্ষায়।'

'আরে আপনি, আমি ভেবেছিলাম অন্য কেউ। কনকয়্য়া কেমন আছে ?'

'কি আর বলব মা। গোপালম বলেছে আর কোনো আশ নেই। কাল, পরশু…' সে কেঁদে ফেলে। শারদাম্বা ওকে বুকে জড়িয়ে ধরে সান্ত্বনা দেয়। কনকয়্য়ার মা চট করে শারদাম্বার প দুটো জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেলে বলে, 'মা, আমার ছেলেকে ফিরিয়ে দাও মা।' শারদাম্বা হকচকিয়ে যান। তাকে হাত ধরে তুলে বলেন, 'কি করবো বলো, ভগবান ভরসা। তাঁকেই ডাকো চিন্ত কোরো না। আমি ওকে আবার দেখতে যাবো।' এমনভাবে শারদাম্বা কথাগুলো বললেন যেন তিনি কিছুই জানেন না।

'সে কথা বলছি না মা, একমাত্র আপনি আমার ভরসা। আমার

একটিমাত্র সন্তান। একেও যদি হারাই তা হলে কি নিয়ে বেঁচে থাকবো।' বলেই সে হাউ হাউ করে কেঁদে উঠলো।

'আমি কি করতে পারি বোন! আমি তো তোমাদেরই মতো একজন মানুষ, দেবতা তো নই। ঠাকুরের সিঁদুর দিচ্ছি, নিয়ে যাও! ঈশ্বর দয়াময়। তোমার ক্ষতি করবেন না। ধৈর্য ধরো!'

'এমনি জ্বরজ্বারি হলে তো কিছুই ভাবনার ছিলো না। ওষুধ দিলেই সেরে যেতো। কিন্তু লোকে বলছে এ দোষ-গুণ জ্বর। না জানি কে আমার এই উপকার করলো।'

'গোপয়া কে? ও জানেই বা কি? তুমি বিলিতি ওষুধ বন্ধ করে দিলে কেন? পয়সার দরকার তো আমার কাছ থেকে নিতে পারতে। দোষ-গুণ? ঝাঁটা মারো ওর মুখে। একরত্তি ছেলে, তার আবার দোষ-গুণ। লোকে শুনলে পাগল বলবে। তোমরা এসব বিশ্বাস করলে কি কোরে?'

'না মা, এতো দোষ-গুণই, লক্ষণ তো সবই সেইরকম। অন্য কোনো জ্বর হলে এতো ভাবনার ছিলো না।'

'তা হলে গোপয়া ওকে সারিয়ে তুলছে না কেন?'

'ঠিক করবে কি কোরে? তার জন্যে ওষুধের তো দরকার? কে এমন স্ত্রীলোক আছে নিজের ভুল স্বীকার করে আমার ছেলেকে বাঁচাবে, আমার কুল রক্ষা করবে।'

শারদাম্বা ওকে অনেক কিছু শোনাবেন ঠিক করেছিলেন। কিন্তু নিজের মান নিজের কাছে। অপমানের ভয়ে কিছু বললেন না।

'কনকয়্যাকে জিজ্ঞেস করো নি?'

'জিজ্ঞেস তো করেছি। কিন্তু ও তো বেহুঁশ।' এরপর সাহস করে বললো:

'যখন থেকে জ্বর হয়েছে তখন থেকে ওর মুখে ঐ একটা কথা—শারদাম্বা।' একটু থেমে আবার বলে, 'যখনই জিজ্ঞেস করিনা কেন, ও শারদাম্বার নাম করে।'

'বড় ভালো ছেলে। বেচারা আমার কথা শুনতো। যখন যা বলতাম মন দিয়ে করতো।' বলে শারদাম্বা চোখ মুছতে থাকেন।

কনকয়্যার মা আর স্থির থাকতে পারলো না। কাজ হাসিল করার জন্যে বলে :

'ও তো বার বার বলে, শারদাম্বাজী আমাকে কষ্ট দিয়ো না, আমি কিচ্ছু জানি না, আমি সে রকম ছেলে নই।'

'হ্যাঁ, এবার আমার মনে পড়েছে। তিন চারদিন আগে আলমারীতে আমি ছটা টাকা রেখেছিলাম। পরে খুঁজে পাচ্ছিলাম না। ভাবলাম, বোধহয় ওকে কিছু কিনতে দিয়ে পরে ভুলে গেছি। সেই কথাটাই আমি ওকে জিজ্ঞেস করেছিলাম। বোধহয় সেটাই ওর মাথায় ঘুরছে। কত সরল ওর মন।'

আর কোনো আশা নেই দেখে নিরুপায় হয়ে কনকয়্যার মা বলে, 'পাপপুণ্য ভগবানই জানেন মা। আপনাকে সব কথা খুলে বলতে আমার মুখে আটকাচ্ছে। যত সতীসাধ্বী নারীই হোক না কেন, কখন মনে কি ভাব আসে, বলা শক্ত।··· আপনার রক্ত দিয়ে আমার ছেলের প্রাণ বাঁচাতেই হবে। সে শুধু আপনার নাম করেছে।'

শারদাম্বা এমন ব্যবহার করলেন যেন তিনি কিছুই বোঝেন নি। আমার রক্ত নিয়ে কি হবে? হাসপাতালের ডাক্তাররা কি ওকে রক্ত দিতে বলেছে?'

'না মা, এটা যে দোষ গুণ জ্বর।'

শারদাম্বার কাছে এবার ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে যায়। ভীষণ চটে ওঠেন। কি বললে? এ কি ধরনের কথা? সূর্যোদয়ের দিকে তাকিয়ে থেকে কনকয়্য়ার মা বলল, 'যত ভালো লোকই হোক না কেন, মাঝে মাঝে তাদেরও ভুল হয়। আমি আপনাকে কোনো দোষ দিচ্ছি না। আপনার কাছে শুধু আমার ছেলের প্রাণভিক্ষা চাইছি।' তখন ওর কথা শেষ হয় নি, শারদাম্বা ফেটে পড়লেন, 'আর কথা বাড়াস নি, বেরো এখান থেকে। আচ্ছা, তালে এই কথা। তোরা আমাকে এই ভেবেছিস। কনকয়্য়া যেমন তোর ছেলে তেমনি আমারও। যা, যা, এখান থেকে এক্ষুণি যা। আর কাউকে এ-কথা বলিস নি। তোর কি মাথা খারাপ হয়েছে? এখন সোজা বাড়ী যা। যা, যা, আর কেউ যদি শোনে, তোর গায়ে থুতু দেবে।' এই বলে ওকে বাড়ীর বাইরে করে দিয়ে শারদাম্বা ভেতরে চলে যান।

সেদিন সকাল থেকে গাঁয়ের সবাই কনকয়্য়ার বাড়ী যাওয়া ছেড়ে দিল। সবায়ের আতঙ্ক কাকে দেখে কার নাম করে বসবে। মেয়েরা তো ওদিক একেবারেই মাড়াতো না। বিকেল নাগাদ কনকয়্য়ার অবস্থা আরো খারাপের দিকে গেলো। মা-বাপ আশা ছেড়ে দিলো। মাঝরাতে ওরা দুজনে শারদাম্বার বাড়ীর সামনে গিয়ে গালিগালাজ সুরু করে দেয়, তুই আমার ছেলের প্রাণ নিয়েছিস, কুলখাকী, বেশ্যা··· ইত্যাদি।

'সাদাসিদে ভালোমানুষ শুধু কি আমার ছেলেকেই পেলি, এতোই যদি কাম জেগেছিলো তো কোনো পুরুষের কাছে গেলি না কেন, কুলিমজুর জন্তুজানোয়ার তো ছিল।' আরো অনেক কিছু বলতে লাগলো।

শারদাম্বার স্বামী দরজা খুলে ব্যাপারটা কি জানতে চাইলেন,

কনকয়্য়ার মা-বাপ ওঁর পা জড়িয়ে ধরলো। পেছনে কবিরাজ গোপয়্য়া ছিল। শারদাম্বা কিন্তু ঘর থেকে বেরুলেন না।

শারদাম্বার স্বামী এদের কথা এতটুকুও বিশ্বাস করলেন না। নিজের স্ত্রীর প্রতি অবিশ্বাস ও সন্দেহ জাগলেও এমন কে আহাম্মক আছে যে তা বাইরে প্রকাশ করবে? ঘরের ভেতর গিয়ে ব্যাপারটা কি স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলেন।

'একি, তুমি পাগল হলে নাকি? ওরা তো পাগলামি করছে। ওদের উত্তম-মধ্যম দিয়ে ফেরত না পাঠিয়ে আমাকে কিনা জিজ্ঞেস করছো।'

'মেয়েদের ব্যাপার, কে জানে, কি ভরসা? যদি কিছুই না হয়ে থাকে তবে এরা তোমায় সন্দেহ করছে কেন? সত্যি হোক বা না হোক, যদি ছেলেটা মরে যায় তো আজীবন তোমার এই কলঙ্ক থেকে যাবে। লাঞ্ছনা-অপমান যা হবার তা তো হয়েই গেছে; এখন রক্ত দিতে ক্ষতি কি? ও তো এমনিতেই বাঁচবে না। তোমার রক্ত দেওয়ার পর না বাঁচলে সবাই ভাববে তুমি নির্দোষ।' শারদাম্বাকে তাঁর স্বামী বোঝানোর চেষ্টা করেন।

'ছিঃ, ছিঃ, ছিঃ, এ-সব কথা তুমি আমার সামনে মুখে এনো না। যদি রক্ত দিই, তার মানে দাঁড়াবে আমি দোষ স্বীকার করে নিয়েছি। মুখপোড়া আমার নাম করছে কেন বারবার। ওকে নিয়ে এরা…'

'সবই তোমার অদৃষ্ট। কি আর করবে। ভেবে দেখো? ওদের কথা ছাড়ো। তুমি আমার কথা শোনো। রক্ত দিয়ে দাও।' এই-ভাবে শারদাম্বার স্বামী তাঁকে অনেক বোঝাবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু কিছুতেই সে রাজী হ'লো না।

কিন্তু তার স্বামীও জেদ ধরে রইলেন। ধরো না কেন, কারুর প্রাণ বাঁচাতে তোমার সামান্য এই স্বার্থত্যাগ। পুরাণ থেকে পতিব্রতা

স্ত্রীদের উদাহরণ দিতে আরম্ভ করলেন। রাজা শিবির শরীর থেকে মাংস কেটে দেওয়া আর কর্ণের গায়ের চামড়া খুলে দেওয়ার কথা তিনি স্মরণ করিয়ে দেন। কনকয়্য়ার মা-বাপ আর কবিরাজকে দিয়ে শপথ করিয়ে নিলেন। একথা যেন আর কেউ জানতে না পারে। এতেও শারদাম্বা রাজী হলেন না। তখন কোনো উপায় না দেখে ওঁর হাত-পা বেঁধে ওঁর উরু থেকে রক্ত বার করে নেওয়া হ'লো। নিয়ে গিয়ে কনকয়্য়ার চোখে লাগিয়ে দেওয়া হ'লো।

হপ্তাখানেকের মধ্যে কনকয়্য়া সেরে উঠে স্কুল যেতে লাগলো! —এতোটুকু বলে ডাঃ কামেশ্বর রাও চুপ করলেন।

'আচ্ছা, ডাক্তার, দোষ-গুণ বলে সত্যি কি কোনো রোগ আছে?' ভেঙ্কটপপয়য়া জিজ্ঞেস করে।

সমুদ্রের ওপর মেঘ ছেয়ে গেছে। ফুরফুরে হাওয়া ঢেউয়ের সঙ্গে যেন খেলা করছে। সমুদ্রর দুভাগে ভাগ হয়ে গিয়ে যেন রাস্তা তৈরী হয়েছে। শান্ত, স্নিগ্ধ হাওয়া।

'দোষ-গুণ রোগ থাকবে না কেন, নিশ্চয়ই আছে।'

'কিন্তু আমাদের বইয়েতে তো কিছু লেখা নেই।'

'একটা কথা বলি, শুনলে, পরে পস্তাবে না। যখন তোমরা ডাক্তার হয়ে বেরোবে তখন দেখবে বইয়ের ওপর কিছুদিন পরে আর আস্থা থাকবে না। তা যদি না হয় তবে লোকে তোমাদের বোকা ভাববে।'

'তবে পড়াশোনা কিসের জন্যে?'

'আমাদের কি করা উচিত, এই জন্যে। আর আমরা যে কত কম বুঝি, তা জানতে।'

'ঐ রক্তই তার ওষুধ?'

'এখনও পর্যন্ত এটুকুই জানা গেছে।'

'তা হলে কি করে বুঝব, কোনটা দোষ-গুণ জ্বর?'

'জানার কি দরকার?'

'মানে?'

'যে বাঁচতে চায়, সে দোষ-গুণ রোগ সারাবার জন্যে এ্যালাপ্যাথিক ডাক্তারের কাছে যাবে না।'

'এমনি জ্বরজ্বারি ভেবে যদি আমাদের কাছে আসে…'

'যদি আসে তো রুগী মরবে। তাতে আপনার কি এসে যায়। আপনার ফি আপনি পেয়ে যাবেন।'

'ডাক্তারের বদনাম হবে না?'

'কিছুই হবে না। বলবো, রুগীর দিন ফুরিয়ে এসেছিলো। আমরা তো আর ভগবান নই যে বাঁচিয়ে দেবো।'

'আমাদের দেশের পক্ষে কবিরাজী কি বেশি উপকারী?'

'মোটেই না। কারণ, কি করা উচিত বা অনুচিত কবিরাজও জানে না।'

'আচ্ছা, তর্ক থাক। আপনার গল্প কি শেষ হয়েছে? না আরো আছে। আমাকে এক্ষুণি গিয়ে দেখতে হবে রুগীটার মুখ থেকে রক্ত ওঠা বন্ধ হয়েছে কিনা।' নার্স এলিজাবেথ বলে ওঠে।

'আর একটু বাকী।'

'তা হলে এতো সব ভণ্ডামী ঐ সতী সাধ্বীরই কাজ।' নার্স বালম্মা আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করে।

'এতে আর ভণ্ডামীর কি আছে? সবাই যা করে ও তাই-ই করেছে। ও ভাবতেও পারে নি ব্যাপারটা এত দূর গড়াবে। মন্দ কপালটা তো ওখানেই।'

‘কিন্তু ওর জন্যে তো একটা নিরীহ বালক মরতে বসেছিলো। তার মা-বাপ কেঁদেকেটে প্রায় অন্ধ হবার যোগাড়। অথচ কি কঠিন হৃদয় ওর। ও মানুষ নয়, ডাইনী।’

‘বাইরের লোকের তাই মনে হবে। কিন্তু ওর জায়গায় আমরা যদি নিজেদের বিচার করি তা হলে দেখবে আমরা ওব চেয়ে খুব বেশি উদার নই। এটা আত্ম-বিশ্লেষণের ব্যাপার। তখন তার বয়স প্রায় চল্লিশের কোঠায়। সে মান সম্মানের সঙ্গেই…’

‘এ ধরনের স্ত্রীলোকের এ কাজ করাই উচিত নয়।’

‘অবোধ বালকের সঙ্গে।’

‘কে জানে আগ্রহটা কার বেশী ছিলো। ছেলেটির না স্ত্রীলোকটির? সঠিক বলা মুশকিল।’

‘ওতো স্কুলে-পড়া ছেলে। ও কেন জোর করবে?’

‘ও তো সংসারী। স্বামী, এক ছেলে, দুই মেয়ে। তিন তিনটে সন্তানের মা। ছেলেটি তার ছেলের সমান।’

‘ডাক্তার, আপনি কি বলেন?’

‘জানি না। কিন্তু অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি…’

‘দেখে মনে হয় এ-সব ব্যাপারে আপনার খুব অভিজ্ঞতা আছে।’

‘এতে অভিজ্ঞতার দরকার হয় না। শুধু রুগী দেখে আর বইয়েতে লেখা ওষুধের প্রেসক্রিপশান লিখলেই অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করা যায় না। কিন্তু যারা আমাদের ওপর বিশ্বাস রেখে আমাদের কাছে আসে, তাদের সম্বন্ধে প্রথমে দেখতে হবে কি পরিস্থিতিতে পড়ে তাদের রোগ হয়েছে। শুধু ওষুধ দিলেই কাজ হয় না। তারা কি খায়, তাদের শারীরিক অবস্থা, আর বিশেষ করে মানসিক অবস্থা সব দেখতে হবে, বুঝতে হবে। বৈদ্য কথাটার কত গভীর অর্থ।’

এইভাবে যদি রুগী দেখতে হয়, তা হলে আমাদের আর অন্য কিছুই করার থাকবে না।'

'হ্যাঁ, কিছুই করতে পারবে না। আমাদের পরামর্শ মতো তিন ভাগ লোকই তো পথ্য পায় না। ও সব কথা থাক। রুগী দেখেই আমার অভিজ্ঞতা।' কথাটা শেষ করে রামেশ্বর রাও সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

'আপনি সমুদ্রের ঢেউ আর ফেনা দেখছেন তো! ঐ ঢেউ আর ফেনা যদি রোগ হয় তবে কত ঢেউকে বাধা দেবেন আর জল থেকে কত ফেনা তুলে ফেলবেন?'

'আমায় এক্ষুণি যেতে হবে। আপনি গল্পটা শেষ করবেন কি না?' নার্স বালম্মা বলে।

'তারপর? তারপর কনকয়্যা যেন কিরকম হয়ে গেলো। স্কুলের মাস্টাররা কিছুই বলতো না। 'কনকয়্যা' বলে ডাকলেই আমাদের হাসি পেতো। কৌতূহলও জাগতো। কারুর বা করুণাও। কি রকম ছিল রে? কি করে কি করলি?— এই ধরনের নানারকম প্রশ্নে ওকে জর্জরিত করতাম। সে রেগেমেগে বলতো, যাও ভাগো। আর বলবেই বা কি? শারদাম্বার বাড়ী যাবার নামও মুখে আনতো না। বাচ্ছারা ওর পিছনে লাগতো। 'শারদাম্বা' 'শারদাম্বা' বলে চিৎকার করতো। গাঁয়ের কেউ আর তাকে বাড়ীতে ঢুকতে দিতো না। কিছুদিন পরে সে মা-বাপকে ফেলে পালালো।

'আর ফিরে এলো না?'

'না। এতসবের পর শারদাম্বার স্বামী তার সঙ্গে কি রকম ব্যবহার করেছিলো সহজেই আমরা আন্দাজ করতে পারি। কর্ণের গায়ের চামড়া খুলে দেবার পর কিংবা দধীচির মেরুদণ্ড দান করার পর কি

অবস্থা হয়েছিলো জানা নেই। কিন্তু শারদাম্বার স্বামীর দৃঢ় বিশ্বাস ছিলো কনকয়্য়া বাঁচবে না আর তার স্ত্রী যে কত বড় পতিব্রতা তা সকলের কাছে একটা আদর্শ হয়ে দাঁড়াবে। জানকী যদি আগুনে পুড়ে যেতেন তা হলে শ্রীরামের কি অবস্থা হত? আগুনের ভেতর থেকে সীতা যদি আধপোড়া অবস্থায় বেবিয়ে আসতেন তা হলে কি হ'তো? সারা গাঁয়ে ঢি ঢি পড়ে গেল, লোকদের কৌতূহলের শেষ নেই। কোনো না কোনো অছিলায় গাঁয়ের মেয়েরা শারদাম্বার বাড়ীতে ধাওয়া করে। এতদিন ওর সম্বন্ধে লোকেদের যে উচ্চ ধারণা ছিলো তা আর রইল না। সম্মানও শেষ হয়ে গেল।

হঠাৎ একদিন গাঁ ছেড়ে উধাও। লোকে বলাবলি করে, শারদাম্বা বোনঝির ছেলেপুলে হবে বলে বোনের গাঁয়েতে বেড়াতে গেছে। কিন্তু সে আর ফিরে এলো না। ওর ছেলে সুব্রমনিয়াম আমার সঙ্গে স্কুলে পড়তো। আমাদের টিটকিরিতে বিরক্ত হয়ে সেও স্কুলে আসা ছেড়ে দিলো। গাঁয়ে ঘুরে বেড়ানো কিংবা খেলা করাও তার পক্ষে অসম্ভব হয়ে দাঁড়ালো। শুধু তাই নয়। দুবছরও গড়ালো না। তার বাবা সস্তায় সব জমিজমা বিক্রি করে দিয়ে ছেলেকে সঙ্গে করে গাঁ ছেড়ে চলে গেলো। মেয়ে দুটোর আগেই বিয়ে হয়ে গেছিল, তারা তখন শ্বশুরবাড়ী ছিল, তা না হলে মেয়ে দুটোরও বিয়ে হ'তো না।' এই পর্যন্ত বলে কামেশ্বর রাও থেমে যান।

'গল্প এখানেই শেষ?' নার্স বালম্মা জিজ্ঞেস করে।

'হ্যাঁ।'

'তা হলে, এরাই সেই লোক?'

'বাইরে যে অভাগী দাঁড়িয়ে আছে, ঐ হচ্ছে শারদাম্মা। গাঁ ছাড়ার পর ওদের অবস্থা খুব খারাপ হয়ে যায়। বাপ খুব তাড়াতাড়ি

মারা যায়। ছেলেটারও বিয়ে হ'লো না। কেউ দিতে রাজী হয় নি।'

'এতোদিন ওর মা কোথায় ছিল ?'

'এতে আবার প্রশ্ন করার কি আছে ? এসব তো আগে থেকেই ঠিক হয়েছিলো। কনকয়্র সঙ্গে ঘর বেঁধেছিলো নিশ্চয়ই। বুড়ীকে ছেলেটা আর কতদিনই বা পুষবে। নিরুপায় হয়ে কারুর বাড়ী ঝি-গিরি করছিলো হয়তো।' মেডিকেলের ছাত্র চৌধরী নাগ্‌য়্য়া বলে।

'দেখলেন তো মানবচরিত্র কি বিচিত্র। একটা ছোট ছেলের মোহে পড়ে নিজের সংসারটা ছারখার করে দিলো।'

'সবাই তাই বলে এরকম হয় না। সংসারকে উদ্ধার করার জন্যে কখনও কখনও এই ধরনের দু-একজন মহাত্মার আবির্ভাব ঘটে।'

'ওর লজ্জাঘেন্নাও নেই, ছেলের সঙ্গে আবার দেখা করতে আসে।'

'যাই হোক না কেন। হাজার হোক মায়ের প্রাণ, স্থির থাকতে পারে না।'

'কনকয়্য়ার কি হ'লো, কে জানে ?'

'ছেড়ে চলে গেছে নিশ্চয়ই। জোয়ান ছেলে, এই বুড়ীর ভরসার আর কতদিনই বা থাকবে ?'

'কে জানে তার মা-বাপই বা কোথায় আছে।'

'কিছুদিন পরেই মারা যায়।' কথাটা শেষ করে কামেশ্বর রাও উঠে পড়েন।

'আপনি আর কোনোদিন কনকয়্য়াকে দেখেন নি ?' নার্স বালম্মা জিজ্ঞেস করে।

'দেখবো না কেন ? কনকয়্য়াই তো আমি নিজে।' এই বলে ডাক্তার বারান্দায় বাঁক ফিরলেন।

কয়েক মুহূর্ত সবাই হতবাক। পাঁচজনেই চট করে উঠে গিয়ে কামেশ্বর রাওকে ঘিরে ধরলো।

‘ডাক্তার, এটা কি সত্যি ?’

‘হ্যাঁ, সত্যি ?’

সবাই ওঁকে ঘিরে ধরেছে, যেতে দিচ্ছে না।

‘এইবার আসল কথাটা বলুন, সত্যিকারের কি হয়েছিলো ?’

‘কি হয়েছিলো, কি করে হয়েছিলো ?’

‘কি ?’

‘আপনি অস্থুস্থ হয়ে পড়েছিলেন কি করে ?’

‘বুড়ো আঙুলে চোট লেগেছিল, সেটা পেকে সেপটিক হয়ে যায়, আমি জ্বরে পড়ি।’

‘ওটা তা হলে দোষ-গুণ নয় ?’

‘না।’

‘ও আর তারপর কিছু করে নি ?’

‘জানি না ও কি করেছে। কিন্তু আমার সঙ্গে কিছু করে নি। মেডিকেল কলেজে ভর্তি হবার পর আমার সহপাঠী মেয়েরা আমার নিস্পৃহ ভাব দেখে যতদিন না আমার সঙ্গে মেলামেশা সুরু করে ততদিন পর্যন্ত মেয়েদের সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক ছিল না। এখনও মেয়েদের সঙ্গে মেলামেশা করতে বাধো বাধো ঠেকে।’

‘তা হলে বলতে চান, ও একেবারে কিছুই জানে না ?’

‘ও বেচারী সত্যিই কিছু জানতো না।’

‘আপনার অসুখ তা হলে সারলো কি করে ?’

‘ওর ওপর এতো অন্যায় অবিচার দেখেও আপনি চুপ করে ছিলেন ?’

'আসলে ব্যাপারটা যে কী, আমি কি ছাই জানতাম! শুধু এটুকু জানতাম সারা গাঁ আমাদের শক্র। আমার চিকিৎসার ব্যাপারে মা অবশ্য মাঝে মাঝে বলতো, আমি কিন্তু সব কথা ঠিক বুঝতে পারতাম না: যখন জানলাম শারদাম্মা ওর শরীরের রক্ত দিয়ে আমায় বাঁচিয়েছে তখন শ্রদ্ধায় আমার মাথা নুইয়ে আসে। আমি ভাবতাম, এইভাবে রক্ত দিতে কোনো স্ত্রীলোকই রাজী হবে না। তাই তিনি আমার পরম আরাধ্যা। আজও তিনি আমার কাছে আদর্শ নারী। তাঁর শিষ্টাচার, দয়া, দাক্ষিণ্য, অতিথি-সৎকার, নম্রতা ও উদারতা—আদর্শ গৃহিণীর সব কটা গুণই তাঁর ছিল। ভালো হয়ে আমি ওঁর সঙ্গে দেখা করে বলেছিলাম সারা জীবন ওঁর চরণাশ্রিত হয়ে থাকবো। কিন্তু আমাকে দেখে এত ভয় পেয়ে গেলেন যেন ভূত দেখেছেন। তাড়াতাড়ি দরজা বন্ধ করে দিয়েছিলেন। মনে বড় আঘাত পেয়েছিলাম। গাঁয়ে আর থাকতে মন চাইলো না। আমার পড়াশোনার খরচও সবাই বন্ধ করে দেয়। গাঁয়ের লোকেরা আমাকে বাড়ীতেও ঢুকতে দিতো না। মা-বাপও আমাকে ঘৃণা করতে লাগলো।'

'পরে আর আপনি ওর কোনো খোঁজই করেন নি?'

'পরের কথা আমি কি করে জানবো। গাঁ ছেড়ে সোজা কাশী যাই। নাম পালটিয়ে ধরমশালায় থেকে পড়াশোনা করি। তারপর এই প্রথম ওকে দেখছি।'

'আপনি ওর সঙ্গে কথা বলেন নি?'

'ও আমাকে চিনতে পারে নি। যখন নিজের পরিচয় দিলাম তখন চিৎকার করে পালিয়ে গেলো।'

'আপনার উপর ওর এতো রাগ কেন?'

'এতে অবাক হবার কি আছে? আমার জন্যেই তো ওর সারাটা জীবন নষ্ট হয়ে গেলো! আমি ভুল না বকলে এই গণ্ডগোল হ'তো না।'

'আপনি বকবক করছিলেন কেন?'

'তা কি করে বলবো। ওঁর প্রতি আমার শ্রদ্ধা, ভক্তি ছিল, ওঁকে আমি দেবী ভাবতাম। হয়তো ভেবেছিলাম, ওঁর নাম নিলে আমার রোগ ভালো হয়ে যাবে।'

'আপনি এতো সব কথা জানলেন কি করে?'

'পরে ঐ গাঁয়ে গিয়ে সব খবর নিয়েছিলাম।' কথাটা বলেই কামেশ্বর রাও নিজের ওয়ার্ডে চলে গেলেন। বাকী সবাই যে যার নিজের কাজে চলে গেলো।

পুরো গল্পটাই আমি পর্দার আড়ালে বসে শুনলাম। সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে ভাবতে থাকি।—

এই জীবন আর আমাদের জীবনে এই যে সব অঘটন ঘটে এর অর্থ কি? ওদের জীবন এমনভাবে নষ্ট হয়ে গেলো কেন? এই সতী-সাধ্বী এতো পূজোপাঠ, এতো দানধ্যান, এতো যে ব্রাহ্মণভোজন, এরা তার কি ফল পেলো? এক অভাগা ছাত্রকে দয়া দেখাতে গিয়েই তো তার এত বড় সর্বনাশ। ওর জন্যে ওর স্বামী-পুত্রকেও এর ফল ভোগ করতে হ'লো। এতগুলো বছর ধরে না-জানি কত না ঝড় ওর ওপর দিয়ে গেছে, না-জানি কত দুঃখকষ্ট ওকে সহ্য করতে হয়েছে। মানুষও কুকুরের মতো। মালিক কুকুরের পেটে লাথি মারলে, কেন তাকে লাথি মারলো সে ভাবে না। মালিকের মুখের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে ল্যাজ নাড়তে থাকে। এই যে এত দুঃখকষ্ট, একি মানুষের গড়া, না ভগবানের দান? সমাজ— সমাজই এর জন্যে

দায়ী— আজকাল তাই সাহিত্যিকরা সমাজকে নিয়েই পড়েছেন। সমাজ মানেই তো আমরা। আমাদের কি করা উচিত? কি করে সমাজের মধ্যে পরিবর্তন আনা যায়? যারা এদের গাঁয়ে থাকতে দেয় নি, তারা আমাদের মতোই তো মানুষ। কিন্তু সেদিন শারদাম্মাকে যে দোষে দোষী করা হয় তার প্রতিবাদ করে তাকে নিষ্কলঙ্ক প্রমাণ করার জন্যে কেউ কি এগিয়ে এসেছিল? একটা ছোট ছেলের সঙ্গে শারদাম্মার মতো সতীসাধ্বী স্ত্রী যা করেছিলো তা জানার পর লোকে যদি তাকে ঘৃণা করে তাতেই বা কি বলার আছে? সমাজে যদি এ ধরনের ব্যভিচার চলে, তবে শারদাম্মার কাজটা কোনো গর্হিত কাজ নয়। আর এটাকে যদি খুব ভালো কাজ বলে ধরে নেওয়া হয়, তা হলে খারাপ কাজ কোনটা? ভালোমন্দের ভেদাভেদ যদি না থাকে, তা হলে সমাজ আর সভ্যতার আধার কি?

হ্যাঁ, জীবনটাই এই। একে অদৃষ্ট বলবে না তো কি বলবে? যদি এটাই সত্য হয়, তা হলে ভাগ্য বলে কিছু নেই, ভগবান বলে কিছু নেই, ন্যায় নেই, সত্য নেই— এই সমস্ত সৃষ্টি একটা চেতনাহীন, দৃষ্টিহীন যোগাযোগ মাত্র। সমুদ্রের অসংখ্য জলকণা ওপরে ছড়িয়ে পড়ে— রোদ্দুর লেগে মাঝে মাঝে চিক্‌চিক্ করে। কিছু মাটিতে পড়ে মিলিয়ে যায়। কিছু বালিতে পড়ে শুকিয়ে যায়। কিছুটা আবার সমুদ্রের মধ্যেই লীন হয়ে যায়। মানুষের জীবনধারাও এই রকম, এর চেয়ে বেশি কিছু নয়।

তাই এই জীবনের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে ভাবনা-চিন্তা অবিবেচকের কাজ। তবে হৃদয় বলে বস্তুটা যার আছে সে একেবারে উদাসীনই বা থাকে কি করে? এতদিন ধরে এই কথাটা চিন্তা করেও কি আসল জিনিসটা মানুষ উপলব্ধি করতে পারলো না? লাভই বা

কি ? উদার দৃষ্টিভঙ্গী যাদের তারা হয়তো কিছুদূর চিন্তা করে একটা কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছে সন্তুষ্ট হয়। এই চিন্তাধারায় কিছু প্রামাণিক সিদ্ধান্তে পৌঁছোলে মানুষ শান্তি পায় না। তা সত্ত্বেও এ সব সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে একটা সংশয় থেকেই যায়। যারা মনে করে এই সামান্য কথা জানতেই সব জানা শেষ হয়ে গেছে তারা দুর্বলচেতা ও আলসে। এতে হয়তো কিছুটা সত্য আছে। কিন্তু সব জানা শেষ হয়ে গেছে, আর কিছু জানার নেই মনে করাটা আমি আলসেমি ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারি না।

অনুতাপ নয়

কমলম্মা আবার হুটো শাড়ী কিনে আনতে বলেছে। আগে যে হুটো শাড়ী এনে দিয়েছিলাম তা কমলম্মার বান্ধবীদের খুব পছন্দ হয়েছিলো। ওদের ধারণা কাকে কোন শাড়ী পরলে মানায় তাতে নাকি আমার বেশ দক্ষতা। কাপড়ের খোল, বুনুনি আর বর্ডারের ম্যাচিং ; এ সব আমি যত ভালো বুঝি তত ভালো আর কেউ নাকি বোঝে না। সত্যি বলতে কি এ সব বিষয় যাচাই করার বিশেষ কোনো ক্ষমতা আমার নেই। এ নিয়ে মিথ্যে বড়াই করারও কিছু নেই। আমার স্বীকার করতেও লজ্জা নেই যে এ বিষয়ে আমি কিছুই জানি না। মহাভারতে কোনো এক প্রসঙ্গে ধর্মরাজ ধর্মের প্রতীক হিসেবে প্রসিদ্ধিলাভ করেন। পরে জানা যায় তাঁর এই সুনাম রাখতে গিয়ে তাঁকে বেশ ঝক্কি পোহাতে হয়েছিলো। লোকেরা যখন আমাদের পুরোপুরি বুঝতে পারে না তখন বেশ মুশকিলে পড়তে হয়। পূরোপুরি বুঝতে পারলে না জানি আরো কত হয়রানি হ'তো। কিছু লোকের সম্বন্ধে কিছু কিছু ধারণা মানুষের বদ্ধমূল হয়ে যায়। তাই লোকেদের প্রতি সেইরকম আচরণও করতে হয়। আর এই ধারণাগুলো যে মিথ্যে নয় তা দেখাতে গিয়ে রীতিমত অভিনয় করতে হয়।

যেদিন থেকে কমলম্মা আমায় শাড়ী কেনার মুরুব্বী ঠাওরেছে সেদিন থেকে শাড়ীর দোকানগুলোয় ঢুঁ মারা আমার নিত্যকার কাজ।

খদ্দের সেজে দোকানে ঢোকা, নানারকম শাড়ী দেখা, কোন শাড়ীটায় কাকে ভালো দেখাবে তা আঁচ করা, তার দাম, কোথাকার শাড়ী ইত্যাদি খবরাখবর নেওয়া যেন দৈনন্দিন কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

শহরের কাজ সেরে কমলম্মার জন্যে শাড়ী কিনতে যখন দোকানে ঢুকি তখন বিকেল চারটে। দোকানদার হরেক রকমের শাড়ী সামনে খুলে ধরে। শাড়ীর বিষয়ে বলতে থাকে। পনেরো বিশ মিনিট ধরে মন দিয়ে দেখেও কোন শাড়ীটা সেরা ঠিক করে উঠতে পারলাম না। সব কটা শাড়ীই ভালো ঠেকলো। আশ্চর্যের ব্যাপার সবচেয়ে দামী শাড়ীটাই সবচেয়ে বেশি পছন্দ। শাড়ীগুলো দেখতে দেখতে আমাদের দেশের কারিগরদের শিল্পনৈপুণ্যের কথা ভাবি। আগের দিনে আমাদের দেশে হয়তো আরো ভালো কারিগর ছিলো। দেশলায়ের খোল থেকে শাড়ী বার করে পরতেন মমতাজ বেগম। ঝান্সীর লক্ষ্মীবাঈ, তারও আগে গার্গী, মন্দোদরী, দময়ন্তীর কথা ও শাড়ীর প্রসঙ্গে দ্রৌপদীর কথা মনে পড়ে। এদের সুন্দর রূপ কল্পনা করতেও বেশ ভালো লাগে।

শাড়ীর ডিজাইন ও প্রিন্টিং-এর সূক্ষ্ম কাজ দেখে আর এই সব নারীমূর্তি কল্পনা করে— যারা এই সব কাপড় বার করেছে তাদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠি। আমাদের মুখ দেখে দোকানী বিরক্ত হয়ে বলে, 'বাবু, কিনবেন কিছু ?' তার কোঁচকান মুখ দেখে রঙীন কল্পনা ছিন্নভিন্ন হয়ে যায় ; ঠাকুরমার তৈরী ছেঁড়া তেলচিটে কাঁথার মধ্যে থেকে ছেঁড়া ন্যাকড়াগুলো ঠিক যেভাবে বেরিয়ে আসে অনেকটা যেন তেমনি।

আজও ঠিক সেই অবস্থা। দোকানদার বিরক্ত হয়ে অন্য একজন খদ্দেরকে কাপড় দেখাতে অন্যত্র চলে গেলো। মমতাজ বেগম,

ঝান্সীর লক্ষ্মীবাই, গার্গী, মন্দোদরী, দময়ন্তী ও দ্রৌপদীর মতো মহিলারা 'এটা চাই', 'ওটা চাই', 'এটা নয়', 'ওটা দাও' এই রকম কত সব মন্তব্য করে নিজের নিজের পছন্দমত শাড়ী বাছিলেন। ওদের ব্যাপারই আলাদা। ওরা যা খুশী বলতে পারে। ওদের গায়ের রঙ কাঁচা সোনার মত। যে শাড়ীটাই পরুক না কেন মানাবে। কিন্তু কমলম্মার গায়ের রঙ ময়লা। ময়লা না বলে উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ বলাই নিরাপদ। তাই ক্যাটকঁ্যাটে ফাষ্ট কলারের শাড়ীগুলো সরিয়ে রেখে আমি হালকা রঙের শাড়ীগুলো দেখছিলাম। এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখি দোকানে স্ত্রীপুরুষের বেশ ভিড়। ঐ ভিড়ের মধ্যে অনেক কষ্টে দোকানদারকে খুঁজে বার করে ইশারায় কাছে ডাকলাম। শাড়ীর গাদা থেকে একটা শাড়ী বার করে পাশে দাঁড়িয়ে থাকা লোকটিকে লক্ষ্য না করেই সহজভাবে জিজ্ঞেস করলাম, 'এই শাড়ীটা কি ঠিক হবে?'

'এটার চেয়ে ঐ সিমেন্ট রঙের শাড়ীটা অনেক ভালো।' পাশ থেকে একজন উত্তর দিলেন।

আমি চমকে উঠলাম। মুখ ফিরিয়ে দেখি একজন মহিলা। ভাবলাম ক্ষমা চাই। কিন্তু নিজের চেয়ে বয়সে ছোট একজন মহিলার কাছে ক্ষমা চাইতে মন সরলো না। দেখে মনে হ'লো কুড়িও পার হয় নি।

'তা না হলে ঐ স্নাফ্‌কালারের শাড়ীটাও চমৎকার।' আবার সেই মহিলার উক্তি। এঁর পছন্দ করা শাড়ীগুলো বাতিল করতে ইচ্ছে হ'লো না। কিন্তু কমলম্মাকে সিমেণ্ট কিংবা স্নাফ্‌কালারের শাড়ী যে মোটেই মানাবে না।

'কালো গায়ের রঙের সঙ্গে এটা কি ঠিক মানাবে?'

'আমার চেয়েও কালো ?'

ও মোটেই কালো নয়। ফর্সাদের মধ্যে অনায়াসেই ধরা যায়।

'তা নয়··· আপনার রঙ··· আপনি······ ?' ঠিক বুঝে উঠতে পারছিলাম না আমার কথাটা ওঁকে কিভাবে বোঝাই। উনি একটু মুচকি হাসলেন।

'খুবই কালো ধরুন,' বলতে গিয়ে নিজেই হেসে ফেলি।

'এ শাড়ী কার জন্যে কিনছেন ?' জিজ্ঞেস করে।

'কমলম্মা নামে এক আত্মীয়ার জন্যে।'

মেয়েরা যতই দেরী করুন না কেন দোকানদাররা মোটেই বিরক্ত হয় না। তারা চটপট পাশে এসে দাঁড়ায়। ভদ্রমহিলার কথাবার্তায় জড়তা না থাকায় আমার সাহস একটু বেড়ে গেলো।

'আপনি যে শাড়ীটা পরে আছেন বেশ সুন্দর।' এই রকম বললে মেয়েরা যে খুব খুশী হয় তা আমি জানি।

'এই শাড়ী···' নিজের শাড়ীর দিকে সে তাকালো।

'এটা মাদ্রাজে কিনেছিলাম, পুরোনো হয়ে গেছে।'

'আমার ধারণা এই ধরনের শাড়ী এখানে পাওয়া যাবে না।' মনে মনে বিড় বিড় করতে থাকি। কিছুক্ষণের মধ্যেই সে দুটো শাড়ী পছন্দ করে বিল আনতে বললো।

'কিছু ঠিক করতে পারছি না। আপনি একটু পছন্দ করে দিন। আমার মনে হচ্ছে, শাড়ী-টাড়ী আপনি বেশ ভালো চেনেন।' আমার কথায় বেশ একটু গর্ববোধ করে মেয়েটি হাসল।

'কমলম্মাকে সঙ্গে করে দোকানে নিয়ে আসেন নি কেন ?'

'আমিও এ শহরে থাকি না।'

দুটো শাড়ী বেছে দিলো। কমলম্মার রাগের পরোয়া না করে

আমি সিমেণ্ট রঙের শাড়ীটাও কিনে নিলাম। ভেতরে ভেতরে একটু গর্ববোধ করে মেয়েটি ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালো। দোকানদার বিলের বাকী পয়সা ফেরত আনতে যতক্ষণ সময় নিচ্ছিল আমি ততক্ষণ মেয়েটির দিকেই তাকিয়েছিলাম। সত্যি কথা বলতে কি মেয়েদের সঙ্গে কথা বলতে আমি খুব লজ্জা পাই। পরস্ত্রীকে দেখে তো লজ্জা পেতাম।

ওর এই সরল সহজ আত্মীয়তা, আমার সঙ্গে নিঃসঙ্কোচে কথা বলা, দোকানদারের সঙ্গে বেশ সমঝদারের মতো দরদস্তুর করার ভঙ্গী,একটি অপরিচিতা যুবতীর সান্নিধ্যে— সব মিলেমিশে কেমন যেন ওর প্রতি মনটা আকৃষ্ট হ'লো। আমি ওর সঙ্গে সহজভাবেই কথাবার্তা বলতে লাগলাম। কথা বলার সময় একবারও ভাবি নি ও সুন্দরী কি না।

'ব্লাউজের কাপড় কিনবেন না?' প্রশ্ন করে। আমি একটু হেসে ওর কাঁধের দিকে তাকাই। দুতিনটে হার দেখতে পেলাম। লাল রঙের শাড়ীর আঁচল দিয়ে কাঁধটা ঢেকে দিলো। আঁচলটা পেছনে ঝুলিয়ে দেয়।

'এগুলোর মধ্যে আপনার কোনটা পছন্দ?' আরো কয়েকটা কাপড় দেখিয়ে ও জিজ্ঞেস করে।

ভিড় কমে এসেছে।

দোকানদারের ঘড়িতে ঢঙ্ করে সাড়ে চারটে বাজলো। কাপড়ের থলিটা নিয়ে দোকানের দরজার কাছে গিয়ে দেখি বেশ জোরে ঝিরঝিরে বৃষ্টি পড়ছে। ভদ্রমহিলাও আমার সঙ্গে সঙ্গে এলো।

'এই বৃষ্টিতে কি করে যাই?'

'আমিও ভাবছি।' দোকানদার একটা চেয়ার এনে দিলো। ও তাতে বসলো।

'আপনার জন্যে ?'

'থাক্, দরকার নেই।'

'আপনি কি কাজ করেন ?'

'কিছুই করি না। মাঝে মধ্যে গল্পটল্প লিখি।'

'তাই নাকি ?' আশ্চর্য হয়ে বলে।

একথা কেন বললাম। আপশোষ হোলো। গল্প লেখার বিষয়ে অপরের সঙ্গে বিশেষ করে মহিলাদের সঙ্গে চর্চা করা আমি আদৌ পছন্দ করি না।

'আপনার নাম তো কখনও শুনি নি ? সত্যি বলতে কি পড়াশুনো বিশেষ করি না। স্কুলের বই পড়তেই সময় কেটে যায়।'

হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম।

'গল্প মানে কি উপন্যাস ?'

'খুব বড় গল্পকেই উপন্যাস বলে।'

আমার বিষয়ে অনেক কিছু জানতে চাইল। নিজের বিষয়েও অনেক কিছু বললো। আমাদের জীবনধারার মধ্যে কোনো মিল খুঁজে পেলাম না। আমার বাবার পেশা আলাদা। ওর মা-বাবা তুজনেই মারা গেছেন। বড় ভাই উকিল। কাছেই থাকেন। নিজের মার অনেক কথাই বললো। আজেবাজে কথা নিয়ে আলোচনা করার আগেই বৃষ্টি ধরে গেলো। ও উঠে পড়লো। আমিও পা বাড়লাম। এই সময় হঠাৎ এক প্রশ্ন করে ও আমায় বিব্রত করলো।

'আপনি কি বিয়ে করেছেন ?'

'না।'

আমরা রাস্তায় নেমে পড়লাম। বাইরে বেশ ঠাণ্ডা হাওয়া। ঠাণ্ডায় পাখীদের কিচ্‌কিচ্‌ আওয়াজও কেঁপে কেঁপে উঠছে।

'আপনার?' আস্তে প্রশ্ন করি।

কফি খেতে ইচ্ছে হয়। বলেও ফেললাম। ও-ও রাজী হ'লো। একটু যেন ভয় ভয় করছিলো। কিন্তু অন্ধকার হয়ে আসায় সেটুকুও দূর হয়ে গেলো। অন্ধকারে কেউ যদি দেখেও ফেলে তাতে কিছু আসে যায় না। তাছাড়া শহরটাও তো অচেনা।

হোটেলের একটা কোণায় গিয়ে বসলাম।

'কই আপনি তো আমার প্রশ্নের জবাব দিলেন না?' আগের প্রশ্নের জের টানি।

'না।' বলে বোধ হয় লজ্জায় নিজের কাঁধের দিকে তাকিয়ে একটু হাসলো। আমি ওর সঙ্গে কথা বলছিলাম; কিন্তু আমার মনটা ওখানে ছিলো না। সব ব্যাপারেই গরমিল, শুধু এই একটা বিষয়ে মিল আছে দেখলাম। আমরা দুজনেই অবিবাহিত। তাই বোধ হয় ভবিষ্যতের স্নেহের সম্পর্কটা এরই ওপর গড়ে ওঠে।

দুজনেই চুপচাপ। কথা বলার যেন কিছু নেই।

'কিছু নেবেন?'

'নিয়ে তো নিয়েছি?'

'কি নিলেন?'

'কেন, শাড়ী নিলাম।'

'তা নয়, খাবার কিছু নেবেন না?'

'ও এই কথা। না, না, কিছু লাগবে না।' বলেই হেসে ফেলে।

মুক্তোর মতো দাঁত। বেশ হাসিখুশী। টুথপেস্টের বিজ্ঞাপনের প্রতিযোগিতায় ওর হাসিমুখের ছবি পাঠানো যায়।

'আর আপনি?'

'আমি কি?'

'কিছু নেবেন না ?'

'আচ্ছা এই কথা।' পকেট থেকে রুমাল বার করে মুখে চাপা দিই। আমার দাঁতগুলো একটু এবড়ো খেবড়ো। আবার খানিকক্ষণ চুপচাপ। বেয়ারা এসে কাপ প্লেট তুলে নিয়ে গেলো। তার গায়ের রঙ কালো। মাথায় লাল পাগড়ী। অজন্তার অন্ধকার গুহার দেয়ালে আঁকা ছবিতে রাজার পায়ের কাছে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে থাকা ছেলেটার মতো এই বেয়ারাটাকে দেখতে।

বিল মিটিয়ে দিই— রেঁস্তোরা থেকে বেরিয়ে এলাম। হেঁটে চলছি। খানিকটা দূর এগোতেই দেখি রাস্তা দুমুখো হয়ে গেছে।

'আপনি শাড়ী বেছে না দিলে হয়ত এত তাড়াতাড়ি এত ভালো মনের মতো শাড়ী বাছতে পারতাম না।' কথা বলবো বলেই বললাম।

'আপনি বলছেন কেন? আমি তো আপনার চেয়ে ছোটো। আপনি বলবেন না।'

ছোটবড়র হিসেব যারা চল্লিশ পেরিয়ে যায় তারাই করে। ওর এতো মাথা ব্যথা কেন? বয়সের হিসেব নিয়ে যারা যত মাথা ঘামায় ততই তারা যৌবন-বিমুখ।

নাম বললো, কমলা।

'আমাদের কমলম্মা আর আপনার··· না, না, তোমার নাম একই। অদ্ভুত লাগছে না?'

আমি আমার শহরের নাম বললাম।

'আমাদের গাঁ ওখান থেকে তো বেশ কাছেই।'

ও বলে যে এখানে ও কলেজে পড়ে। কলেজের ছুটি সুরু হয়ে গেছে।

ছুটিতে গাঁয়ে যাবার আগে কয়েকটা শাড়ী কিনতে এসেছিলো।

ওকে একটা দোকানে ওর বান্ধবী দেখা করতে বলে। কিন্তু সে আসে নি। তার কি হয়েছে কে জানে।

ওর একটি ছোট ভাইও আছে। মাদ্রাজের কোনো এক কলেজে পড়ে। ও এখানে আর ছোট ভাই মাদ্রাজে, দুজনে আলাদা আলাদা কলেজে পড়ে কেন, একবার ভাবলাম জিজ্ঞেস করি। কিন্তু এ সবে আমার কি দরকার। যদি দরকারই না হয় তবে জিজ্ঞেস করার কথা ভাবলাম কেন? কিছুই বুঝে উঠতে পারছিলাম না।

ভাবলাম, আমাকে ওর বাড়ী যাবার জন্যে নিমন্ত্রণ করবে। কিন্তু সে রকম কিছু বললো না।

'গাঁয়ে আপনাদের বাড়ী কোথায়?'

আমাদের বাড়ী কোথায়. কি রকম দেখতে, সব কিছু বললাম। বললাম, 'আচ্ছা, তা হলে আসি…।' এক অদ্ভুত করুণ দৃষ্টি নিয়ে আমার দিকে তাকালো। মনে ব্যথা ও মুখের কথা কোনো রকমে চেপে রেখে বললো, 'কমলম্মাকে আমার নমস্কার দেবেন।' বলে ও চলে গেলো।

ওখানেই দাঁড়িয়ে আমি একদৃষ্টে ওকে দেখতে থাকি। যেতে যেতে তিনবার পেছন ফিরে ও আমায় দেখলো।

বিনুনিটা শাড়ীর আড়ালে ; বিনুনি ও শাড়ীটা একবার চকমকিয়ে উঠে অন্ধকারে মিলিয়ে গেলো। আমার চোখে জল ভরে এলো। কষ্ট হতে থাকলো। এই ধরনের দুঃখবোধ এই প্রথম। আমি মিথ্যে বলেছি— বলেছি, আমার বিয়ে হয় নি. সরল প্রকৃতির ঐ মেয়েটাকে এ ধরনের মিথ্যে কথা বলার পেছনে কি উদ্দেশ্য ছিল, বুঝে উঠতে পারলাম না। আর সবাই ঠিক বলেছি। এই ব্যাপারে হঠাৎ কেন এরকম বললাম। তখন আমার বিবেক বুদ্ধি সব লোপ পেয়ে

গেছিলো। ষড়রিপুর প্ররোচনায় ভুলে গিয়ে মিথ্যে কথা বেরুল। আমার কিন্তু এতোটুকু ইচ্ছে ছিল না। যতটা আমার শারীরিক সংযম, অতটা বিবেকের উপর নেই। লজ্জা পেলাম। নিজের ওপর রাগও হল। অবিবাহিত বললে নিঃসঙ্কোচে বিনা দ্বিধায় ও আমার সঙ্গে কথা বলবে, এটাই কি ভেবেছিলাম! সত্যি কথা বললে ও কি আমার সঙ্গে কথা বলতো না? সত্যি যদি ও আমাকে ভালোবাসতে চায়, আমার সঙ্গে প্রেম করে, তবে আমার স্ত্রী কি তাতে বাধ সাধবে? কেন আমি মিথ্যে বললাম?

বিবাহিত জীবনের পরাধীনতা আমার ব্যক্তিত্ব বোধ হয় স্বীকার করে না; তাই বিদ্রোহ করে, মিথ্যে বলে। অবিবাহিত লোক নিজেকে মুক্ত ভাবে। নারী পুরুষের জীবনকে নব নব চেতনায় ভরিয়ে তোলে, বিয়ের সঙ্গে সঙ্গে জীবনের এই নতুন আস্বাদন, স্বাধীনতা সব লোপ পেয়ে যায়, নারী ও পুরুষের মধ্যে প্রেমের বন্ধন ছিন্ন হয়ে যায়। এই ভিত্তিহীন ধারণাকে বিদ্রূপ করার জন্যেই বোধহয় আমি মিথ্যে বলেছি। বিয়ে হয়েছে সবে এক বছর। এক বছর কেন, একদিন হলেও, বিবাহিত বিবাহিতই।

মিথ্যে বললে ভদ্রমহিলা খুশী হয়ে আমায় খোলাখুলি ভাবে কথা বলার অধিকার দেবেন, সেটাই বোধহয় ভেবেছি।

আমার দৃঢ়বিশ্বাস ছিল যে ভদ্রমহিলার সঙ্গে আর কখনও দেখা হবে না। তাই একটা মিথ্যে বলে কিছুক্ষণ তাকে খুশী রাখতে চেয়েছি— এতে আমি কোনো দোষ দেখি না। আচরণে হৃদয়াবেগই প্রকাশ পায়। সেটা ঠিক কি বেঠিক তার বিচারের ভার মাথায়। মন বলল, একটু মিথ্যে বলে ওকে না হয় খুশীই করা যাক। ইন্দ্রিয়গুলো তাতে সায় দেয়।

কিন্তু আমার বিবেক তা মানতে পারছে না। যন্ত্রণা দিচ্ছে। কমলা কত সরল আর উচ্ছল। আর আমি কত ধূর্ত। বিবেকের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে বেশ সময় লাগে। কমলার সঙ্গে আর কোনোদিন দেখা হবে না। আর যদি হয়ও, ততদিন কি আর এ সব কথা মনে থাকবে? পরে না হয় বলব বিয়ে করেছি। বাড়ীতে পৌঁছে নিজের ওপর আরো বেশি রাগ হ'লো। আমার বৌ কমলার চেয়েও সুন্দর। তবে এ সব ঝামেলা কেন? অভিপ্রায় যাই হোক না কেন, মিথ্যে বলাটা তো দোষের। তার প্রমাণ, আমি কয়েকমাস এই নিয়েই চিন্তায় মগ্ন রইলাম। নীতিবোধই আমাকে এতো পীড়ন করছে। অপরাধের চেয়ে অনুশোচনাই বেশি পীড়া দেয়।

ঘুরে যায় বছর। গ্রীষ্মকাল। আমার ঘুম ভেঙে গেল। দেখি বিকেল চারটে বেজে গেছে। ঘুম না ভাঙলে হয়ত আরো কিছুক্ষণ ঘুমোতাম। রঙ্গন্না আমায় ঘুম থেকে তুলে দিয়ে বললো, 'হুঁজুর, আপনার সঙ্গে কেউ দেখা করতে এসেছে।'

'কে রে?'

'একজন লোক দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আপনার খোঁজ করছে।'

ভেতরে গিয়ে চোখেমুখে জল দিয়ে এলাম। তোয়ালে দিয়ে মুখ মুছে ফ্লাস্ক থেকে কফি নিয়ে খাই। রঙ্গন্না দরজার কাছে দাঁড়িয়ে:

'আমি বলেছি, সাহেব ভেতরে। লোকটা তারপর ঐ ধারে যে গাড়ীটা দাঁড়িয়ে আছে সেখানে গেলো। গাড়ী থেকে একজন দিদিমণি নেমে এসে সোজা আমাদের বাইরের ঘরে এসে বসল, লোকটা সঙ্গে করে একটা টুকরী নিয়ে এলো। সাহেব, তাতে

আম আছে। আমের টুকরীটা এখানে রেখে দিয়ে লোকটি আবার গাড়ীতে ফিরে গেলো।'

'দিদিমণি কোথায়?'

'বাইরের ঘরে বসে আছে।'

'আরে, আমি তোর বৌদিদিমণির কথা জিজ্ঞেস করছি।'

'উনি তো মন্দিরের দিকে গেছেন।'

কে আবার এলো। বুকটা ধুক্ ধুক্ করতে থাকলো। 'কতক্ষণ এসেছে? কোথায় আছে?' বলে আমি বাইরের ঘরের দিকে এগোলাম।

বাইরের ঘরে কমলা বসে। জোরে রক্ত চলাচল করছে। হাতটা মুঠো করে নিলাম। গলায় শত বৃশ্চিকের দংশন অনুভব করছি।

কমলার নিশ্চয়ই ঐ কথাটা মনে আছে— আর থাকবে নাই বা কেন? বাকী কথা হয় তো সব ভুলে গেছে। ঐ একটা কথা নিশ্চয়ই ওর মনে আছে— এতোক্ষণে আমার মিথ্যে কথাও ও ধরে ফেলেছে। বাইরের ঘরে আমাদের বিয়ের ফটো আছে। ফটোগ্রাফার নিজের প্রচারের জন্যে বড় বড় হরফে নিজের নাম, ধাম, ছবি তোলার দিনক্ষণ সব ফটোর গায়ে লিখেছে। দেয়ালে আরো কিছু ছবি। হিন্দী ফিল্মের তারকাদের, কংগ্রেসের প্রথম সভাপতি, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি ছবির সঙ্গে পোট্টিশ্রীরামুলুর ছবিওয়ালা ক্যালেণ্ডারও ঝুলছে।

'কোত্থেকে আসছেন? কতক্ষণ অপেক্ষা করছেন?' বিয়ের ফটোর নীচের তারিখটা ঢাকবার জন্যে এক টুকরো কাগজের খোঁজে এদিক ওদিক দেখতে থাকি।

'এই গাঁয়েই আমার জ্যেঠীমা থাকেন। ছোটভায়ের বিয়ের ব্যাপারে এখানে মেয়ে দেখতে এসেছি।'

'আচ্ছা।' কোনো কাগজের টুকরোর সন্ধান করতে পারলাম না। এখন এসব করেও কিছু লাভ নেই। আমার মনে এ সন্দেহই বা কেন হচ্ছে যে ও বিয়ের তারিখটা দেখে নিয়েছে। আর যদি দেখেই থাকে তো বলা যাবে ওটা ফটোগ্রাফারের দোকান খোলার তারিখ।

রঙ্গন্নাকে কফি নিয়ে আসতে বললাম।

'থাক, এই মাত্তর খেয়ে আসছি।'

'তাতে কি? কফি তো। তা মেয়ে পছন্দ হ'লো?'

'ছেলের পছন্দই তো আসল।'

'একেবারে ঠিক কথা।'

'আশা করি নি এতো তাড়াতাড়ি আবার আপনার সঙ্গে দেখা হবে।' বলে একটু হাসলো।

'হ্যাঁ, এত তাড়াতাড়ি··· পৃথিবীটা গোল।'

'এই শাড়ীটা সেদিনকার কেনা।'

'হ্যাঁ, তাই তো। বেশ সুন্দর। শাড়ীর ব্যাপারে আপনি তো এক্সপার্ট।' আগেকার কথার পুনরাবৃত্তি করি।

'আমার নাম ভুলে গেছেন?'

'না, না, ভুলিনি··· কমলা।'

'তা হলে আপনি বলছেন কেন?' দুজনেই হেসে উঠলাম। পাশে রাখা টুকরীটার দিকে তাকাই।

'আম বুঝি?'

'হ্যাঁ, আম।'

'এনেছো !'

ও শুধু একটু হাসলো।

তারপর দেয়ালের দিকে তাকায়।

'ঐ শাড়ীটাও খুব সুন্দর। কমলম্মাও কি এখানে থাকে?' এই বলে হাঙ্গারে ঝোলানো নীল সিল্কের শাড়ীটার দিকে তাকালো।

যা হবার তাই হ'লো।

আমার কোটের পাশে হাঙ্গারে ওর শাড়ী টাঙানো। স্ত্রীর ওপর রীতিমত চটে উঠলাম। সবাইকে দেখানোর জন্যেই বাইরের ঘরে আমার কোটের পাশে রাখা হয়েছে। ভেতরের ঘরে দুটো ট্রাঙ্ক ও একটা আলমারী। ওখানে শাড়ী রাখার আর জায়গা জুটলো না। লোকেরাই ঠিক বলে। ঘরণী নিজের সৌন্দর্য ও সাজ নিয়ে এতোই মশগুল যে ঘর সাজানোর দিকে কোনো হুঁশই নেই।

'ওটা··· ওটা তো··· নয়।'

'মানে, ওটা শাড়ী নয়?'

'না, না, ওটা কমলম্মার··· নয়।'

আমি বেশ বুঝতে পারছি যে মিথ্যে বলে আর লাভ নেই। জানতে ও ঠিক পারবেই— কথাও শুনতে হবে। তাই প্রস্তুত থাকাই ভালো।

'তুমি বোধহয় জানো না··· সম্প্রতি···'

'নতুন কোনো আত্মীয়া?'

আরো রেগে যাই। কথা বলার তো হাজারটা প্রসঙ্গ রয়েছে। কিন্তু শাড়ীর ব্যাপারে বার বার খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করাটাই স্ত্রীচরিত্রের সঙ্কীর্ণতার পরিচয়।

'না, আর কেউ নয়, ও আমার স্ত্রী।' বলেই চোখটা ওর দিক থেকে সরিয়ে টেবিলে রাখা কাপড়টা আঙুলে জড়াতে থাকি।

'তোমার বৌ···' বলতে বলতে সে আমার দিকে আঙুল দেখায়।

'এত আশ্চর্য হবার কি আছে এতে?'

'তখন তো কিছু আমায় বলেন নি? উল্টে বলেছিলেন যে এসব এখনও চিন্তা করছেন না।'

সামনের ছবিটা দেখে আসল ব্যাপারটা বুঝতে পারে। তবু আমার মুখ থেকে কথাটা শুনতে চায় বলে কিছু ভাঙলো না। জানি না আমাকে বিব্রত করে ও কি মজা দেখতে চায়। কিংবা হয় তো নিজের মনের ঝালটা মেটাতে চায়। যদি আমি বলি যে সবে মাত্র বিয়ে করেছি তা হলে বিশ্বাসই করবে না। কেন না, নতুন বৌয়ের শাড়ী শ্বশুরবাড়ীর বাইরের ঘরে আসতে পারে না। যখন সত্যিই বলতে হবে তখন পুরোটা বলাই ভালো।

'হ্যাঁ, ঠিকই বলেছ।'

'কোন কথাটা ঠিক?'

'বিয়ে হয়ে গেছে, হয়ে গেছে।'

'কেন?'

'বিয়ের বয়স হলেই বিয়ে হয়।'

'সে কথা জিজ্ঞেস করছি না। তখন কেন ও কথা বলেছিলেন?'

'জানি না কেন বলেছিলাম। হয়তো তখন বলতে ইচ্ছে হয়েছিলো।'

'অদ্ভুত তো।'

'তুমি জানো?'

'কি জানি?'

রঙ্গম্মা কফি এনে টেবিলে রাখলো। কমলা বলে উঠে, 'কফি খাবো না।'

'আচ্ছা, তা হলে আম কেটে দি।' বলে আমের টুকরীটা টেনে নিলাম। কমলা সঙ্গে সঙ্গে টুকবীটা নিজের দিকে টেনে নেয়। রঙ্গম্নাকে আমি পান আনাতে দোকানে পাঠালাম। কমলা উঠে গিয়ে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বাইরে গেটের কাছে বসলো। খুব রেগে গেছে মনে হ'লো। রাগে চোখ দুটো জ্বলছে। মাঝে মাঝে চোখ দুটো বন্ধ করছে। গাল লাল হয়ে উঠেছে। আত্ম-সম্মানে আঘাত লাগায় কুঁচকে যায়। বোধ হয় ভাবছে ওকে একলা পেয়ে স্ত্রীর সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে আমি ওকে ধাপ্পা দিচ্ছি।

'সামনে যে ছবিটা দেখলে··· ঐ।' আমি বলি।

'হ্যাঁ, বুঝতে পেরেছি। আমি সবই বুঝি। বোধহয় আমাকে মিথ্যে বলে মনে মনে তুমি খুব খুশী হয়েছো।' কথাটায় ওর অভিযোগ আর হিংসে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আমিও কয়েকমাস ধরে এ কথাই ভেবেছি। তাই প্রস্তুতই ছিলাম। নাটকের নায়কের উক্তির মতো এখন আমি কথাগুলো বলে যাচ্ছি।

'তুমি ভুল বুঝো না। তখন মনে হয়েছিলো, তাই ওকথা বলেছিলাম। আমি সবই বুঝি।'

'তোমরা খুব একটা বড় কাজ করেছো তা ভেবে তুমি ও তোমার স্ত্রী বোধহয় খুব গর্ব অনুভব করছো।'

'এর মধ্যে ওকে টেনে এনো না।'

'বাহবা। স্ত্রীর নাম দেওয়ার ব্যাপারে দেখছি বেশ পৌরুষ, ঝাঁঝও।

'চুপ করো কমলা, চুপ করো। আমাকে যা খুশী তাই বলো আমি

শোনবার জন্যে প্রস্তুত। ওর কথা বোলো না। এ সবের ও কিছুই জানে না।'

'আমাকেও যখন ধাপ্পা দিতে পারো, স্ত্রীর সঙ্গে নিশ্চয়ই মিথ্যে বলো। আমাকে ধোঁকা দিয়ে এতো খুশী হবার কি আছে। এই রকম দু-চারটে মিথ্যে তোমার শ্রীমতীকে শিখিয়ে দিলে, সেও তোমায় এই ভাবে ধোঁকা দেবে।'

কথাটা শুনে বড় আঘাত পেলাম।

আমার সঙ্গে এ রকম ঠাট্টা করার স্পর্ধা কমলার হ'লো কি করে? মিথ্যে বলাতেই তো? স্ত্রীলোককে বেশি মাথায় তুললে তার যে কি পরিণাম... তা সবাই জানে।

'এ রকম কথা বোলো না কমলা। আমি ক্ষমা চাইছি।'

যতই আমি শান্ত ও নম্র হই কমলার আক্রোশ ততই যেন বেড়ে যায়। আমি গম্ভীর হয়ে একটু কড়া জবাব দিতে গেলাম তো 'শিক্ষিত লোক, সংসারী হয়েছো, এইভাবে মিথ্যে··· '

ওর কথা শেষ করতে না দিয়ে আমি বলি, 'অনেক কষ্ট পেলে, এবার একটু কফি খাও।'

এতক্ষণ ধরে হাসিটা চেপে ছিলাম। হঠাৎ জোরে হেসে উঠি।

কমলা উঠে দাঁড়ায়। চেয়ার টেবিল সামলে আমিও উঠে দাঁড়াই।

'এতো হাসার কিছু নেই। যেন তুমি এক অদ্ভুত খেল দেখিয়েছো। তুমি শুধু ভাবছো, বিয়ে তোমারই হয়েছে; আর কারুর হয় নি। তোমার বিয়ে এক বছর আগে হয়েছে, আমার বিয়ে তারও আগে হয়েছে। যে জন্যে তুমি মিথ্যা বলেছিলে, সেই একই কারণে আমিও বলেছিলাম। ঠিক আছে? এখন আমারও

হাসি পাচ্ছে; কিন্তু আমি তোমার মত হাসিতে ফেটে পড়তে পারি না।'

কোন কিছু জবাব দেবার আগেই সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। বুঝলাম না, যাবার সময় সে হাসছিল না কাঁদছিল। আমিও তার পিছু পিছু গেলাম। রঙ্গন্না পান নিয়ে এলো। কমলা ততক্ষণে গাড়ীতে চেপে বসেছে। আমি অবাক হলাম। মনটা হাল্কা লাগলো। আমার মিথ্যে বলার পাপের আর-একজন ভাগীদার পেয়েছি। আমি নিজেকে যতটা খারাপ মনে করি, ততটা আমি নই। ভাবছি, সবাই হয়তো এই রকম। এই সত্যটুকু জানতে যদি মিথ্যে বলতে হয় তাতেই বা ক্ষতি কি? কমলার প্রতি আমার কোনো ক্রোধ নেই। স্ত্রীলোকের ক্রোধের পাল্টা জবাব দেওয়া বড় শক্ত। বয়স যতই বাড়ে ততই কথাটা ভেবে মনকে প্রবোধ দিই। রাস্তার মোড় অবধি চেয়ে দেখলাম। দেখতে পেলাম আমার স্ত্রী মন্দির থেকে বেরিয়ে নতমস্তকে ফিরছে। রঙ্গন্নাকে আমের টুকরীটা গাড়ীতে তুলে দিতে বলে আমি ভেতরে চলে এলাম। আমার স্ত্রী এ কথা জানতে পারবেই, কারুর কিছু বলার আগেই আমি তাকে বলে দেবো; এতেই বোধহয় সব দিক দিয়ে মঙ্গল।

পার্বতী-পরিণয়

দক্ষরাজার মেয়েদের মধ্যে উমাই শুধু বাপের অমতে শিবকে বিয়ে করেছিলো। শিব দক্ষরাজার সমতুল্য ছিলেন না বলে দক্ষরাজা তাঁর আহূত যজ্ঞে শঙ্কর ও উমাকে আমন্ত্রণ করেন নি। শঙ্করের কথা না শুনে অনাহূতের মতো পিতার যজ্ঞশালায় উপস্থিত হয়েছিলেন আর সেখানে অপমানিত হয়ে যজ্ঞকুণ্ডে ঝাঁপ দিয়েছিলেন।

এর চেয়ে স্বাভাবিক ঘটনা দৈনন্দিন জীবনেও কি ঘটে না। যুগ যুগ ধরে অনেক দেশেই উমার মতন অনেক মেয়েই শঙ্করের মতো ছেলেকে বিয়ে করে শত লাঞ্ছনা ও অবমাননা সহ্য করেছে।

এ সত্ত্বেও পৌরাণিক এই ঘটনার সম্বন্ধে কিছুদিন ধবে আমার মনে একটা সন্দেহ জেগেছে। সত্যিই কি শঙ্করের প্রতি প্রেম, ভালোবাসা আর সম্ভ্রমের জন্যেই উমা তাঁকে বিয়ে করেছিলেন? সংস্কারহীন শিবের অনুচরদের ও সভ্যতার আলোক পায় নি এমন যে শঙ্কর, তাদের ওপর আধিপত্য বিস্তারের জন্যেই উমার এই পরিণয়? শঙ্করের অমতে রবাহূতের মতো পিত্রালয়ে যাওয়াটা কি উমার সরলতার পবিচয়, না তিনি এই কাজ জেনেশুনেই করেছিলেন? আর একটা সন্দেহ জাগে। উমা সত্যিই কি যজ্ঞানলে ঝাঁপ দিয়েছিলেন, না রান্নাঘরে গিয়ে লুকিয়েছিলেন।

হর-পার্বতী, এমন পবিত্র উপাখ্যান নিয়ে আমার মনে এতো জঘন্য সন্দেহ জাগার কারণ কি? আমার বিবৃত পরবর্তী ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে

তা সহজেই বোঝা যাবে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, হর-পার্বতীর মিলন যেখানেই হোক না কেন, তা উমা বা দক্ষ কারুরই ক্ষতি করবে না, যা করবে তা শুধু শঙ্করেরই।

পার্বতী রামকোটির মেয়ে। ছেলেবেলা থেকেই রামকোটি প্রগতিবাদী। ছোটবেলা থেকে সে বিরেশলিঙ্গমকে অনেকবারই দেখেছে। একটু বড় হোলে গান্ধীজির প্রগতিবাদও তাকে আকৃষ্ট করে। কংগ্রেসের আন্দোলনের সঙ্গে কোনো যোগাযোগ না থাকলেও সে গান্ধীজির একজন পরম ভক্ত বলে সুনাম পায়।

এই খানেই বলে রাখি, রামকোটির প্রগতিবাদ বা অন্য কোনো প্রগতিবাদের ওপর আমার বিন্দুমাত্র আস্থা নেই। এর প্রধান কারণ এই-সব প্রগতিবাদ বাস্তবে কি রূপ ধারণ করবে তা অনুমান করা খুবই কঠিন। রামকোটি অনেকগুলো বিধবা-বিবাহ দেন ও এই ধরনের বহু আসরে নিজে উপস্থিত থাকেন, কিন্তু তিনি নিজে কোনো বিধবা-বিবাহ করেন নি। একটি সাধারণ মেয়েকে তিনি বিবাহ করেন। তাও ঋতুমতী হবার আগে। বিধবা আশ্রমে কোনো সুপাত্রী ছিল না বলে নয়। অনেক বিধবা পাত্রী তিনি দেখেছিলেন, কিন্তু কাউকেই মনে ধরে নি।

রামকোটির বিয়ের পর ওঁর এক বন্ধু তাঁকে বিধবা-বিবাহ না করতে দেখে সরস মন্তব্য করেন। তিনি রেগে গিয়ে জবাব দেন, 'যারা বলে আমি বিধবা-বিবাহ করতে চাই নি, তাদের মুখে পোকা পড়ুক।'··· আমি একথা বিশ্বাস করি না যে বিয়েটাকে শুধু সামাজিক দৃষ্টিকোণ দিয়েই বিচার করতে হবে। যে বিয়ে করছে তার ইচ্ছা ও অনিচ্ছা বা পছন্দ ও অপছন্দরও মূল্য আছে। বিয়ে

সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত ব্যাপার। সমাজের সঙ্গে যে সম্পর্কটা সেটা বিয়ের পরই স্থাপিত হয়।...

'যে মেয়ে পছন্দ হয়েছে, তাকেই আমি বিয়ে করেছি। এ বিষয়ে কারুর মন্তব্য কিংবা এর স্বপক্ষে বা বিপক্ষে আলোচনার কোনো প্রয়োজন দেখি না।'

রামকোটি নিজের কাজের স্বপক্ষে এই ধরনের যুক্তি দেন। কিন্তু সেটা আমাদের যে মেনে নিতেই হবে সেরকম কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। রামকোটির স্ত্রীকে তার যৌবনেই দেখেছি। এমন কিছু দেখতে নয়। যাঁরা তাঁকে যুবতী অবস্থায় দেখেন নি, তাঁরা এখন পার্বতীকে দেখে নিতে পারেন। পার্বতী দেখতে ঠিক তার মায়ের মতো। রামকোটির মতে তিনি যে-সব বিধবাদের দেখেছিলেন, তারা এর চেয়েও কুৎসিত। আমার কথা হয়তো বিশ্বাস হবে না। রামকোটি যতদিনে প্রগতিবাদের বিরুদ্ধে এবং তাঁর আচরণের স্বপক্ষে যুক্তি খাড়া করবেন ততদিনে আমার প্রগতিবাদে আস্থা জন্মাবে না।

রামকোটির প্রগতিবাদ সম্বন্ধে আমার মনে একটা খটকা আছে, এর সমাধান আমি আজও খুঁজে পাই নি। একদিকে রামকোটি বিধবা-বিবাহ, অসবর্ণ-বিবাহ ও হরিজনদের সঙ্গে সহভোজন জাতীয় প্রগতিবাদী মতবাদের সমর্থক, অন্যদিকে তাঁর আত্মীয়স্বজন যাঁরা পুরাতন-পন্থী ও পুরোনো সংস্কারে বিশ্বাসী ও গোঁড়া তাদের সঙ্গে তাঁর কোনো মতভেদ ঘটে না। এর রহস্যটা কি? না উনি নিজে, না ওঁর কোনো ভাই বা বোন কিংবা তাঁদের ছেলেমেয়ে, এমনকি, ওঁর নিজের ছেলে রমাপতি— কেউই অসবর্ণ-বিবাহ করে নি। এর কারণটা কি?... এতদিন পরে পার্বতী যদি কোনো হরিজনকে

বিয়ে করে তা হলে রামকোটি এমন ভাব দেখাবেন যেন তাঁর মতো প্রগতিশীল, অন্য কেউই নয়। আর এই ধারণাটা লোকেদের মধ্যে যাতে বদ্ধমূল হয় তার জন্যে তিনি যে কি পরিমাণ পরিশ্রম করেন তাও আমার অজানা নয়। সেটা সবায়ের জানাও দরকার।

পার্বতীকে আমি খুব ভালোভাবেই চিনি। ওর মতিগতি আমার কোনোদিনই ভালো লাগতো না। এর জন্যে কিন্তু আমি ওকে দায়ী করি না। ওকে দেখতে তো সুন্দর ছিলই না, তার ওপর ওর ভগ্নস্বাস্থ্য। তাই ওর চেয়ে ভালো স্বাস্থ্য আর সুন্দর দেখতে ওর বন্ধুদের ও হিংসে করতো। নিজেকে যাতে ওর বন্ধুদের মতো সুন্দর দেখায় তার জন্যে ও কম চেষ্টা করতো না। তের-চোদ্দ বছর বয়স থেকেই ওর একটা ভারী বদ অভ্যাস। পুরুষদের আকৃষ্ট করার কতটা ক্ষমতা আছে তারই পরীক্ষা করা। আমি তার চেয়ে কুড়ি বছরের বড় ; আমাকেও সে বাদ দেয় নি। আমি যদি মনোবিজ্ঞানী না হতাম তা হলে আমি ওর ওপর রাগই করতাম। আমার জ্ঞানগম্মি কম হলে এতদিন একটা-হুলুস্থূলু ব্যাপার হয়ে যেতো। তাই পার্বতীকে আমি বুঝিয়ে সুঝিয়ে বলি, 'নারীকে যত খারাপই দেখতে হোক না কেন, কোনো না কোনো পুরুষকে সে আকৃষ্ট করবেই। যতদিন এই দেহ আছে, ততদিন একে অন্যের প্রলোভনে পড়তেই হবে।'

'আচ্ছা ; আপনি দেখছি দার্শনিকের মতো কথা বলতে পারেন,' পার্বতী কটাক্ষ করেছিলো। আর সেদিন থেকেই সে আমার ওপর চটে আছে।

পার্বতী ওর দাদা রমাপতির সমস্ত বন্ধুবান্ধবদেরই আকৃষ্ট করার চেষ্টা করে। ছেলেমেয়েদের মধ্যে এই ধরনের মানসিক পরিবর্তন যে-সব মা বাপের চোখে পড়ে না, তারা সত্যিই অন্ধ। আমি ভেবেছিলাম

পার্বতীর মা কিংবা বাবার, কারুর না কারুর চোখে পার্বতীর এই পরিবর্তন ধরা পড়বে। কিন্তু তাঁদের চোখে এটা ধরা পড়ল না দেখে আমি পার্বতীর সম্বন্ধে শঙ্কিত হয়ে পড়েছিলাম। ভেবেছিলাম, এইভাবে চলতে গিয়ে পার্বতী বিপদে না পড়ে। আমার আশঙ্কা বৃথা। এ ধরনের কিছু ঘটলো না। মনে হয় পার্বতী অতটা কাণ্ডজ্ঞানহীন নয়। কতটা এগুনো উচিত আর কিভাবে নিজেকে বাঁচাতে হয় তা সে জানে। নিজের চরিত্রের ওপর যাতে কোনো কলঙ্ক না পড়ে, আর তার ব্যবহারে যাতে কোনো বিশ্রী পরিস্থিতি সৃষ্টি না হয়, এই দুবিষয়ে পার্বতী যথেষ্ট সাবধান থাকতো। আর এইভাবেই তেরোটা চোদ্দটা বছর কাটিয়ে দিল··· শঙ্করমের সঙ্গে যখন বিয়ে হ'লো তখন তার সাতাশ বছর।

শঙ্করম ও রমাপতি কলেজে একসঙ্গে চার বছর পড়েছে। আমার মনে হয় রামকোটির ছেলে রমাপতি তার বাপের চেয়েও বেশি প্রগতিবাদী ও সংস্কারমুক্ত। শঙ্করমকে হরিজন জেনেও রমাপতি তার সঙ্গে উঠতো বসতো। হরিজনদের সম্বন্ধে নিজেদের উদার মনোভাব জাহির করবার তাগিদে শঙ্করমের বন্ধুবান্ধবের অনেকে তার সঙ্গে অমায়িক ব্যবহার করতো। শঙ্করম এদের দেবতুল্য মনে করতো ; এরাও শঙ্করমের ব্যবহারে তার পরিচয় পেয়ে খুব খুশী হতো। শঙ্করম যাতে তাদের দেবতুল্য ব্যবহারের কথা ভুলে না যায় তাই তারা শঙ্করম যে হরিজন সেকথা শঙ্করমকে মনে করিয়ে দিতো। এইসব বন্ধুবান্ধব ও রমাপতির মধ্যে যে কোনো তফাৎ আছে, সেকথা বুঝতে শঙ্করমের অনেক সময় লেগেছিলো। এমনকি, রমাপতির চেয়ে এরা বেশি ত্যাগ স্বীকার করে এইরকম একটা ধারণাই শঙ্করমের ছিল। এর কারণটা আর কিছুই নয়। শঙ্করম রমাপতির সঙ্গে যখন থাকতো তখন তার

মনেই থাকতো না যে সে হরিজন আর রমাপতির চেয়ে সে এক ধাপ নীচে। কিন্তু অন্যদের সঙ্গে সে যখন ঘুরে বেড়াতো তখন এ কথা ভোলা তার পক্ষে সম্ভব হোতো না।

শঙ্করম যে এ সব ব্যাপার একেবারে বুঝতো না তা নয়। সমাজে হরিজনদের চেতনা ও প্রতিভাকে যে দাবিয়ে রাখা হয়েছে, তা শঙ্করমের কথায় কথায় প্রায়ই প্রকাশ হয়ে পড়তো। তার বাপ-ঠাকুর্দা যে জঘন্য জীবনযাপন করে গেছেন তা মর্মে মর্মে সে এত বেশি অনুভব করে যে প্রকাশ করতে পারে না। তাদের জীবন কেটেছে ছ্যাকড়া গাড়ীর মতো, আর শঙ্করমের জীবন কাটছে হাওয়াই জাহাজের গতিতে। স্বজাতির জন্যে সে যেন নতুন নতুন রাজত্ব জয় করে নতুন নতুন সংসার পেতে চলেছে। নিজের শরীরকে তুচ্ছজ্ঞান করে কাজের আনন্দে সে বিভোর হয়ে থাকতো। নিজের সফলতার কথা ভেবে সে এতই উৎফুল্ল হয়ে পড়তো যে নিজের মধ্যেই সে নিজে হারিয়ে যেতো। নিজে লেখাপড়া শিখছে, নামের পাশে 'বি.এ.' লিখবে, আর একটু চেষ্টা করলে হয়তো 'এম.এ.'ও লিখতে পারবে। এরপরই চাকরী পাবে আর এই সভ্যসমাজে সে প্রতিষ্ঠা লাভ করবে। রমাপতির মত সেও মাথা উঁচু করে সমাজে চলবে। প্রগতিশীল স্ত্রী পেলে তার জীবনে আর কিছুরই অভাব থাকবে না। শঙ্করমের ছেলেপুলেদের আর তার মতো জীবন কাটাতে হবে না। কি বিরাট পরিবর্তন, কোথা থেকে কোথায়।

যে সব জন্তুদের শিকার করা হয় তারাই সবচেয়ে ভীতু প্রকৃতির। শঙ্করম সব সময়ই যাচাই করে দেখতো তার সঙ্গে যারা সদ্ভাব বজায় রেখে চলে তার মধ্যে কারা আসল বন্ধু আর কারা মেকী। কলেজের পড়া শেষ করার পর শঙ্করম বুঝতে পারে যে রমাপতি তার সবচেয়ে

প্রিয় ও সত্যিকারের বন্ধু। লেখাপড়া শেষ করে যখন সে চাকরী জীবন সুরু করলো তখনই তার জীবনের আসল উন্নতি হতে লাগলো। কার্যক্ষেত্রে কিছু লোক তার অধীনে কাজ করতো, ওর প্রতি তাদের বিনম্র ব্যবহার, শঙ্করমের যোগ্যতা নিয়ে তাদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা— সব কিছু মিলে তার আত্মবিশ্বাস জাগিয়ে তুলেছিলো। তার মনে হয় সে যেন জাতিভেদ আর ছোঁয়াছুঁয়ির হাত থেকে রেহাই পেয়েছে। ওর সহকর্মীরাও জাতিভেদ মানতো না। বর্তমানে শহুরে জীবনে অভ্যস্ত শঙ্করমের অতীতকে ভুলতে তার মোটেই সময় লাগে নি। তার আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে মেলামেশা করলেই সে তার ফেলে-আসা জীবনকে প্রত্যক্ষ করত। যতদূর সম্ভব শঙ্করম তাদের কাছ থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখত। একবার সে একটা চিঠি পায়। চিঠিটা লিখেছিল একজন হরিজন— 'তুমি নিজের মুক্তির কথাই ভাবছো, নিজের আপনজনদের কাছ থেকে অনেক দূরে সরে যাচ্ছো। নিজের ভাগ্য তুমি তোমার জাতভাইদের সঙ্গে ভাগ করে নিচ্ছো না কেন, নিজের বুকে হাত রেখে নিজেকেই এই প্রশ্ন জিজ্ঞেস করো।'

কিন্তু শঙ্করম আজ কারুর কথাই ভাবে না। জীবনে প্রতিষ্ঠা পেয়ে, যশ পেয়ে সে স্থির থাকতে চায় না, আরও উন্নতি, আরও যশ কামনা করে।

কলেজের পড়া শেষ করার পর রমাপতির সঙ্গে শঙ্করমের এক হোটেলে দেখা। রমাপতি শঙ্করমকে চিনতে পারে নি, কিন্তু শঙ্করম রমাপতিকে চিনে ফেলে। শঙ্করমকে জীবনে প্রতিষ্ঠা ও যশোলাভ করতে দেখে রমাপতি খুব খুশী হয়। রমাপতি শহরে ওকালতি আরম্ভ করে, আর সে এ্যাডভোকেট।

'আমরা এখন ট্রিপ্লিকেন-এ আছি। একবার এসো না, তোমায়

দেখে সবাই খুব খুশী হবে।' নিজের ভিজিটিং কার্ডটা বার করে দিতে দিতে রমাপতি বলে।

পরের দিন সন্ধ্যেবেলা শঙ্করম নিজের গাড়ী করে রমাপতির বাড়ী হাজির হয়। রমাপতি ওকে সঙ্গে করে নিয়ে ভিতরের ঘরে বসায়। একটু পরেই পার্বতী দুজনের জন্যে কফি নিয়ে আসে।

লোকের প্রশংসা করতে পার্বতী খুবই পটু। 'দেখে বিশ্বাস হচ্ছে না আপনারা দুজনে একসঙ্গে পাশ করে বেরিয়েছেন। আপনাকে তো দাদার চেয়ে পাঁচ-ছ বছরের ছোট মনে হয়। বিশ্বাস না হয় তো আর কাউকে জিজ্ঞেস করুন।' একটা কথাপ্রসঙ্গে পার্বতী বলে ফেলে। আর একটা কথাপ্রসঙ্গে বলে, 'কে বুঝবে যে আপনি হরিজন। আমাকে বোকা বানাবার জন্যে বোধহয় দাদা আমাকে বলেছে। আপনার কথা শুনে কে বলবে যে আপনি হরিজন।' এই দুটো কথা শঙ্করম সেদিন রাতে যে কতবার মনে করেছে তাব হিসেব নেই।

বলতে পারি না পার্বতী শঙ্করমকে বিয়ে করবে তা আগেই স্থির করেছিলো কিনা। কিন্তু এটা নিশ্চিত করে বলতে পারি যে এই কথা ভাববার আগে সে এই বিয়েতে কি লাভ-লোকসান সবকিছুর চুলচেরা বিচার করে দেখেছে। কিন্তু পার্বতী যে শঙ্করমকে বিয়ে করতে চায় একথা স্বয়ং ব্রহ্মাও জানতে পারেন নি।

আর শঙ্করমকে ফাঁসাতে পার্বতী যে আর কি কি কৌশল অবলম্বন করেছিলো তা কেউ ভাবতেও পারে না। অবশ্য কাজটাও যে খুব সহজ তা নয়। ওর আর শঙ্করমের মধ্যে যে জাতিবৈষম্য আছে তা শঙ্করমের মন থেকে দূর করতে হবে। ওর মনে এই বিশ্বাস জাগিয়ে তুলতে হবে যে এ বিয়ের প্রস্তাব পার্বতী হয়তো মেনে নিতে

পারবে। কিন্তু পার্বতী যেন নিজের তরফ থেকে এ বিষয়ে কোনো তৎপরতা না দেখায়। পার্বতী এই সব ব্যাপার কি করে যে সামলে ছিলো তা বলতে পারবো না। কিন্তু সে যে সব সামলে নিয়েছিলো, সে কথা নিশ্চিত করে বলতে পারি। এক বছর ধরে শঙ্করম ও পার্বতী মেলামেশা করে, সহরে বেড়াতে যায়, সিনেমায় ছবি দেখতে যায়। তারপর একদিন শঙ্করম রমাপতির এক বন্ধু— যাকে রমাপতি শঙ্করমের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছিল ও যে প্রায়ই রমাপতির বাড়ী আসাযাওয়া করতো— তাকে বলে, 'অসবর্ণ বিবাহে আমি বিশ্বাস করি। আর এই ধরনের বিয়েতেই সমাজ পালটাবে।'

এই কথা শুনেই লোকেদের মনে আগুন জ্বলে উঠলো। শঙ্করমকে যারা জানতো আর রমাপতির বাড়ীতে যাদের আসাযাওয়া ছিলো তারা রমাপতিকে পরামর্শ দিলো, 'দুধ-কলা দিয়ে তো তুমি কাল সাপ পুষেছ, এ তো দেখছি কোনো বামুনের মেয়েকে বিয়ে করার তালে আছে। ওপর থেকে দেখতে তো বেশ সাদাসিদে ভালো-মানুষ, ভেতরে না জানি কি আছে···। সত্যি কথা বলতে কি এদের বেশি লাই দিতে নেই।··· পার্বতীকে একটু সাবধান করে দিও। শঙ্করমের সঙ্গে যেন বুঝেসুঝে মেলামেশা করে।'

ওরা যা যা বলেছিল, সব কথা আমি বলছি না। দুর্ভাগ্যক্রমে আমিও ওদেরই একজন ছিলাম। সেই জন্যে ওদের হীন উক্তিগুলো এখন প্রকাশ করতে লজ্জা হয়। কিন্তু এটা ঠিকই যে এরা সবাই মুখেই শুধু জাতিভেদ খণ্ডন করতে চায়, কাজে নয়। কিন্তু শঙ্করম যদি এদের হোটেলে নিয়ে গিয়ে খাওয়ায় বা বাড়ীতে এনে কফি খেতে দেয়, তা হলে এরাই খুশী মনে এই বিয়ের প্রস্তাব মেনে নেবে, আমি নিঃসন্দেহে বলতে পারি।

আমার মনে হয় না রমাপতি এদের কথায় কান দিয়েছিলো। কিন্তু এদের কথার একটা প্রতিক্রিয়া হয়। রমাপতি পার্বতীকে কথার ইঙ্গিতে বলে, 'শঙ্করম কোনো বামুনের মেয়েকে বিয়ে করতে চায়।'

'ননসেন্স! এতে দোষ কি? যদি কাউকে বিয়ে করবে ঠিক করে থাকে তো নিশ্চয়ই বিয়ে করা উচিত। বিয়ে হয় নি এমন সব মেয়েরা নিরুপায় হয়ে আজে-বাজে লোককে বিয়ে করার চেয়ে এ ধরনের ছেলেদের যদি বিয়ে করে তা হলে এরা মেয়েদের মাথায় করে রাখবে, এদের কথায় উঠবে-বসবে।' পার্বতী উত্তর দেয়।

পার্বতী এই সব কথা যে নিজের উদ্দেশ্যে বলছে তা রমাপতির বুঝতে দেরী হয় না। আসলে গত দশ-বারো বছর ধরে পার্বতীর বিয়ের কোনো চেষ্টাই হয় নি। এর কিছুদিন পরেই শঙ্করম পার্বতীকে বিয়ের প্রস্তাব করে। পার্বতী বলে, 'বাড়ীর লোকে যদি রাজী থাকে··· তা হলে আমার কোনো আপত্তি নেই।'

এরপর প্রায় পনেরো দিন পার্বতী তার মা-বাপের সঙ্গে তুমুল ঝগড়া করে। আর তারপরই রামকোটি নিজের দলের লোক মারফৎ পার্বতীকে জানায় যে পার্বতী যা করতে চাইছে তা খুবই দোষের। রামকোটিকে ঠোকা দিতে এক আমিই ছিলাম।

আমি বলেছিলাম, 'যদি পার্বতী শঙ্করমকে বিয়ে করে তা হলে লোকসান শঙ্করমেরই।'

শেষ বেশ কারুর কথাই টিকল না। পার্বতী যখন বলল, 'যদি আপনারা এই বিয়েতে রাজী না হন তা হলে আপনাদের অমতেই আমি শঙ্করমকে বিয়ে করব,' এই কথা শোনার পর রামকোটি প্রমাদ গুনলেন, রাজীও হলেন।

বিয়ে হয়ে গেল। খুব বড় একটা কাজ করে ফেলেছেন, পতিত এক জাতিকে সমাজে তুলেছেন, এইরকম ভাব নিয়ে রমাপতি প্রচার সুরু করে কয়েকজন সাদাসিধে লোকের সামনে নিজের মহত্ত্ব তুলে ধরলেন।

জানি না, স্বপ্নরাজ্যে শঙ্করম কতদিন বিচরণ করেছিলো। পার্বতী আস্তে আস্তে তাকে নরকের রূপ দেখাতে লাগলো। শঙ্করমের সব অভ্যেস পার্বতী বদলে দিতে দৃঢ়সঙ্কল্প। শঙ্করমের পরিবারে সব কজনকেই ও দূরে ঠেলে দিলো। আষ্টেপিষ্টে তাকে সহস্র বাঁধনে বেঁধে ফেলে। শঙ্করম এর থেকে একটু মুক্তি চাইলে পার্বতী ঝগড়া সুরু করে দেয়। শঙ্করম জীবনে এইরকম দাসত্ব কোনো-দিন অনুভব করে নি। অনেকদিন ধরে মুখ বন্ধ করে শঙ্করম সব সহ্য করে যায়, কোনো কথা বলে না। কয়েকবারই পার্বতীর 'অহম্' ভাবের কাছে সে নতি স্বীকার করেছে। পার্বতীর অনুগ্রহ পেতে তাকে কতটা নিজের অহম্ জলাঞ্জলি দিতে হবে সেটা জানার জন্যেই বোধহয় নতি স্বীকার করে নিয়েছিলো। কিন্তু এতেও কোনো ফল হল না। পার্বতী ওকে যতটা দোষী মনে করতো ততটা যে দোষী নয় অনেক ভেবেচিন্তে শঙ্করম সেটাই বোঝে। নিজেকে বোঝাতে চেষ্টা করে ওর চেয়ে পার্বতীই বেশি সংস্কারে বিশ্বাসী।

একদিন দুজনের মধ্যে খুব কথা কাটাকাটি হয়েছিলো। সেদিন শঙ্করমের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে পড়ে। অনেকদিন ধরে ও সব কিছু চুপ করে সহ্য করেছে। মনে মনে ভেবেছে এই সহ্যশক্তি পার্বতীর থাকা উচিত। সেদিন ভেবেছিল একটু রাগ দেখালে পার্বতী হয়ত চুপ করে যাবে। কিন্তু তা হয় না। শঙ্করম যতটা রাগ

দেখায়, পার্বতী তার ওপর আরও এক কাটি বেশি রাগ দেখায়। শেষ পর্যন্ত বাপের বাড়ী চলে যায় পার্বতী।

পার্বতী থাকাকালীন ও যা অনুভব করতো সেটা যদি নরক হয় তো, পার্বতী না থাকায় সে আজ যা অনুভব করছে তা প্রকাশ করতে ভাষা খুঁজে পায় না। একলা ঘরে ব'সে ও কেঁদে ফেলে— পার্বতীর জন্যে নয়। শুধু সেই শক্তির জন্যে, যেটা সে নিজেই হারিয়েছে। সেই অসীম সহ্যশক্তির কথা ভাবে, যা আর ওর নেই। আর সেই অপমানের কথা, যা আজ ও অনুভব করছে।

দু'তিন দিন ধরে খাওয়া-দাওয়া, নাওয়া, শোয়া ছেড়ে পাগলের মতো ঘুরে বেড়িয়ে শেষে স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে যায়। ওকে দেখে কেমন যেন অদ্ভুত লাগে। শঙ্করম ওর সঙ্গে বিশেষ কথা বলে না।

'আমাদের এই বিয়ে হওয়া উচিত ছিল না। মানছি, ভুল আমারই। কিন্তু বিয়েটা যখন হয়েই গেছে তখন সংসারের সামনে এটা প্রমাণ করার কি দরকার যে এরকম বিয়ে সুখের নয়। ভবিষ্যতে যারা এই ধরনের বিয়ে করতে চাইবে তাদের প্রাণে আশঙ্কা জাগিয়ে তোলার জন্যে আমরা বা দায়ী হই কেন?' শুধু এইটুকুই ও বলেছিলো।

'আমি ভেবেছিলাম ওটাই আমার নিজের ঘর। কিন্তু সেটা আমার মনের ভুল। এখন সে ভুল ভেঙে গেছে। এ বাড়ীতে আমি যত স্বাধীনভাবে থেকেছি, তার তিন ভাগের এক ভাগও আমি ওখানে পাই নি— পাওয়া সম্ভবও না। আমি কেন ওখানে যাবো? আমি এখানেই থাকবো। তোমার যদি ইচ্ছে হয় তুমি এখানে এসে থাকো আমার তাতে কোনো আপত্তি নেই। কিন্তু এর সঙ্গে

বিবাহিত জীবনের কোনো সম্পর্ক নেই।' পার্বতী জবাব দেয়।

শঙ্করম এই প্রস্তাব মেনে নেয়। ও চাকরী করে, ওর পয়সা আছে, বাচ্ছাও একটা আছে। কিন্তু নিজের জীবন বলে ওর কিছু নেই। ওর কোনো ঝোঁকও নেই। ওর আত্মা এক মরুভূমিতে দিশেহারা হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। মৃত্যুর পরই বোধহয় ও শান্তি পাবে।

আম গাছ

জলাশয়, পাতকুয়ো, পুকুর, ধানের গোলা ও ফলফুলের বাগান সমেত পাঁচশো গজ জমি। জমিটা কিনে নিয়ে নীলমণি তাতে একটা বাড়ী তুললেন। কিছুদিন হ'লো গৃহপ্রবেশও করেছেন। আমি এখন ও বাড়ীর ভাড়াটে। বাগান বলতে যা পেয়েছেন তা মাত্তর একটা আম গাছ।

আম গাছ আমার খুব ভালো লাগে। যদি একটা আম গাছ দেখতে পাই তো নিষ্পলক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকতে থাকতে ওখানেই বসে পড়ি। আমার জীবনের যা-কিছু মধুর স্মৃতি তা সব আম গাছ নিয়েই। দশ বছর আগের কথা। বয়স তখন আমার পনেরো। একদিন দুপুরবেলা। গাঁয়ের উত্তরেই সব খেত। মাথার ওপর একদিকে কাটফাটা রোদ আর একদিকে কালো কালো মেঘ। খেতগুলোর ওপর হাওয়ায় ভেসে বেড়াচ্ছে। গাঁয়ের বাইরে পাতকুয়োর ধারে ফলেফুলে ভরা আম গাছটা আমি প্রথম লক্ষ্য করলাম। কি বিচিত্র তার শোভা। ভাষায় তা বর্ণনা করতে পারবো না। শুধু বলতে পারি আম গাছটাকে মনে হয়েছিলো ঠিক যেন এক নববধূ; শ্বশুরবাড়ী যাবার চিন্তায় বিভোর। রোদে বসে আছে। হাওয়াও মৃদুমন্দ বইছিলো। হাওয়ায় তাকে ক্ষীণ ও দীন মনে হয়েছিলো।

ঐ ভরদুপুরে কুয়ো থেকে জল নিয়ে একটি মেয়ে মাথায় কলসী আর হাতে বালতি নিয়ে একলা মন্থরগতিতে নিজের শ্বশুরবাড়ীর

দিকে এগিয়ে চলেছে। গায়ে কোনো অলঙ্কার নেই, রূপ তার সর্বাঙ্গে ফেটে পড়েছে। ছল্‌কে-পড়া জল মাথার চুল বেয়ে গাল দিয়ে গড়াচ্ছে। নিঃসঙ্গ, নিঃসহায় এই আম গাছ আর ধীর পদক্ষেপে এগিয়ে চলা ঐ গ্রাম্য-বালিকা, এদের কথা মনে হলেই ভাবি শ্রম আর সৌন্দর্য, দুঃখ ও মাধুর্য, বেদনা ও চেতনা সব যেন জীবনে ওত-প্রোতভাবে মিলেমিশে আছে। রৌদ্রোজ্জ্বল মেঘ যেমন সুন্দর, গ্রাম্য-বালিকাকেও তেমনি সুন্দর মনে হয়েছিলো সেদিন। ফলেফুলে ভরা আম গাছটি আর ঐ গ্রাম্য-বালিকার মধ্যে এক বিচিত্র সাদৃশ্য লক্ষ্য করেছিলাম, যা বর্ণনার অতীত। দুপুরবেলায় মেঘ দেখলেই সেদিনকার সেই আম গাছটি আর ঐ গ্রাম্য-বালার সুপ্রসন্ন মুখটি মনে পড়ে। যখনই সুরেলা কোনো গান শুনি, সঙ্গে সঙ্গে সেদিনকার সেই দৃশ্য— গাঁয়ের কাটফাটা রোদ, খেত পেরিয়ে ওপারের সেই কালো মেঘ, সেই পাতকুয়ো, সেই গাছ আর একাকী সেই বালিকার মন্থরগতিতে চলা— সব চোখের সামনে ভেসে ওঠে, মনে আনন্দ ও বেদনার একটা মিশ্র অনুভূতি জাগে। হাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নেচে চলেছে যেন জলতরঙ্গ, আমবাগানে ঝরনার কলকল রব, গ্রামের বালিকাদের কলকাকলি, শ্যামল ঘন মেঘ— আমার মনে একটা বিচিত্র ভাবের সৃষ্টি করে।

নীলমণি বাড়ীর সামনের ঘরটার ভাড়া কুড়ি টাকা চেয়েছিল। ভাড়াটা আমার পক্ষে একটু বেশিই। কিন্তু তবুও রাজি হয়েছিলাম —ঘরের সামনেই আম গাছ দেখে। এর চেয়ে কম ভাড়ার দু-একটা ঘর আমি যে না দেখেছিলাম তা নয়। ঘরগুলো ছোট, আশে-পাশে সবুজ পাতার চিহ্নও ছিলো না। তাই নীলমণির সব কটা শর্ত মেনে নিয়েই ঘরটা ভাড়া নিলাম।

নীলমণির অনেকগুলো শর্ত— মাসের পয়লা সন্ধ্যের সময় কড়ায়

গণ্ডায় ভাড়া চুকিয়ে দিতে হবে ; ইলেক্‌ট্রিক বাবদ দু'টাকাও ঐ ভাড়ার সঙ্গেই মেটাতে হবে ; রাত এগারোটার পর আলো জ্বালা চলবে না ; অন্য কাউকে আমি ঘর ভাড়া দিতে পারবো না ; মা, বোন, মেয়ে আর বুড়ী-ঝি ছাড়া আমার ঘরে আর কারুর প্রবেশাধিকার থাকবে না। চেঁচামেচি করা চলবে না, সভ্যভাবে সৎলোকের মতো থাকতে হবে।

নীলমণি একের পর এক শর্তগুলো আওড়ে যায়, আমি মাঝ-পথে বাধা দিয়ে বলি, 'আর বলতে হবে না, সব বুঝেছি, ঠিক আছে।'

তার মুখের ভাব দেখে পকেট থেকে দুটো করকরে দশটাকার নোট বার করে তার হাতে ধরিয়ে দিয়ে বললাম, 'নিন, এই মাসের আগাম টাকা।'

নীলমণি নোট দুখানা তুলে নিয়ে ফতুয়ার পকেটে পুরে নিলেন। দেখলাম, কেমন যেন একটু আনমনা হয়ে পড়লেন। টাকা পাওয়ার আগে মনে যে সব চিন্তা ভীড় করেছিলো, টাকাটা পেয়ে বোধহয় সে সব একেবারে উবে গেল।

'রসিদের কোনো দরকার নেই।' বললাম।

'তাতে কি হয়েছে, পরে দেবোখন।'

'তার দরকার হবে না— কিন্তু একটা কথা! একটু আগে বারান্দায় যেন কাউকে দেখলাম— একটি মেয়ে মনে হ'লো, না?' প্রশ্ন করলাম।

'কে? কোথায়? হ্যাঁ, হ্যাঁ··· একটি মেয়েই বটে।'

'ওকে আমার ঘরে আসতে দেবেন না। আমার ঘরে মেয়েদের আনা-যাওয়া আমি পছন্দ করি না।' কথাটা বলেই আমি মাল-পত্তর আনার জন্যে উঠে পড়লাম।

রেভিনিউ অফিসে কাজ করার সময় নীলমণি দুটো বিশ্বযুদ্ধ

দেখেছেন। বিদেশী বড় বড় অফিসারদের অমানুষিক ব্যবহারও তিনি দেখেছেন। আর দেখেছেন জনগণের মধ্যে বিদ্রোহের যে আগুন জ্বলে উঠেছিলো। তিনি গান্ধীজিকে দেখেছেন। শনি-রবিবার অফিসে গিয়ে হাড়ভাঙা খাটুনি খেটেছেন, কিন্তু আখেরে সেই তহশীলদার। রিটায়ার করার পর বাড়ী তৈরী করেন। আমার ঘরটা ছাড়া আরো দুটো ঘর ভাড়া দেওয়া আছে। ভিক্ষে চাইতে এলে তাড়িয়ে দেন, বাচ্চাদের এড়িয়ে চলেন, দর কষাকষি করে সব্জীপাতি কেনেন আর চেয়েচিন্তে খবরের কাগজ পড়েন।

নীলমণি— নামটা আমার বেশ ভালোই লাগে। উনি কিংবা ওঁর পরিবারের কারুর সঙ্গেই আমি মেলামেশা করতে চাই না। নীলমণি যেন ঠিক শুকনো তেঁতুল কাঠ, কেটে দেখলে বোঝা যাবে কতটা টক। ওঁর স্ত্রী হলেন গাছের শুকনো ছাল। ছুঁলে গায়ে কাঁটা ফুটবে। আপনি দেখেছেন কি না জানি না— কিছু নারকেল গাছ আছে, খুব লম্বা ও সতেজ গাছে ফল ধরে না, শুধু যা দেখনাই। ভেতর সব ফাঁপা। নীলমণিরও ঠিক এইরকম এক ছেলে। ল' পড়ে। তেলের একটা কোম্পানীতে চাকরীর চেষ্টা করছে। অন্ধকারে নীলমণির মেয়েকে দেখলে ঠিক বাবলা গাছের ঝাড় মনে হয়। জামাই কাছ থেকে দেখে ভয় পেয়ে যায়। ওকে ছেড়ে চলে গেছে। মেয়েটির আবার এক মেয়ে— যেন একটি পোষা বেড়াল।

তাই— এটাই খুব স্বাভাবিক যে নীলমনির পরিবারের কেউই আমার প্রিয়পাত্র হতে পারে না।

কিন্তু ঘরের ভেতর চেয়ার পেতে বসে আম গাছটা দেখতে আমার খুব ভালো লাগতো। একটু ডাইনে ঘেঁষে বিশ ফুট দূরে

ঐ আম গাছ। বাঁয়ে দু-একটা যা ঝোপঝাড়, এ ছাড়া আর কোনো গাছ নেই। ঐ আম গাছের মাথায় সূর্য-চন্দ্র ওঠে। ওরই মাথায় তারাদের আসর বসে। ঐ আম গাছের তলাতেই দুপুরবেলা আলো-ছায়ার লুকোচুরি খেলা চলে। ওর ছায়াতে বসেই এক বুড়ি ভুট্টা বেচে। ওরই শাখায় টিয়াপাখি এসে বসে। গাছের স্নিগ্ধ ছায়া যখন আমার দেহ স্পর্শ করে তখন সারা দেহমনে এক অপূর্ব আনন্দের ধারা বয়ে যায়।

আম গাছটা আমার খুবই ভালো লাগে।

কিন্তু ···

পরিষ্কার স্নিগ্ধ স্বচ্ছ ও নির্মল এক রাত। মেঘ নেই, চাঁদও নেই। প্রদীপের আলোয় শিশুদের চোখ যেমন জ্বল জ্বল করে তেমনি অন্ধকারে আকাশের তারাগুলো জ্বল জ্বল করছিলো। ঠাণ্ডা হাওয়া, হাওয়ার গতি ছিলো না। রোজকার মতো জানলার ধারে চেয়ারে বসেছিলাম। আম গাছটা যেন ঘোমটা-পরা বধূর মত আমার সামনে দাঁড়িয়ে। রাত তখন আটটা, চারদিক নিঝুম, নিস্তব্ধ। সবুজ সুগন্ধে ভরা একটা মিষ্টি গানের সুর আলসে হাওয়ার সঙ্গে ভেসে আসে। গানটা আস্তে আস্তে আমার দিকে ভেসে আসতে আসতে পথ ভুলে অন্য কোথাও চলে যায়। আবার পথ খুঁজে আমার কাছেই ফিরে আসে। আমার ইচ্ছে হচ্ছিলো গানটাকে ধরে লুকিয়ে রাখি। গানটা এত সুন্দর, এতোই মধুর যে তা পুরোপুরি উপলব্ধি করার জন্যে আমি একটা সিগারেট ধরালাম, একটা টান দিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে চোখ বন্ধ করলাম।

চোখ খুলে দেখি সামনের সেই সবুজকান্তি বালা তার ঘোমটা খুলে দিয়ে আলোয় ঝলমল করছে। অবাক হয়ে যাই।

আর কিছুই নয়। ঐ গাছের ডালে প্রতিবেশীরা একটা আলো ঝুলিয়েছে। তার নীচে একটা টেবিল, টেবিলের চারদিকে চেয়ারে চারজন ভদ্দরলোক বসে তাস খেলছেন। 'এই জায়গাটা বেড়ে,' একজন বলেন, 'আমাদের নীলমণি ভায়া আম-পাড়া ছাড়া আর কোনো ভাবেই গাছটাকে কাজে লাগাতে পারে নি।' যদি নীলমণির কানে একথা যায় তো আমাদের জ্যান্ত চিবিয়ে খাবে, এ সব কথা বোলো না। পড়শী তার সঙ্গীসাথীদের সাবধান করে দেয়। 'গাছের পাতা ওর, আম আমাদের।' এই বলে একজন হো হো করে হেসে ওঠে।

মনে মনে ভাবি, 'যদি নীলমণির কানে এ সব কথা যায়…।' এমন সময় বারান্দায় যেন কিসের শব্দ হ'লো। বাইরে বেরিয়ে দেখি জন্তুরা যেমন ঝোপেঝাড়ে ওত পেতে বসে থাকে তেমনিভাবে নীলমণি বারান্দায় দাঁড়িয়ে ওদের দিকে চেয়ে আছেন। ওঁর মুখের দিকে তাকালে রীতিমত ভয় হয়।

চারদিন আমি ওদের এইরকম ভাবে তাস খেলতে দেখি। পাঁচ-দিনের দিন নীলমণি আমার ঘরে এসে জিজ্ঞেস করলেন, 'দেখছো বাবা?'

তাঁকে চেয়ারে বসতে বলে আমি প্রশ্ন করি, 'দেখার কি আছে?'

উনি বসলেন না। দাঁড়িয়ে রইলেন। পরনে নীল রঙের ধুতি ও ময়লা গেঞ্জিতে ওঁকে ঠিক একটা আধপোড়া কাঠের চ্যালার মত দেখাচ্ছিলো। পড়শীর বাড়ীর দিকে ইসারা করে বললেন, 'দেখো, ওরা নিজেদের পায়ে নিজেরা কুড়ুল মারছে।'

'হ্যাঁ, তাস খেলাটা ভালো নয়।' আমি বললাম।

'ভালোমন্দের কথা বলছি না, খেলতে হয় নিজের ঘরে বসে খেলুক,

তাতে আমার কিছু বলার নেই। ঘরে জায়গা না থাকে তো শ্মশানে গিয়ে খেলো না কেন। তাস খেলে ফতুর হলেই বা আমার কি? কিন্তু ঐ বেআক্কেলগুলো আর কোথাও না গিয়ে আমার আম-গাছের তলায় কেন খেলতে বসেছে, তা বুঝতে পারলাম না।'

'জায়গাটা তো ওদেরই?'

'তা হতে পারে, কিন্তু আমার গাছের তলায় বসে তো খেলতে পারে না।'

'এ কথা তা হলে ওদের জানিয়ে দিন না।'

'জানাবো না কেন? বলেছি তো। ওরা বলেছে, একথা বলার আমি কে।'

'আপনি কি উত্তর দিলেন?'

'জানতে পারবে বাছাধনরা আমি কে। পারবে, সময় হলেই বুঝবে,' এই বলে নীলমণি হঠাৎ ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

আম গাছটা যে নীলমণির তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু ডালগুলো ঝুঁকে তো ওদের দিকেও গেছে। ভালো ভালো ডালগুলো কিছুটা রাস্তার দিকে আর কিছুটা পড়শীদের দিকে ছড়িয়ে পড়েছে। সেটার জন্যে কারই বা কি করার আছে? দু'দিন পরে। সেদিন রবিবার ছিল। সহরে ঘুরে ফিরে বেলা একটা নাগাদ ফিরলাম। যখন বাড়ী ফিরি তখন রাস্তায় খুব হৈ-হট্টগোল শোনা যাচ্ছিল। ঝাঁকা মাথায় একটা বুড়ী তেড়ে গালিগালাজ করছিলো— জানি না কার উদ্দেশে। এমন সব গালাগালি যে কানে আঙুল দিতে হয়। কাছে গিয়ে দেখি সে বুড়ী আর কেউ নয়, ভুট্টা বেচতো যে সেই। ওর কথাবার্তায় বুঝতে পারলাম যে ঝগড়ার নিষ্পত্তি হয়েছে। জিত বুড়ীরই হয়েছে, কিন্তু শত্রুরা পালিয়েছে।

'কি দিদিমা, কি হয়েছে?' আমি প্রশ্ন করি।

'দেখো তো বাপু ঐ টেকোটার জন্যেই এতো সব গণ্ডগোল।' বুড়ী বলে। নীলমণির সত্যিই মাথাভরা টাক।

'কেন কি বলেছে?'

'শোনো একবার কথা। বলে গাছটা তার, গাছের ডালও তার। তাই গাছের নীচে কেউ বসতে পারবে না। বলে কিনা, আমি ওখানে বসি বলে ওর অসুবিধে হয়।' বলতে কি ও থাকাতে আমারও অসুবিধে হয়। কিন্তু ও যাবে কোথায়, কোথায়ও তো ওর যাবার জায়গা নেই।

'জায়গাটা ওরই। বাবুজী, শুধু আমার একটা প্রশ্নের জবাব দাও। এই রাস্তাটাও কি ওর? পয়সা দিয়ে কি এটাও কিনেছে? না, লাল পাথর আনিয়ে রাজমিস্ত্রি খাটিয়ে বানিয়েছে। টেকোমাথা মিন্‌সে কোথাকার। এই রাস্তায় কি ওর একলা হাঁটার অধিকার? সাহস থাকে তো আর একবার এসে বলুক যে পথটা শুধু তারই। তা'লে ঐ টেকোমাথা ঠিক করে ওর বৌকে হাটে আর মেয়েটাকে ঘাটে যদি নিয়ে না যাই তো আমি— আমি নই, আমার বাপ আমার বাপ নয়, আমার সোয়ামি আমার সোয়ামি নয়।' বুড়ী শপথ নেয়।

রাস্তায় আম গাছের ছায়ার ওপর নীলমণি যে অধিকার দেখাচ্ছে, তা আমার মোটেই ভালো লাগলো না।

তিনদিন পরে নীলমণির লাগানো বাঁশের বেড়া পার হয়ে যখন বারান্দায় পৌঁছোলাম তখন ওর ছেলেকে দেখতে পেলাম।

'কি করছো হে?' জিজ্ঞেস করলাম।

'গালিগালাজ শুনছি' জবাব এলো।

'কি করবে বলো ?'

'সেই কথাই তো আমি বলছি। কিছু করার নেই। এই অসভ্যগুলোর জন্যে বেশ হয়রানি হচ্ছে।'

দুদিন পরে মামলা আরো অনেকদূর গড়ালো। সন্ধ্যে সাতটা নাগাদ আমি ঘরে ফিরেছি। প্রতিবেশীরা তখন তাসখেলায় মশগুল। কিন্তু গাছেতে আলো জ্বলছিলো না। টেবিল লাইট জ্বালিয়ে খেলা হচ্ছিলো। বারান্দায় চেয়ার পেতে নীলমণি বসেছিল। আমাকে দেখতে পেয়েই বলে উঠলেন, 'দেখছো, আজকে গাছে আলো জ্বলে নি ?'

'হ্যাঁ,.তাইতো দেখছি।'

আলো জ্বালালে, এদের মেরে ফেলতাম।' নীলমণির বোধহয় মনে মনে খুব আফসোস ; ওরা গাছে আলো না জ্বালিয়ে নীচে টেবিল লাইট জ্বেলে কেন খেলছে; ওদের মেরে ফেলার পথে এটা যেন বাধ সাধলো।

'কিন্তু ওরা ধরা ঠিকই পড়বে। তখন উচিত শিক্ষা দেবো।'

'দেখা যাক।' বলে ফেললাম।

'ওর ফয়সালা আজ হয়ে গেছে।' আবার তিনি বলে ওঠেন।

'কিসের ফয়সালা ?'

'ঐ ভুট্টা বিক্রী করে যে বুড়ীটা। ঐ তাড়কারাক্ষুসী। তার উচিত শিক্ষা হয়েছে।' মিউনিসিপ্যালিটির মুখপোড়া লোকগুলোকে বললাম যে রাস্তাটা তোমাদের। তাতেও বেটারা চুপচাপ থাকে। এই বীটের যে তদারক করে তার হাতে তিনটে টাকা গুঁজে দিলাম। তখন বেটা বুড়ীর ঝুঁটি ধরে টানতে টানতে নিয়ে গেলো। বলছিলো ওরও অধিকার আছে। ওর কি অধিকার আছে?'

পরের দিন রাত্তিরে একটু দেরী করে বাড়ী ফিরলাম। দেখি, নীলমণি রেগে টং। অন্ধকার বারান্দায় তাঁর স্ত্রী ও মেয়ে এলো-চুলে এমন উদাস হয়ে বসেছিলো যেন এই মাত্তর ওদের ঘর থেকে কোনো মড়া নিয়ে যাওয়া হয়েছে। আমি ওখানে পৌঁছানোর পরও নীলমনি ওদের ভেতরে যেতে বললেন না। বুঝতে পারলাম ব্যাপারটা খুবই 'সিরিয়াস'।

বলতে কি ব্যাপারটা সত্যি খুবই সিরিয়াস। সেদিন দুপুরে প্রতিবেশীদের ছেলেমেয়েরা আমের ডালেতে দোলনা বেঁধে (না জানি কতক্ষণ আগে দোলনাটা বাঁধা হয়েছিলো) মনের আনন্দে দোল খাচ্ছিলো। নীলমণি বার বার ওদের দোল খেতে বারণ করেন। ওদের চলে যেতে বলেন। কিন্তু বলে কিছু লাভ হয় নি দেখে নীলমণি দড়ি কাটার জন্যে তৈরী হন। প্রতিবেশীরা নীলমণিকে শাসায়। নীলমণি ঐ জমিতে পা দিলে তার ঠ্যাং আর আস্ত থাকবে না। কিন্তু ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা যখন মারবো বললো তখন নীলমণি আর ঠিক থাকতে পারেন না। ওদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। বাচ্চারা পাথর ছুঁড়তে আরম্ভ করে।

'মারপিট তো হয় নি?'

'মাঝে আমি এসে পড়ি, নইলে ওঁর মাথা ফেটে যেত।' নীলমণির স্ত্রী জবাব দিলেন।

মনে হ'লো, ভুট্টাওয়ালী বুড়ীটাও নিজের জায়গায় ফিরে এসেছে। পুলিশকেও খবর দেওয়া হয়েছিলো, ওরা বোধহয় বলেছে, 'গরীব মানুষ, ছেড়ে দিন।' ঐ বুড়ীর কাছ থেকে পুলিশরা রোজ দুটো করে ভুট্টা পাবে তাও পাকাপাকি হয়ে গেছে।

'যদি এ রকম কোনোকিছু বোঝাপড়া না হ'তো, তা'লে ওর এতো

কি সাহস যে আবার এখানে এসে বসে। বীটওলার নামেও রিপোর্ট গেছে— তবে বিনা সইয়ের। জানি না কে লিখেছে। যাক সে কথা। দোলনার এই দড়িগুলো এখন ফাঁসির মতো আমার গলায় ঝুলছে। এর এখন কি উপায় করা যায়। পুলিশে রিপোর্ট করবো? পুলিশের কোনো লোকের সঙ্গে তোমার চেনাজানা আছে?' নীলমণি জিজ্ঞেস করে।

পুলিশের সঙ্গে আলাপ পরিচয় থাকে শেঠ, সাহুকার আর টাকাওয়ালা লোকেদের। আমাদের মতো লোকেদের পরিচয় রেখে কোনো লাভ নেই। বরঞ্চ বিপদের সম্ভাবনাই বেশি। তবুও বললাম যে পুলিশের কাউকেই আমি চিনি না।

'তুমি তো পুলিশেই কাজ করো, তা সত্বেও কাউকেই চেনো না বলছো?' নীলমণি আমার ওপর চটে ওঠেন।

'আমি ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্টের মুনিম।'

'তাতে কি হয়েছে?'

'আমি সবে নতুন এসেছি। কাউকেই বিশেষ জানি না।'

'অন্তত কিছু লোকের তো তোমার মুখ চেনা, একথা তো তুমি আর অস্বীকার করতে পারো না।'

'এক-আধ জনকে চিনি।'

'শালারা কেমন?'

'মানে?'

'মানে শলাপরামর্শ করলে টাকা চাইবে না তো?'

'জানি না, সে কথা আমি কি করে বলবো।'

শেষ পর্যন্ত উকিলদের সঙ্গে শলাপরামর্শের ভারটা নীলমণি আমার ওপরই চাপালেন। আমিও এড়াতে পারলাম না।

উকিলরাও পরামর্শ দিলো : প্রথম কথা নীলমণির গাছের ডাল ওদের বাড়ীর মধ্যে যাওয়া উচিত নয়। প্রতিবেশীরা যদি গাছের ডাল ও পাতা কেটে নীলমণির বাড়ীতে ফেলে দেয় তো কারুর কিছু বলার নেই।

আমরা তুজনেই একটু ভয় পেয়ে গেলাম। যদি সত্যিই ওরা ডাল কেটে ফেলে। কিন্তু নীলমণি একটু ভেবে বললো, 'না, তা করবে না।'

'কেন কাটবে না ?'

'কেটে ফেললে আম হবে কি করে ?'

'আম না হোগ্‌গে।'

'সাংসারিক কোনো বুদ্ধিই তোমার হয় নি। আমের লোভেই তো এই সব চাল খেলছে।' এই ধরনের চাল আমাদের নীলমণিই খুব তাড়াতাড়ি ধরতে পারেন।

'ঝি বলছিলো ওরা কাল আরো হল্লা করবে।' নীলমণির মেয়ে বললো।

আমার মনে হচ্ছে এই খুটখাট ঝগড়া পরে বড় রকমের কাল-বৈশাখীর রূপ নেবে।

আর হ'লোও ঠিক তাই।

ব্যাপারটা দাঁড়ালো এইরকম :

পরের দিন যখন ঘরে পৌঁছালাম তখন নীলমণি বাড়ী ছিলেন না। রোজ দরজার সামনে চেয়ার পেতে বসে এই পাপী সংসারের দিকে নিষ্পলক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকাটা একরকম নিত্যকার অভ্যেসে দাঁড়িয়ে গেছিলো। কিন্তু সেদিন সে নিজের চেয়ারে ছিলো না। আমি ভাবলাম নিশ্চয়ই কিছু একটা ঘটেছে, তাই চুপচাপ নিজের

ঘর খুলে ঢুকে পড়ি। দরজা খোলার আওয়াজ পেয়ে ওঁর স্ত্রী নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'নীলমণি কোথায় গেছেন?'

'কি বলবো বাবা, আমার মুখ দিয়ে তো কথা সরছে না।'

'কেন? কি হয়েছে?'

'খুন হয়ে যেতেন' বলে উনি সমস্ত ঘটনাটা বলতে সুরু করলেন :

দুপুর, ঠিক একটা বেজেছে। উনি ঘড়ি ঠিক করছিলেন। বাইরে চেঁচামেঁচি শুনে উনি গিয়ে দেখেন যে বাঁদরের ঝাঁড়ের মতো ছোট ছোট বাচ্চারা প্রতিবেশীর বাড়ীতে এসেছে। শুধু আসা নয়, সবাই দোলায় চেপে দোল খাচ্ছে। উনি ওদের নামতে বললেন। ওরা গালাগালি দিতে সুরু করলো— এতো সব খারাপ গালিগালাজ যা নীচ লোকদের মুখেও সচরাচর শোনা যায় না। ইতিমধ্যে আমার মেয়ের বেড়ালটা— তুমি ওকে নিশ্চয়ই দেখে থাকবে— গোবেচারা ইঁদুরটা পর্যন্ত ধরে না— সে বেচারা ভুল করে ওদের মধ্যে গিয়ে পড়ে, যেই পৌঁচেছে— হারামজাদারা সব পক্ষাঘাত হয়ে মরুক— অমনি ওর ল্যাজটা ধরে ঘোরাতে ঘোরাতে সবাই বলতে থাকে, কেন এসেছিস আমাদের জায়গায়, কোত্থেকে এসেছিস? এরা কি মানুষ! বড়রা ওদের পিছু থেকে উস্কানি দিচ্ছে তো, ছোটদের কি দোষ? শেষ পর্যন্ত বেড়ালটার পা-টা ভাঙলো। ওকে কাতরাতে দেখে আমরা আর থাকতে পারলাম না। তুমিও দেখবে, ওকে এখন থানায় নিয়ে গেছে।

'থানায় কেন নিয়ে গেছে?'

'কি আর বলবো বাবা, আমাদের বেড়ালের পা ভাঙলো, আমাদের যত রাজ্যির গালাগালি দিলো— এসব তো এরাই করেছে। এতো সব

করার পর পুলিশে রিপোর্ট করেছে, নাকি আমরা মেরেছি ওদের। বেড়ালটা যখন কাতরাচ্ছে, তখন তার অবস্থা দেখে আমার মেয়ে আছাড় খেয়ে মাটিতে পড়লো। এই রকম যে মেয়ে সে ওদের বাচ্চাদের কি করে ঠেঙাতে পারে, বলো। ওরা রিপোর্ট করেছে যে আমার মেয়ে ওদের বাচ্চাদের মেরেছে। ওদের মতিভ্রম হয়েছে। এখন উনিও রিপোর্ট করতে গেছেন।'

আমি জানতাম এই মামলা শেষ পর্যন্ত আমার আদালতেই পেশ হবে। তাই নিশ্চিন্তে আমি ঘুমিয়ে পড়লাম। মাঝরাতে কে যেন কড়া নাড়লো। দরজা খুলে দেখি, বাড়ী থেকে টেলিগ্রাম এসেছে, কিছু ব্যক্তিগত কাজে আমায় ডেকে পাঠানো হয়েছে। পরের দিন সকালেই আমি বেরিয়ে পড়লাম। তিনদিন নিজের গাঁয়ে থাকতে হ'লো। কাজটা পুরোপুরি মিটলো না। কিন্তু চারদিনের দিন ভোরবেলায় আমায় ফিরে আসতে হ'লো।

কাজে ভীষণ ব্যস্ত থাকায় আম গাছের ব্যাপারটা একেবারে ভুলে গেছিলাম। ট্রেন থেকে নেমে রিক্সায় করে বাড়ী ফিরলাম। রিক্সাওয়ালাকে ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে ব্যাগ হাতে নিয়ে যখন বাড়ীর দিকে তাকালাম তখন সন্দেহ হ'লো এটা অন্য কারুর বাড়ী নয় তো। ভুল করে অন্য কারুর বাড়ী ঢুকে পড়লাম না তো। না, তা তো নয়। থমকে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম।

পরে নীলমণিকে ডেকে জিজ্ঞেস করলাম, 'এ কি হয়েছে, এ কি করেছেন আপনি?

শুনে নীলমণির মুখচোখের চেহারা পালটে গেল। আমায় যেন তেড়ে খেতে এলেন। যতসব অশ্রাব্য কথা ব'লে গেলেন। ভালো কথা একটিও মুখ থেকে বেরুলো না।

যা উনি বললেন তার সারমর্ম হ'লো এই : আমার যা খুশী তাই করবো। আমাকে প্রশ্ন করার তুমি কে হে ? ওরাই বা কে ? বাকী সবায়ের কথা বাদই দিলাম, কিন্তু তুমি কে হে আমাকে প্রশ্ন করার ? যদি অতই সাহস থাকে তো ঐ মড়াদের গিয়ে জিজ্ঞেস করগে যাও। আমি পুলিশে ঠিক রিপোর্ট লিখিয়েছি। কেউ কি তা অস্বীকার করতে পারে ? আমি একটু সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে ছিলাম, তা ওদের সইলো না। আজেবাজে রিপোর্ট লিখিয়ে আমার ঘরে আগুন লাগাবার চেষ্টা করেছে। আমার আশ্রয়ে আমার ছায়ায় থেকে আমার প্রতিবেশীরা আজ আমার বিরুদ্ধে হয়ে গেছে। আমার ঘরেই আগুন লাগাতে চায়, শালারা আমাকেই বোকা বানালো। আমার কাছে আমগাছের ছায়াটা অবধি থাকতে দিলো না। গাছে আম হলে মনে করছো ওরা আমায় খেতে দেবে। তুমি কি এ বিষয়ে হলফ করে বলতে পারো ? আমায় দাসখত লিখে দিতে পারো ? মড়াদের এদিকে আসা বন্ধ করতে পারবে ? পথ-চলতি সব বেশ্যা মাগীরা আম পেড়ে নিয়ে যাবে। তাদের বাধা দিতে তুমি কি পাহারা থাকবে এখানে ? আমার গাছের ডাল আমি পাবো না। যে জিনিসটা আমি পাবো না, তা আমি অপরের জন্যে কেন রাখবো ? ছোট্ট একটা পাতা হলেই বা কি হবে, যেটা আমার সেটা আমি অন্যকে দেবো না। আর কেনই বা দেবো। এ গাছটা যদি তোমার হ'তো, তা'লে তুমিই কি আমাকে আর্ধেক পাতা দিতে ? না ও আমাকে দেবে ? তাই আমার জিনিস, আমার যা খুসী তাই করবো।

বুঝলাম নীলমণির সঙ্গে তর্ক করে কোনো লাভ নেই।

ওর মাথার মতোই সমস্ত ঘরবাড়ী এলোমেলো ও লণ্ডভণ্ড হয়ে আছে। সামনের খালি জায়গাটা ঠিক শ্মশানের মতো দেখাচ্ছে।

চারদিকে ডালপালা ছড়িয়ে পড়ে আছে। গাছটা টুকরো টুকরো করে কেটে ফেলা হয়েছে। শুকনো পাতা হাওয়ায় উড়ে বেড়াচ্ছে। বাড়ীটা শ্রীহীন প্রাণহীন শ্মশান মনে হচ্ছে। আমার ঘরটা রোদে পুড়ছে। রাস্তায় যে বুড়ীটা বসে সে বোধহয় রোদে ঝলসে গেছে।

পরের দিনই আমি ঘরটা ছেড়ে দিই।

এই পুরো ঘটনাটা আমি এত সবিস্তারে বললাম তার কারণ—

এই বাড়ীওলা, এই প্রতিবেশীরা, এই নালায়েক লোকটা, এই ঝগড়া, এই আদালত, এখানকার জজ্, উকিল, দাবীদার, থানাদার, জেলখানা, এই হাতকড়া, এই নিরীহ লোকদের বাঁধবার জন্যে যে শেকল— এ সব দেখে আমার মনে হয় যে মানুষ নামে যে ছোট্ট জীবটি, তা কখনও পালটাবে না, এই সংসার শুধু নরক, এখানে ভালো কিছু হবার নয়। বেঁচে থাকাটাই একটা বিরাট সমস্যা।

কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গেই—

ঝকঝকে রোদ্দুর, মায়ের মতো স্নেহপ্লুত কালো মেঘ, মুকুলিত আমের গাছ, রোদ্দুরে ধীর মন্থরগতিতে চলমান গ্রাম্যবালার মুখ— সব-কিছু মনে পড়ে যায়। বর্ষার সময় ওখানকার লোকেদের কথা মনে পড়ে। হাসিমুখে হাড়ভাঙা খাটুনি খেটে চলেছে যে জনতা তাদের মুখচ্ছবি ভেসে ওঠে। গাছের একটু ছায়ার জন্যে লালায়িত ঐ বুড়ীর কথা আমার স্মৃতিপটে চিরকাল আঁকা থাকবে। তখন আবার ভাবি নিরাশ হবার কিছু নেই। এই নরককে আমরা সুন্দর করে তুলতে পারি। খেটে পরিশ্রম করে একে আনন্দে ভরিয়ে তুলতে পারি। মনে আশার এক ক্ষীণ আলো দেখা দেয়।

আশা-কিরণ

সকাল থেকে দোরে দোরে ঘুরে ভেঙ্কটেশওয়ালূ´ একটার পর বাড়ী ফিরলো। কোথাও এক মুঠো চাল জোটে নি। কোথাও যে চাল পাবে না ও জানতো। অন্য কোথাও থেকে যে চাল জোগাড় করবে আশা ছিলো না। তবু পাগলের মতো মিছিমিছি ঘুরতে বেরিয়েছিলো। পেটের জ্বালা, হতাশা আর শীতের বেলা— এই তিন মিলে তাকে যেন দিশেহারা করে দিয়েছিলো। শেষে এক মুদির দোকানে চালের দর করতে গেলো।

'চালের কত দাম?' জিজ্ঞেস করলো। তার অদ্ভুত চেহারার দিকে সন্দেহের দৃষ্টিতে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে দোকানী বললো, 'আশী টাকা মন।'

'আচ্ছা' বলে ভেঙ্কটেশওয়ালূ´ কেটে পড়লো। পথে ধর্মশালার চাতালে বসে পড়লো। ভিখিরীরা মাটির বাসনে রান্না করছিলো। তাদের দিকে তাকিয়ে রইলো। মনে হিংসার আগুন জ্বলে, বুকে জাগে আশা। চোখে জল আসে। ছোটবেলায় যখন কাঁদতো, মা কাছে ডেকে ভোলাতো। এখন তার স্ত্রী তাকে মুখ ঝামটা দেয়, বাচ্চারা মুখের দিকে আশ্চর্য ভঙ্গিতে তাকিয়ে থাকে। চাল জোগাড় করতে না পারা বা খিদের জন্যে এ কান্না নয়; নিজের অক্ষমতায়. নিজে নিষ্কর্মা বলে চোখ ভিজে ওঠে। জোর করে কাঁদতেও পারে না। বুকফাটা কান্না এ নয়, যা হাওয়া কাঁপিয়ে পাহাড়ে প্রতিধ্বনি

তুলে আক্রোশ জানায়। যে সব বর্ষার পোকা যেমন কাদায় চলে ফিরে বেড়ায় তাদের ওপর কারুর পা পড়লে তারা নিমেষে নিঃশেষ হয়ে যায়; তাদের নিষ্করুণ ও অক্ষম চিৎকারের মতো ওর কান্নাটা শোনায়। যেন একটা অকর্মণ্য লোকের নির্মম বেদনা।

চোখটা একটু রগড়ে নিয়ে খানিকক্ষণ এদিক ওদিক ঘুরে পুলটার ওপরে গিয়ে পৌঁছায়। খালের ধারে ধারে, আস্তে আস্তে এগুতে লাগলো। আবার গাঁয়ের দিকে ফিরলো, তারপর বাড়ী। এদের সবাইকে কি বলবে? বাড়ীর সবাই— স্ত্রী আর পাঁচটা বাচ্চা ক্ষিদে তেষ্টায় তিলে তিলে কষ্ট পেয়ে এরা যদি মরে যায়, তবেই ও একটু নিশ্চিন্ত হবে; স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলবে। তখন ওকে আর কেউ বলবে না কেন চাল নিয়ে আসে নি। ওকে গালিগালাজ করার, ওর প্রতি দয়া কিংবা আক্রোশ দেখাবার আর কেউ থাকবে না! কিন্তু এরা কেউ মরে না। বাড়ীতে মাটিতে আঁচল বিছিয়ে শুয়ে আছে স্ত্রী। স্বামীকে দেখে একবার চোখ মেলে তাকায়। কিন্তু কিছু নেই দেখে আবার চোখটা বন্ধ করে। দীর্ঘশ্বাস ফেলে ও ঘরের দিকে পা বাড়ালো। বড় মেয়ে জয়া সবার ছোট ভাইকে কোলে নিয়ে দোরগোড়ায় দেওয়ালে ঠেসান দিয়ে বসে আছে। শুকনো ঠোঁট, কড়িকাঠের দিকে চেয়ে আছে। অন্য ছেলেপুলেরা কোথায় বোঝা গেল না। ভেঙ্কটেশওয়ালু মেয়ের নজর এড়িয়ে বাড়ীর পেছন দিকে চলে গেল। পাতকুয়ো থেকে জল তুলে হাত-পা ধুয়ে বাদাম গাছটার তলায় গিয়ে বসলো।

ও যেন দুর্বল হয়ে পড়েছে। এক মুহূর্তের জন্যে যেন সব ঘুরতে থাকে— পাতকুয়ো, গাছ ও গাছে-বসা কাকটা। শুকনো পাতার ওপর শুয়ে পড়ে। সমস্ত শরীরটায় যেন খেঁচ ধরেছে, মৃত্যুর বেশি

দেরী নেই। ভয় ধরে। এমনিতে আগেও অনেকবার মরার কথা ভেবেছে। মরার আগে যদি জানা না যায় যে মৃত্যু আসন্ন, তা'লে মরাটাও যেন বৃথা। মনে মনে বকে, 'আমি নিষ্কর্মা, একেবারে নিষ্কর্মা, একদম নিষ্কর্মা।' তার চোখ দিয়ে অঝোরে জল গড়িয়ে পড়ে।

মুদির দোকানে গিয়ে যদি কাকুতি-মিনতি করে বলতে পারতাম, 'দাদা, আমি বড় গরীব, দুদিন পেটে কিছু পড়ে নি, দুমুঠো চাল যদি দয়া করে দেন তো বড় উপকার হয়', তা হলে হয়তো মিলতো। এতো সহজ কাজটা আমি করতে পারছি না কেন? কারণ, আমি যে নিষ্কর্মা। ভিখিরীও তো বেঁচে আছে। কাক-পক্ষী, জন্তু-জানোয়ারও তো বেঁচে আছে। শুধু ওরই বাঁচার পথ নেই। ভেবেছিলো, বাড়ী ফিরেই তো বৌয়ের মুখ ঝামটা খেতে হবে। কিন্তু বৌ কিছু বললো না। মনে সন্দেহ জাগে। ভাবে, হয়তো এরা কোথাও থেকে চাল এনে খেয়েছে। তা হলে কি আমাকে দিতো না? আমাকে তো কেউ খেতেও বললো না। মনে একটু আশা হয়। উঠে আস্তে আস্তে রান্নাঘরের দিকে এগিয়ে যায়। ভাতের হাঁড়ির ঢাকনা খুলে দেখে। ভাত আর একটু চাটনি দেখতে পায়। দ্বিধা নিয়ে এদিক ওদিক একটু তাকায়। তারপর চাটনির সঙ্গে ভাত মেখে খেতে যায়। হঠাৎ তার স্ত্রী দরজা খুলে ভেতরে এসে হাতটা চেপে ধরে টানতে টানতে বাইরে নিয়ে এলো।

'সেই সাত সকালে বেরিয়েছো চাল আনতে। আর এখন ফিরছো? আমার ও ছেলেমেয়েদের কথা একবারও ভেবেছো কি? বড় মেয়েটা দোরে দোরে ভিক্ষে করে আধসেরটাক চাল জোগাড় করেছে। কাল রাত্তিরেও ওদের কিছু জোটে নি, আজও সকালটা উপোস দিয়েছে। এতক্ষণে সব তো মরে ভূত হয়ে যেতো, তার

তাতে তুমি খুশীই হ'তে। তোমার কি এসে যায়। কোথাও না কোথাও তো দুমুঠো খেয়ে নিয়েছো। ছোট ছেলেটা না খেয়ে দেয়ে একটু ঘোলের পানা জোগাড় করতে গেছে। তার মুখের ভাত তুমি লুকিয়ে এসে গিলছো? নিজের ছেলেকে পেটে মারতে চাও?'

ওর বউ ওকে খুব বকাবকি করে। কিন্তু পরমুহূর্তেই ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে। ভেঙ্কটেশওয়ার্লু'র শিরায় শিরায় বেদনা ফুটে ওঠে। মুখটা তেতো হয়ে যায়। নিজের ওপর ঘৃণা হয়। স্ত্রীর জন্যে কষ্ট হয়। বিয়ের পর যখন এসেছিলো, তখন কত শান্ত, কত মধুর ছিল ওর স্বভাব। আর আজ কত বদলে গেছে। কেন গেছে তা সে জানে। ওকে সান্ত্বনা দিতে চায়, বোঝাতে যায়। কিন্তু তা হয় না। বেরিয়ে চলে যায়।

আবার সেই ধর্মশালার একটা রকের এক কোণে বসে পড়ে। কয়েকটা ভিখিরী শুয়ে শুয়ে গল্প করছে; নিজের নিজের কাপড় ও বাসন নিজের কাছে রেখে দিয়েছে। নোংরা ছেঁড়া কাপড়, জটপরা চুল, নির্লজ্জ বেশভূষা। ময়লা গা, দেখলে মনে হয় নালার এক ঝাঁক পোকা। ভেঙ্কটেশওয়ার্লু নিজের দিকে তাকায়। নিজের সঙ্গে ওদের বিশেষ তফাত নেই। ওরাও কোনরকমে বেঁচে আছে। এ ভাবে বেঁচে থাকার কি অর্থ? বাঁচার এতো আগ্রহ কেন? অন্ধ, খোঁড়ার রাস্তার ধুলোয় গড়াগড়ি খেয়ে নিজেদের দৈন্যদশা দেখিয়ে লোকের মনে করুণা জাগিয়ে বেঁচে থাকার এ লালসা কেন? বেঁচে থাকার এই নিদারুণ আকর্ষণ, তার রহস্য যেন একটু বুঝতে পারছে। সব ভাঁওতা, ধাপ্পাবাজি। মাছের মতো খেলিয়ে খেলিয়ে কে যেন এদের আস্তে আস্তে তিলে তিলে কাঁদিয়ে কাঁদিয়ে টুক্‌রো টুক্‌রো করে মারছে।

ভেঙ্কটেশওয়ার্লুর দীর্ঘশ্বাস পড়ে। মরবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়। এ সংসারে বেঁচে থাকার চেয়ে বড় যন্ত্রণা আর নেই। নিজেও সে বাঁচতে পারবে না, আবার পরিবারের কাউকেই বাঁচাতে পারবে না। নিষ্কর্মা অভাগা, অক্ষমদের ভগবান কেন এই পৃথিবীতে নিয়ে আসেন। ধর্মশালার দেওয়ালে ঠেসান দিয়ে সে নিজের জীবনটার দিকে তাকিয়ে দেখে। ওর যেদিন চাকরি যায় জীবনে দুঃখ সুরু সেদিন থেকেই। প্রাইমারী স্কুলে যতদিন পড়িয়েছে ততদিন কোনোমতে সংসার চলে গেছে! কিন্তু সত্যিই ও বোকা আর পাগল। তা না হলে স্কুল-ইন্‌স্‌পেকটরের আঁচল ধরে টানলো কেন? যদি বলে কোনো কুমতলব ছিলো না, তা হলেও কি কেউ ওর কথা বিশ্বাস করতো। ইন্‌স্‌পেকসনের দুদিন ঐ ভদ্রমহিলা ওর সঙ্গে অতো ফষ্টিনষ্টি করছিলেন কেন? ওর ক্লাসে ইন্‌স্‌পেকসনের সময় ঐ ভাবে হাসছিলেনই বা কেন? কোনো না কোনো অছিলায় তিনি ওকে তাঁর বাড়ীতেই বা অতবার করে ডেকে পাঠাচ্ছিলেন কেন? ভেবেছিলো, মেমসাহেবের ও খুবই প্রিয়পাত্র। আব মেমসাহেব ওকে পছন্দ করেন। শেষের দিন যখন ভদ্রমহিলা ওর ক্লাসে গেলেন তখন ও ঘুমোচ্ছিলো। সত্যি বলতে কি ঠিক সেই সময়েই ওর চোখটা লেগে গেছিলো। রেগে গিয়ে ভদ্রমহিলা ওকে উল্টোপাল্টা সব প্রশ্ন করতে থাকেন। ছেলেদের প্রশ্ন করায় তারা ঘাবড়ে সব দাঁড়িয়ে ছিল। উনি রেগে একেবারে চামুণ্ডা হয়ে উঠলেন। সমস্ত অধ্যাপকদের সামনে 'এটা মোষ তাড়ানোর কাজ নয়, ভেঙ্কটেশওয়ার্লু, আমি তোমার বিরুদ্ধে রিপোর্ট লিখবো' এই কথা বলে তিনি চলে গেলেন। ও ঘাবড়ে গিয়েছিলো। পিছু পিছু ও 'ম্যাডাম, ম্যাডাম' বলে চলতে থাকে। ওর কথায় ম্যাডাম যখন

কোনো ভ্রুক্ষেপ করলেন না তখন ঘাবড়ে গিয়ে আঁচলটা পেছন থেকে টেনে ও 'ম্যাডাম' ব'লে উঠেছিলো। আঁচলটা গা থেকে খসে পড়ে। সবাই হেসে ফেলে। 'ব্রুট, বীস্ট,' বলে বেগে মেগে ম্যাডাম চলে যান। আঁচলটা তখনকার মতো খসে গেছিলো কিন্তু ওর চাকরিটা চলে গেলো।

ঐ ভাবে আঁচলটা টানা যে খুব অন্যায় তা সে জানতো। কিন্তু ঘাবড়ে গিয়ে কি যে করেছে তা ও নিজেই বুঝতে পারে নি। তাঁকে থামিয়ে তাঁর কাছে মিনতি চাইতে চেয়েছিল। কিন্তু ওর কপাল খারাপ বলেই ওর স্ত্রীও ওকে ধর্তব্যের মধ্যে আনে না।

এর পর কিছুদিন টিউশান করে চালালো। কিন্তু ও ভাবে বেশিদিন চললো না। পড়ানোতে কি যে ত্রুটি ছিলো, তা জানা যায় নি, কিন্তু একে একে সকলে ওর কাছে পড়তে যাওয়া বন্ধ করলো। অনেক জায়গায় চাকরিরও চেষ্টা করেছিলো কিন্তু তাও কিছু হ'লো না। যাও বা দু-একটা জুটলো টিকলো না বেশিদিন। নিজের আত্মসম্মান জলাঞ্জলি দিয়ে সিনেমার টিকিট বিক্রীও ধরলো, কিন্তু তাও বেশিদিন কপালে সইলো না। ঘরে ঘরে গিয়ে পাঁপড়, সাম্বার, পাউডারও বেচলো, কিন্তু কেউ তার কাছ থেকে কিনতে চাইলো না। কি করে বেচতে হয় তা তার জানা ছিলো না। শেষকালে উপায়ান্তর না দেখে ওর স্ত্রী পরের বাড়ীতে রান্নাবান্না করে ছেলে-মেয়েদের লালন-পালন করতে লাগলো। লোকে তখন বলেছিলো, 'ভিক্ষে করো কিংবা চুরি। কিন্তু ঘরের বউকে বাইরে পাঠিও না।' অনেক গ্রামে গিয়ে পয়সা চাইলো, কিন্তু চাইবার রকমসকম দেখে লোকে ওকে সন্দেহের চোখে দেখতে লাগলো। কোনো কোনো জায়গা থেকে খালি হাতেই ফিরতে হ'লো। এরপর চুরি করারও

চেষ্টা করলো। প্রথমে রেলওয়ে স্টেশন থেকে সুরু। চুরি কি ক'রে করে তা অবশ্য জানতো না। রেলের কম্পার্টমেণ্টে ঠেলাঠেলি ক'রে যখন লোকেরা ভীড় করে উঠতে থাকে সেইসময় একদিন সাহস ক'রে একজনের পাঞ্জাবীর পকেটে হাত ঢুকিয়ে দেয়। পাঞ্জাবীপরা ভদ্রলোক ওর হাত ধরে ফেলে আর সবাই মিলে ওকে পিটতে থাকে। সেখানে ওর পরিচিত এক মাস্টারমশাই উপস্থিত ছিলেন। তিনি সবাইকে বোঝান যে কোনো ভুল হয়ে থাকবে। ও এ ধরনের লোক নয়। তা না হলে সেদিন আর তাকে ফিরতে হ'তো না।

চল্লিশের ওপর বয়স। নিজের জীবনধারণের জন্যে ওর স্বভাব-বিরূদ্ধ অনেক খেলো কাজ করেছে। পরিবর্তে শুধু পেয়েছে লাঞ্ছনা ও অপমান।

আর কদিনই বা এইভাবে বেঁচে থাকবে। পরিবারই বা প্রতি-পালন করবে কি করে? একটা নিদারুণ অসহায় ভাব ওকে যেন ঘিরে ফেলেছে। গভীর অন্ধকারে হাঁতড়ে অতল জলের গভীরে যেন ক্রমশ তলিয়ে যাচ্ছে। দুর্বলতায় হাত পা শিথিল। দেওয়ালে ঠেসান দিয়ে বসে বসে চিন্তা করার শক্তিও যেন লোপ পেয়ে যাচ্ছে।

ঝিমিয়ে পড়েছিলো ; 'বাবা' ডাকে ঘুম ভেঙে গেল। চোখ মেলে দেখে বড় ছেলে। দশ বছর বয়েস। বলে, 'মা ডাকছে।'

'কেন?'

'খেতে।'

'কি খেতে?'

'সরু চাকলি।'

ভেণ্টটেশওয়ালু ছেলের পিছু পিছু চলতে থাকে। বাড়ীর দোর গোড়ায় স্ত্রী অপেক্ষা করছিলো, 'এসো, চারটে সরু চাকলি খেয়ে নাও।' সোল্লাসে বলে, 'সুরম্মার বাড়ীতে আজ মার পুজো ছিলো, আমরা সবাই সরু চাকলি খেয়েছি। কাল অবধি আর কোনো চিন্তার নেই। তোমার জন্যে একটা শাড়ীর মধ্যে লুকিয়ে এনেছি।' স্ত্রীর আনা সরু চাকলিগুলো খেতে খেতে ভাবে, 'আমার স্ত্রীর মনে এখনো মায়া-মমতা আছে, স্বামীর খাওয়াদাওয়ার এখনো চিন্তা করে!' তার প্রতি স্ত্রীর এই যে ভালোবাসা, তা ভেবে তার কণ্ঠ রোধ হয়ে যায়। খাবার খাচ্ছিল কোনোরকমে। কিন্তু কোনো স্বাদ পাচ্ছিল না। অনাহারে থেকে থেকে আস্বাদন করার শক্তিও যেন লোপ পেয়েছে। তবুও তাড়াতাড়ি খাওয়া শেষ করে জল গিললো। সন্ধ্যে হয়ে আসছে। বাড়ীর পেছনের দেউড়ীতে একটা চাটাই পেতে শুয়ে পড়ে। বাদাম গাছের ফাঁক দিয়ে দুটো তারা দেখা যাচ্ছে। পাশের বাড়ী থেকে গানের কলি ভেসে আসে। চারিদিকে ঘন আঁধার। গানের কলিগুলো ওর দেহে যেন বিঁধছে। হতাশায় বেহুঁশ হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলো।

একটু পরে স্ত্রীর ডাকাডাকিতে ঘুম ভেঙে গেল। উঠে বসে জিজ্ঞেস করলো, 'কি ব্যাপার?'

'নটা বাজে। জয়া আর ছোট মেয়েটা সন্ধ্যেবেলা কোথায় যেন গিয়েছিলো। এখনও ফেরে নি।'

'আচ্ছা, আমাকে এ সব কথা কেন বলছে?

'আচ্ছা বললেই হয়ে গেলো? জানি না ওদের কি হ'লো? বাইরের লোকের মতো শুধু আচ্ছা বললেই [illegible]বে?'

আবার গালিগালাজ সুরু হয়ে গেলো। জীবনভোর শুধু গালা-

গালি। কখনও যদি বা এক মুহূর্তের জন্যে একটু সোহাগের কথা শোনে পরমুহূর্তেই সুরু হয়ে যায় গালাগালি আর গঞ্জনা। স্ত্রীকে দোষই বা দেয় কি ক'রে? বাড়ীতে ছেলেপুলেরা উপোসী থাকলে মার বুক করাত দিয়ে যেন চিরতে থাকে; মার প্রাণ ব্যথায় বিহ্বল হয়ে পড়ে। গৃহস্বামীর অকর্মণ্যতা ও পাষাণহৃদয়ের ওপর মাথা খুঁড়ে মরে।

কাঁদতে কাঁদতে স্ত্রী ব'লে, 'সতেরোটা বছর কেটে গেছে, একটা দিনের জন্যেও ও মেয়েটা সুখের মুখ দেখলো না। পাড়াপড়শীদের বাড়ী গিয়ে 'আমাদের এটা নেই, সেটা নেই'— চেয়েচিন্তে আমাদের দেয়। বিয়েব বয়স হ'য়েছে অথচ বিয়ের উচ্চবাচ্যাও নেই; পেট ভরে খেতেও পায় না। ছোট ভাইবোনেদেব দেখে কষ্ট পায়। আমায় বলে, 'বাবা সাধাসিধে মানুষ, ওঁকে কিছু বো'লো না, উনিই বা কি করবেন?' ভাই বোনেদের জ্বরজারি হ'লো সে নিজেই কবিরাজের কাছে ছোটে। বাড়ীতে ও কোনোদিন সুখের মুখ দেখলো না। আমার শ্মশানের মতো এই সংসার দেখে কত কষ্ট পায়। তাই একটু বাইরে ঘুরে ফিরে আসে। আমিই বা কি করি? লোকের বাড়ীতে একটা রাঁধুনীব কাজও আমার জুটলো না।'

স্ত্রী ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো। ভেঙ্কটেশওয়ার্লুর মনে হোতে থাকে কে যেন একটা শানালো ছুরি অতি নিপুণভাবে পেটের মধ্যে চালিয়ে দিচ্ছে। ও মরে যেতে চায়। স্ত্রীকে সে কথাই এখন বলতে চায়। কিন্তু পরমুহূর্তেই ভাবে স্ত্রী যদি বলে, 'আপদ বিদায় হবে, ভালোই হবে।' তা হলে মরার সময়ও ও সুখ পাবে না।

আবার চাটাইয়ের ওপর শুয়ে পড়লো। দুটো মেয়েই বাড়ী

ফিরেছে। স্ত্রী কান্না থামিয়ে ঘরে চলে গেলো। অন্ধকারে বসে ভাবতে থাকে, ঠিক কথাই তো। জয়াটার বিয়ে দিয়ে দিতে পারলে, আর কিছু না হোক ও তো একটু আরামে থাকতে পারবে। কিন্তু ওকে বিয়ে করবে কে? বিয়ে হবেই বা কি ক'রে? জয়াকে খুব একটা সুন্দরী দেখতে না হ'লেও, বিশ্রী দেখতেও নয়। অতো দুঃখকষ্টের মধ্যে থেকেও ওর সারা দেহে যৌবনের লালিত্য। মাথাটা লম্বা বলে খুব সুন্দর দেখায়। কিন্তু গরীবের মেয়েকে কে বিয়ে করবে? তেজবরে, দোজবরেও আপত্তি নেই··· কিন্তু যে এক মুঠো চাল রোজ জোগাতে পাবে না সে কি ক'রে মেয়ের বর জোগাড় করবে। ওর জন্যে কারুর কোনো সম্মান বা মর্যাদা যদি থাকতো তা হলে কেউ এদিকে না হয় পা বাড়াতো, তা বুড়োই হোক না কেন···।

পাশ দিয়ে একটা ইঁদুর লাফিয়ে যায়। ও আবার শুয়ে পড়ে।

আজ দুদিন হ'লো ভেঙ্কটেশাওয়ালু ঘরে ফেরে নি। ইতিমধ্যে ওর ছোট ছেলে কঠিন অসুখে পড়েছে। সমানে বমি আর পায়খানা হচ্ছে··· ঘুরে ফিরে বাড়ী পৌঁছোনোর আগে অবধি ও এ খবর জানতো না। ছেলেটার হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে যাওয়ায় জয়া ওকে হাসপাতালে নিয়ে যায়। ঘরে স্ত্রী শুয়ে। বোধ হয় কাঁদছে। ভেঙ্কটেশওয়ালু এ সব নিয়ে মাথা ঘামায় না। বাড়ী পৌঁছেই স্ত্রীকে বলে, 'পেট জ্বলে যাচ্ছে. যদি চাল জোগাড় হয়ে থাকে তো কিছু খেতে দাও।'

কিছুদিন ধরে ও আর বাড়ীতে খেতে চায় না। কেউ খেতে

ডাকলে খেতে বসে। যদি না ডাকে, তবে ভাবে বাড়ীর আর কারুরই বোধহয় আজ খাওয়া জোটে নি, তাই তারও ডাক পড়ে নি। আজ না জানি তার কি হয়েছে, তার ছেলেকে নিয়ে যেখানে যমে মানুষে টানাটানি চলছে আর সেই দুশ্চিন্তায় যখন স্ত্রী কাতর তখন তার কাছে আজ কিনা গিয়ে বলছে, কিছু খেতে দেবে?

স্ত্রী একেবারে তেলেবেগুনে জ্বলে উঠলো। এলোচুল, চোখ দিয়ে যেন আগুন ঠিকরে বেরুচ্ছে। সেই বিকট রূপ নিয়ে সে চেঁচিয়ে ওঠে; 'পিশাচ, জন্তু কোথাকার।' বলে সে পাশে-রাখা ঘটিটা তুলে নিয়ে সজোরে ছুঁড়ে মারলো। ঘটিটা ওর গায়ে না লেগে সজোরে দরজায় গিয়ে পড়লো। স্তম্ভিত হয়ে গেলো। কি ঘটেছে বুঝে উঠতে পারলো না। মাটিতে লুটোপুটি খেতে খেতে স্ত্রী 'বাছা আমার' বলে কাঁদতে থাকে। কি মরে গেছে নাকি? ওর বুক কাঁপে। বাড়ীর সবাই যেন ওকে বলছে, 'তুমি খুনী,' পুলিশ এসে ওকে জবরদস্তি টেনে নিয়ে যাচ্ছে। ও তাড়াতাড়ি বাড়ী থেকে বেরিয়ে আসে।

ওর সবকিছু থেকে, সবায়ের কাছ থেকে দূরে চলে যেতে চায়। সারারাত রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে, এখানে ওখানে একটু বসে রাত কাটিয়ে দেয়। মনে মনে ভাবে কোথায় পালাবো, কার কাছ থেকে পালাবো। হঠাৎ নিজের প্রশ্নের জবাব নিজেই খুঁজে পায়— নিজের কাছ থেকে, নিজের জীবনের কাছ থেকে। আর কোনো পথ নেই। মৃত্যুই একমাত্র পথ। মরলেই নিশ্চিন্ত হতে পারবে, মৃত্যুই ওর সব দুঃখ মেটাতে পারবে। ধর্মশালার উঠোনে ও শুয়ে পড়লো। কি করে মরবে, কবে মরবে, সব ঠিক ক'রে ফেলে। আর বাঁচতে পারবে না। পরিবারও বাঁচবে না। বাঁচবার আর কোনো

পথ নেই। আগেও প্রমাণ পেয়েছে ও কিছু করতে পারবে না। অকর্মণ্য হ'য়ে বেঁচে থাকায় কারুর কোনো লাভ নেই। আসছে কাল রেলগাড়ীর নীচে মাথা দেওয়া ছাড়া কোনো উপায় নেই। মরার কথা চিন্তা করতে করতে বেহুঁশ হ'য়ে পড়ে।

রোদ গায়ে লেগে ভেঙ্কটেশওয়ার্লুর ঘুম ভেঙে গেলো। ভিখারীরা সব চলে গেছে। তাদের মাটির পাত্রগুলো রোদে চক্‌চক্ করছে। ভেঙ্কটেশওয়ার্লু একবার শুধু ওর ছেলেমেয়ে আর স্ত্রীকে দেখতে চায়। নিজের পাড়ার কাছে পৌঁছে যায়। কিন্তু আর এগোবার সাহস হয় না। স্ত্রী যদি ভেতরে ঢুকতে না দেয়। তবে এই মায়া কেন? সুমুখ দিয়ে পাড়ার একটা ছেলে যাচ্ছিলো। তাকে ডেকে জিজ্ঞেস করে, 'শোনো বাবা, আমার ছোট ছেলে অসুস্থ ছিল তুমি কি জানো ও বেঁচে আছে না মারা গেছে?' 'গতকাল বিকেলে হাসপাতাল থেকে বাড়ী ফিরেছে।' বলে ছেলেটি চলে যায়।

'যাক্,' বলে ও উল্টোমুখো হাঁটতে সুরু করলো। ধর্মশালার আঙিনায় এসে পৌঁছোল। ছোটবেলার কথা সব মনে পড়ে। একটু চোট লাগলে মা অতি স্নেহের সঙ্গে ওর দেখাশোনা করতো। এখন আর কেই বা দেখে। 'বাবা ভেঙ্কু! তোর মুখটা শুকিয়ে গেছে কেন? কি হয়েছে? এই নে, একটু দুধ খেয়ে নে।' এখন আর এ সব কথা জিজ্ঞেস করবে কে? ওর বুক ফেটে কান্না বেরোয়। মরবার জন্যে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ভেঙ্কটেশওয়ার্লুর নিজের ওপরই করুণা হয়। অনেকক্ষণ ধরে কাঁদতে থাকে। ধর্মশালার মুনিব যাবার সময় ওকে দুটো কলা খেতে দেয়। কলা খেয়ে একটু জল খেয়ে নেয়। দেওয়ালে ঠেসান দিয়ে বসে থাকে।

সন্ধ্যে ঘনিয়ে এলো। ওর আবার ভয় করছে, ভাবছে মরণ ছাড়া অন্য কোনো পথ নেই। এই প্রতিজ্ঞার নড়চড় হবার উপায় নেই। কি যেন একটা মায়া, একটু ব্যথা ওকে বাধা দিচ্ছে। চোখমুখ বুজে বসে থাকে। ছোটবেলার কথা, স্ত্রী-পুত্র-পরিবার, স্কুল, মেমসাহেব··· সব কথা মনের কোণে ভিড় করে ছবির রিলের মতো ঘুরতে থাকে। রাস্তা দিয়ে লোকেরা একটা মড়া নিয়ে যাচ্ছে। এই দৃশ্য দেখতে পায়। মুখ ঘুরিয়ে নেয়। আবার খিদে পায়।

খিদের জ্বালায় আর দুর্বলতায় শরীরটা কুঁকড়ে যেতে থাকে। আবার জোর করে মনের বল ফিরিয়ে আনে। দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়, মরাই ওর পক্ষে সবচেয়ে ভালো।

অন্ধকার নেমে আসতেই সে দাঁড়িয়ে পড়ে। রেলগাড়ীর তলায় কাটা পড়তে মাত্তর আর এক ঘণ্টা বাকী। ও তাড়াতাড়ি এগোতে থাকে। সাঁকো পেরিয়ে, খেতের মাঝ দিয়ে এগিয়ে যায়। ওদিকে রেললাইনের কাছে লোকেদের আনাগোনা একটু কম। জায়গাটা স্টেশন থেকে মাইলখানেক দূরে। দুদিকে সারি সারি গাছ। রেললাইনটা ওখান থেকে বেঁকে গেছে। ওখানে লাইনে মাথা দিলে রেল আসছে কি না আসছে বোঝা যায় না। হঠাৎ রেলগাড়ীটা ওর ওপর দিয়ে চলে যাবে, ও বুঝতেও পারবে না। মন খুব শক্ত করে ভেঙ্কটেশওয়ার্লু খেতের মধ্য দিয়ে এগিয়ে গেলো।

লাল সিঁদুরে মেঘগুলো কালোবরণ হয়ে যাচ্ছে। দাঁড়িয়ে আছে ঝাঁকড়া মাথা বাব্‌লা গাছগুলো। হাওয়া যেন কেঁদে কেঁদে ফিরছে চারিদিকে। ঝিঁ ঝিঁ আর পাখীর কলকাকলি— সবাই যেন ওকে বলছে, 'মরে যা, মরে যা।' ওর মনে হয় বিশ্বপ্রকৃতি যেন ওকে মৃত্যুর জন্যে আহ্বান জানাচ্ছে, সবাই বলছে, 'মরে যা, মরে যা।'

'ওহে ভেঙ্কটেশওয়ালূ', তোমাকেই ডাকছি, একটু দাঁড়াও।' পেছন থেকে কে যেন ডাকে।

পেছন ফিরে দেখে সূর্যনারায়ণ সাইকেলে করে যাচ্ছে, ভেঙ্কটেশওয়ালূ দাঁড়িয়ে পড়ে। ও জানে, স্কুলের ছুটি হলে সূর্য-নারায়ণ ঐ পথ দিয়ে রোজই শ্বশুরবাড়ী যায়।

'এদিকে কোথায় চললে ভেঙ্কটেশওয়ালূ?' সূর্যনারায়ণ প্রশ্ন করে। ভেঙ্কটেশওয়ালূ কোনো জবাব দেয় না। সূর্যনারায়ণ ঐ প্রাইমারী স্কুলে পড়ায় যেখানে ভেঙ্কটেশওয়ালূ আগে পড়াতো।

'তোমার কি কোনো বুদ্ধিসুদ্ধি আছে? তুমি কি একটা মানুষ?' সূর্যনারায়ণ প্রশ্ন করে।

অবাক হয়ে ও সূর্যনারায়ণের মুখের দিকে তাকায। সূর্যনারায়ণের ওপর ঠিক রাগ হয় নি। আসলে তার কথা ও বুঝতে পারছে না।

'নিজের জাতেব আব নিজের সম্ভ্রমের কোনো তোয়াক্কাই তুমি কবো না। তোমার জন্যে তোমাদের ইজ্জতও যেতে বসেছে। মাথা উঁচু করে আর আমাদের চলার উপায় রাখলে না। লজ্জা হওয়া উচিত। নিজের মেয়েকে রাস্তায় ছেড়ে দিয়েছো। ক্ষ্যাপা কুকুরের মতো বাড়ী বাড়ী ঘুরে বেড়াচ্ছে। আজ সূর্য-লজ থেকে ওকে বেরুতে দেখে আমি আশ্চর্য হয়ে যাই। ঐ যে ব্রোকার ভেঙ্কটাইয়া? ওকে জিজ্ঞেস করলাম, বললে পনোরো টাকায় এজেণ্টের সঙ্গে ঠিক হয়ে গেছে। আমার নাক কাটা গেলো। আমার মেয়ে হলে ওখানেই টুকরো টুকরো করে কেটে ফেলে রাখতাম। এতো বয়েস হ'লো, এখনও বাড়ীর মেয়েছেলেদের যদি সামলে না রাখতে পারো, তা হলে মরাই ভালো! তুমি এখনো বেঁচে আছো কি ক'রে, মরো নি কেন? তোমার জায়গায় যদি আমি

হতাম তো এতোদিনে রেলগাড়ীর নীচে মাথা রেখে মরে যেতাম। ছি, ছি, লজ্জা করে না! এইভাবে বেঁচে থাকার কোনো মানে হয়।' বলেই সূর্যনারায়ণ 'থু' 'থু' করে থুথু ফেলে সাইকেলে চড়ে চলে গেলো।

ভেঙ্কটেশওয়াল্ু হতবাক। পাগলের মতো পাঁচ মিনিট সূর্যনারায়ণের চলার পথের দিকে তাকিয়ে থাকে। আস্তে আস্তে, তার সারা দেহমনে আনন্দের তরঙ্গ বয়ে যায়। খেতের মাঝখানে নির্জনে সে হঠাৎ হেসে ওঠে। ভাবে, ওর মরার আর কোনো দরকার নেই। সমুদ্রে ডুবে যাবার সময় কোনো নৌকো দেখতে পেলে ডুবন্ত লোকের যেমন মনে হয় ভেঙ্কটেশওয়াল্ুর মনের অবস্থা সেইরকম। পাগলের মতো মনে মনে খুশী হয়। মনে হচ্ছে ও যদি কারুর গলা জড়িয়ে তার নিজের সৌভাগ্যের কথা শোনাতে পারতো! এতোদিন পরে একটা পথ খুঁজে পেয়েছে, বেঁচে থাকার সম্বল। ওর আর মরবার দরকার নেই।

আনন্দে বিহ্বল ভেঙ্কটেশওয়াল্ু বাড়ীমুখো হয়। আর সে দুর্বল নয়। অন্ধকারে খেতের পথ ধরে বাড়ীতে ফিরে চলে। পথে কারুর সঙ্গে দেখা হ'লো না। ঘরে ঢুকে দেখে স্ত্রী আর ছেলেমেয়ে ঘুমোচ্ছে। দেখে, এদের মনে ওর জন্যে কোনো চিন্তাই নেই। এরা কি ওকে আর ওর অস্তিত্ব ভুলে গেছে। রাগ হয়। পেছনের বারান্দায় গিয়ে বসে পড়ে। বাদাম গাছের ডালগুলোয় অন্ধকার নেমে এসেছে। ডালগুলোর ফাঁক দিয়ে দুটো তারা দেখা যায়।

'বাবা, এসো, খেয়ে নাও।' আওয়াজ শুনে ভেঙ্কটেশওয়াল্ু মুখ তুলে তাকায়। তার বারো বছরের ছোট মেয়ে দাঁড়িয়ে। ও উঠে মেয়ের পিছু পিছু রান্নাঘরে যায়। থালায় ভাত বাড়া— তরকারী,

চাটনি আর রসম। আর, কি সুস্বাদু খাবার, পেট ভরে আরাম ক'রে খেয়ে ভেঙ্কটেশওয়ালূ´ ঢেঁকুর তোলে।

মাটিতে শুয়েছিলো ভেঙ্কটেশওয়ালূ´। মাঝ রাতে হঠাৎ তার ঘুম ভেঙে যায়। একটা অদ্ভুত সুখ ও শান্তি অনুভব করে। ও সবাইকে ঘুম থেকে তুলে সবাইয়ের সঙ্গে কথা বলতে চায়। ছোটবেলায় শেখা জয়দেবের গান গাইতে চায়। হঠাৎ মনে হয় ও যেন কিছু ভুল করেছে। এই সুখশান্তির যে কারণ সেই বড় মেয়েকে সে এখনও অভিনন্দন জানায় নি। ওর কাছে গিয়ে বলা উচিত ছিলো, 'মা, আমি তোমার ওপর খুব খুশী।'

ও কি করে ওর প্রতি এতো অকৃতজ্ঞ হবে? উঠে ঘরের মধ্যে গিয়ে দেখে জয়া ঘরে নেই। চারিদিকে দেখলো কিন্তু জয়া নেই, পেছনের খিড়কীর দরজা খুলে দেখলো জয়া বাদাম গাছের তলায় বসে আছে, চতুর্দিকে চাঁদের আলো। সেই আলতো আলোয় তার চেহারা আবছা দেখা যাচ্ছে, হাঁটুর মধ্যে মুখ লুকিয়ে বসে আছে। ভেঙ্কটেশওয়ালূ´ মেয়ের দিকে দু'পা এগিয়ে গেলো। হঠাৎ ওর কানে মেয়ের কান্নার আওয়াজ এলো। কিছুই বুঝতে পারছে না। মিনিট খানেক ওর দিকে তাকিয়ে থেকে আস্তে আস্তে পা ফেলে ফিরে এসে মেঝেতে শুয়ে পড়ে—'এখন থাক, অন্য কোনো সময় কৃতজ্ঞতা জানানো যাবে।'

এই কথা মনে মনে ঠিক করে ভেঙ্কটেশওয়ালূ´ ঘুমিয়ে পড়ে।

বেহালা

রাজ্যম বেহুঁশ হয়ে পড়ে আছে। একেবারে অজ্ঞান। ভয়ে ভেঙ্কটাপয়য়া প্রায় আধ-মরা। বৌয়ের খুব কাছে গিয়ে ভালো ক'রে দেখতে থাকে।

দেখে রাজ্যমের ঠোঁট দুটো নড়ছে; যেন কিছু বলছে। বোঝা গেল না।

'রাজ্যম!' ঘাবড়ে গিয়ে ভেঙ্কটাপয়য়া ডাকতে থাকে। কিন্তু কোনো সাড়া মেলে না। রাজ্যম যেন এ দুনিয়ায় নেই। মন-মাতানো তোড়ী রাগিণীকে নিজের সঙ্গী করে সে যেন আকাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

উঠোনে বাচ্চারা চেঁচামেঁচি করছিলো।

'এই সবকটাতে মিলে হৈ হৈ লাগিয়েছিস কেন?' ভেঙ্কটাপয়য়া বাচ্চাদের এক ধমক দেয়। নাগালের মধ্যে হ'লে হয়তো এক-আধটা চড়-চাপড়ও মেরে দিতো।

'বাপরে, বাচ্চাদের ওপর এমন ক'রে খিঁচিয়ে ওঠো কেন, আমি তোমার কাণ্ড দেখে অবাক হয়ে যাই।' রাজ্যমের জ্ঞান ফিরে আসে। স্বামীকে ভেঙ্‌চিয়ে তিরস্কার করে।

'আগে বলো, তোমার শরীর কেমন?' উৎকণ্ঠা নিয়ে ভেঙ্কটাপয়য়া প্রশ্ন করে।

'আগে বলো, বাচ্চাদের তুমি কেন বকলে?'

'বকেছি তো কি হয়েছে ? তোমার শরীর কেমন তাই আগে বলো।

'শরীর ঠিকই আছে। আমার হয়েছিলোটা কি ?'

'তোমায় কতবার তো ডাকলাম, কোনো সাড়াই তো পেলাম না।

'ডেকেছিলে ?'

'ডাকি নি তো কি ?'

'আচ্ছা।' বলে রাজ্যম হেসে ফেলে। হাসি দেখে ভেঙ্কটাপয়য়ার ভয় করে। উঁচু দাঁত তার ওপর প্যাঁচার চোখের মতো চোখদুটো ঠেলে বেরিয়ে এসেছে। সব মিশিয়ে তাকে বীভৎস দেখায়।

'আমি খানিকক্ষণ বোধহয় অজ্ঞান হয়ে গেছিলাম।' রাজ্যম আবার হাসে।

'ও তাই বলো।' ভেঙ্কটাপয়য়া একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে। রাজ্যম টাইফয়েডে অনেকদিন ভুগে সবে একটু হেঁটে বেড়াচ্ছে। এক হপ্তাও হয় নি পথ্য পেয়েছে। ভেঙ্কটাপয়য়া তাই সব সময় ভয়ে সিঁটিয়ে আছে। তিন হপ্তা পরে জ্বরটা ছাড়ে ; তারপর আবার জ্বর আসে। আরো তিন হপ্তা নানারকম খেল দেখিয়ে জ্বর ছেড়েছে। হাসপাতাল থেকে বাড়ী এলে পথ্যি দেবার পরও ভেঙ্কটাপয়য়ার শঙ্কা কাটে নি।

'এখন আমার শরীর একেবারে ঠিক হয়ে গেছে। যা খাই তাই হজম করতে পারি। রাতে ঘুম বেশ ভালো হয়। কিন্তু এতোদিন বিছানায় শুয়ে ছিলাম বলে একদিনে কি করে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠি বলো।' রাজ্যম বলে।

রাজ্যমকে যে দেখে সেই ভাবে ও এখনও বেঁচে আছে কি করে। গায়ে মাংস ব'লে কিছুই নেই, সব যেন শুকিয়ে গেছে, হাড়ক'খানার ওপর শুধু চামড়াটা লেগে।

'তোমার জ্ঞান ছিলো না, আমি ঘাবড়ে গিয়েছিলাম।' নিজের বৌকে শুয়ে থাকতে দেখলে ভেঙ্কটাপয়য়ায় সন্দেহ হয় সে বেঁচে আছে কিনা। নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের সঙ্গে পেট আর বুকের ওঠানামা লক্ষ্য ক'রে তবে সে আশ্বস্ত হয়। আর এটাই এখন ভেঙ্কটাপয়য়ার অভ্যেসে দাঁড়িয়ে গেছে।

'একটু যা ক্লান্তি লাগছিলো, এখন শরীর বেশ ভালোই আছে। এ বাড়ীতে আসার পর থেকে তো বেশ আরামেই আছি।' রাজ্যম বলে।

'এ বাড়ীতে আসার পর থেকে আমিও বেশ আরামে আছি। মনটাও আনন্দে আছে। বাড়ীটার ভাড়াটা যা একটু বেশি।'

'আমিও তাই ভাবি, ভাড়াটাই যা একটু বেশি।'

'যখন প্রাণটাই যেতে বসেছে তখন ভাড়াটা আর এমন কি। এ নিয়ে কিন্তু তুমি মোটেই চিন্তা করবে না।'

এর আগে ওরা সরু এঁদো একটা গলিতে আদ্দিকালে তৈরী ঘুটঘুটে অন্ধকার বাড়ীর একটা ঘরে থাকতো। ঐ বাড়ীতে যতদিন ছিলো, ততদিন সারাবছর কেউ না কেউ বিছানায় পড়ে থাকতো। শেষ বেশ রাজ্যমের প্রাণ নিয়ে টানাটানি। বাড়ীতে দ্বিতীয় আর কোনো লোক ছিলো না। স্ত্রী যখন হাসপাতালে গেলো, তখন বেচারা ভেঙ্কটাপয়য়াকে একেবারে নাজেহাল হ'তে হয়েছে। স্বামীপুত্তুরের কপালের জোরে সে আবার ভালো হ'য়ে ঘরে ফিরে এসেছে। নতুন যে সব বাড়ী হালফিল তৈরী হয়েছে তারই দুটো ঘর আর একফালি বারান্দা ভাড়া নিয়েছে। বাড়ীগুলোর আশপাশ বেশ ফাঁকা, সবকটা বাড়ীতেই বাগান।

'মিছিমিছি আমরা পয়সা নিযে মাথা ঘামাচ্ছি। তুমি যে প্রাণে

বেঁচেছো, এটাই আমার সবচেয়ে বড় লাভ।' ভেঙ্কটাপয়য়া বলে।

'এ কথা বোলো না। আমার অসুখে কত পয়সা খরচ হয়ে গেলো, বলো তো? এতো পয়সা কি ভাবে জোগাড় করেছো তা কিন্তু আজও আমায় বলো নি। এ কথা মনে হলেই ভাবনা হয়।'

'আমি তো তোমায় কতবার বলেছি, এ সব কথা নিয়ে তুমি এখন একেবারেই মাথা ঘামাবে না। সবার আগে নিজের শরীরের দিকে নজর রাখো। কোনো বিষয়ে কিপটেমি করবে না। যখনই মনে হবে ওভালটিন খেয়ে নেবে। ফলটল যা আনি সব খাবে। বাচ্চাদের দেবার কোনো দরকার নেই।'

'খাচ্ছি না তো কি করছি? হাত-পা ছড়িয়ে বসে তোমায় খাটাচ্ছি, তোমার রাঁধা ভাত খাচ্ছি। যাই বলো, এটাও এক-রকমের ঋণ। আমাদের তো আর কোনো বাড়তি আয় নেই।'

'এ সব কথা তুমি মন থেকে একেবারে ঝেড়ে ফেলো।'

পয়সার কথা উঠলেই ভেঙ্কটাপয়য়া ঘাবড়ে যায়। দু'মাসের মাইনে ছাড়া আরো একশো টাকা খরচ হয়ে গেছে। ডাক্তার স্বয়ং যেন ভগবান। একটা পয়সাও নেয় নি। তা সত্ত্বেও ওষুধবিষুধে বেশ কিছু পয়সা খরচ হয়েছে। দাতব্য চিকিৎসালয়ে চিকিৎসা করিয়েও অনেক টাকা বেরিয়ে গেছে।

'ঠিক আছে। আমি এ নিয়ে আর মাথা ঘামাবো না। হিসেব করতে আর কতক্ষণ, আস্তে আস্তে সব শোধ করে দেওয়া যাবেখন। ও তো আমারই হাতে।'

'সে এখন থাক, পরে দেখা যাবে।' ব'লে ভেঙ্কটাপয়য়া উঠে বাড়ীর পেছন দিকে চলে যায়। এই সব কথা নিয়ে বেশি আলাপ-

আলোচনা তার ভালো লাগে না। মুখ-হাত-পা ধুয়ে কাপড়-জামা পরে চুল আঁচড়ে সে বেরোবার জন্যে তৈরী হয়।

রাজ্যম আবার জ্ঞান হারায়। যেন একটা অন্ধকার ঘরে ঢুকে পড়েছে। গোধূলির আলো জানলা দিয়ে তার মুখে এসে পড়েছে। একটা সোনালি শোভা চারিদিকে।

রাজ্যমের মুখের দিকে চেয়ে ভেঙ্কটাপয়য়া ঐখানেই দাঁড়িয়ে থাকে। এ সবে সে কিন্তু ভয় পায় না। ভাবে, ছোটবেলার কোনো সুখের কথা মনে করে সে বিভোর হয়ে আছে। ওর সারা চেহারার মধ্যে একটা প্রসন্নতার ছাপ।

অনেকদিন পর ভেঙ্কটাপয়য়া রাজ্যমকে এতো প্রসন্ন দেখলো। প্রথম যখন শ্বশুরবাড়ী আসে তখন সারাক্ষণ আনন্দে আর খুশীতে তন্ময় হয়ে থাকতো। এক বছরের মধ্যেই রাজ্যম মা হ'লো। এই প্রথম সত্যিকারের সংসারে সে প্রবেশ করলো আর এই সংসারধর্ম ঠিকমত পালন করতে সে তৎপর হয়ে ওঠে। গত ছবছরে সে তিনটি ছেলেমেয়ের মা হয়ে সংসার চালাচ্ছে।

হঠাৎ রাজ্যমের ঠোঁট দুটো খুলে যায়। মাথা নেড়ে নেড়ে সে কিছু বলে। ওর মুখভঙ্গী দেখে ভেঙ্কটাপয়য়ার হাসি পায়। হাসতে গিয়ে বিষম খায়। তার ধকল সামলাতে বেশ কিছুক্ষণ সময় লাগে। ওর হাসির শব্দ শুনে রাজ্যমের সম্বিত ফিরে এলো।

'এতো জোরে কেন হাসছো?' রাজ্যম প্রশ্ন করে।

'আর একবার ঐ রকম মুখভঙ্গী করে মাথাটা নাড়াও, দেখবে কেমন মজা লাগে আমার।' ভেঙ্কটাপয়য়া জবাব দেয়।

'আচ্ছা, এই কথা। সামনের বাড়ীর মেয়েটা গান গাইছে। একটু শোনো।' রাজ্যমের কথা শুনে ভেঙ্কটাপয়য়ার খেয়াল হ'লো

সত্যিই সামনের বাড়ীতে কেউ গান করছে। কানে একটা সুর ভেসে আসে, এতোক্ষণ সে খেয়ালই করে নি।

'আচ্ছা, এখানে গানের আসর বসেছে, তাই না। এবার মনে পড়েছে ছোটবেলায় তুমি খুব ভালো বেহালা বাজাতে। কথাটা একেবারেই ভুলে গেছিলাম।'

কামবর্দ্ধনী রাগিণী কেঁপে কেঁপে ফুলের গন্ধের সঙ্গে মিলেমিশে ঘরময় ছড়িয়ে পড়েছে।

'আরে, এখানে গানের আসর বসেছে, শুনে যা।' ভেঙ্কটাপয়য়া হাঁক দিয়ে ছেলেদের ডাক দেয়। তার দুই ছেলে রাস্তায় দাঁড়িয়ে তন্ময় হয়ে গান শুনছিলো।

'ভেবেছিলাম এই বাড়ীতে বেশ আরামেই থাকা যাবে। কিন্তু দেখছি এই আধ শিশির হাত থেকে রেহাই পাওয়া যাবে না।' ভেঙ্কটাপয়য়া বলে।

'সঙ্গে একটু সোঁঠ রাখো।' রাজ্যম বলে। রাজ্যম মনে আঘাত পায়। ওর মনে হয় যেন ওর গায়ে সোঁঠের মলম মেখেছে, সারা গায় জ্বলছে।

'সন্ধ্যে হয়ে এলো, আবার বাইরে যাচ্ছো কেন? তাড়াতাড়ি খাওয়া দাওয়া সেরে নাও না?' রাজ্যম বলে।

'রোজই ভাবি, কিন্তু দেরী হয়ে যায়। পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে একটা কোনো ভালো কাজ করতে হবে।'

'কি পাপ করা হচ্ছে।'

'পাপ কাজ ছাড়া জীবনযাত্রা চালানো সম্ভব না।'

দুই ছেলে খুব মন দিয়ে গান শুনছিলো। বোধহয় ওদের সুরটা ভালোই লাগছিলো। শিশুদের মন সরল, তাই গান বোধহয়

সহজেই তাদের মন আকৃষ্ট করে। ছোটবেলা থেকেই যদি রাগ আর তালের একটা জ্ঞান জন্মায় তা হলে সঙ্গীত সারাজীবনের আনন্দের একটা উৎস হয়ে ওঠে।

'বারে বা বা! তোরাও তো দেখছি মায়েরই বেটা। সা-রে-গা-মা-র ছোঁয়া তোদের লেগেছে দেখছি।' বলতে বলতে ভেঙ্কটাপয়য়া বাইরে চলে গেলো।

রাজ্যম আস্তে আস্তে উঠে আলোটা জ্বালায়। মুক্তোর মতো ঘরের মাঝখানে ঝোলানো টিউব লাইটটা জ্বলে ওঠে। নতুন দুখানা ঘরে টিউবের আলো যত ঝক্‌মক্ করে ততো ঐ চারখানা ঘরওয়ালা পুরোনো বাড়ীতে করতো না। পুরোনো নোনালাগা দেওয়ালে বালব দুদিন জ্বলে যেমন নিভে যায় তেমনি রাজ্যমের গানও দুদিন পরে শেষ হয় যায়। বেহালা ঘরের এক কোণে আর ছড়টা পুরোনো রদ্দির সঙ্গে পড়ে আছে। এইভাবে সংগীত তার জীবন থেকে ধুয়ে মুছে উধাও হয়ে গেছে। তবুও সামনের বাড়ীর মেয়েটা যখন গান ধরে তখন রাজ্যম পুরোনো দিনের সুখ অনুভব করে।

রাজ্যমের জীবন নিত্যকার ধরাবাঁধা নিয়মে চলতে থাকে। কোথাও কোনো অব্যবস্থা নেই।

ছবছর আগে পাত্রপক্ষ রাজ্যমকে দেখতে আসে। ভেঙ্কটাপয়য়াও সঙ্গে ছিলো। সবাই পাত্রীকে গান করার জন্যে পীড়াপীড়ি করে। রাজ্যমের বাবা রাজ্যমকে চারবছর ধ'রে গান-বাজনা শেখাচ্ছেন। গানবাজনায় নিজের দক্ষতা দেখাবার সে এই প্রথম সুযোগ পায়। মনে সংকোচ নিয়ে গান ধরে, রাগ তোড়ী। সুরুতেই বেসুরো, তালেও ভুল। রাজ্যম ঘাবড়ে যায়। গানটা তেমন জমে না। গান শেষ হ'লে রাজ্যমের কান্না পায়।

কিন্তু যাঁরা মেয়ে দেখতে এসেছেন তাঁরা গানের তারিফ করেন। বেচারা বুঝবে কি করে যে যারা মেয়ে দেখতে আসে তারা গানের ধার ধারে না, গানের সুর ও ত্রুটিবিচ্যুতি ধরার মতো ক্ষমতাও রাখে না।

ওঁদের মধ্যে একজন বললেন, 'আপনাদের জামাইকে আর চাকরি করতে হবে না।' ওদের এই ধরনের কথাবার্তা শুনে রাজ্যমের হাসি পায়।

ভেঙ্কটাপয়য়া সম্পূর্ণ নিজের মতে রাজ্যমকে বিয়ে করেছে। নামটা ভেঙ্কটাপয়য়া, সে যা তা লোক নয়। বিয়ের পর রাজ্যম নিজের সৌভাগ্য দেখে খুব খুশী হয়। বিয়ের সময়, ভেঙ্কটাপয়য়া অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ভালো গ্র্যাজুয়েট। মাদ্রাজ সরকারের ৭২৲ টাকা মাইনের একজন বড় লোয়ার ডিভিশন কেরানী।

বিয়ের পর রাজ্যম গাঁয়ের পরিচিত পরিজনের বাড়ী যেতো। সবাই তাকে গান গাইতে অনুরোধ করতো। বাড়ীতে তার স্বামী কিন্তু কোনোদিনও গান গাইতে বলে নি, সেও কোনোদিন নিজে থেকে স্বামীকে গান শোনায় নি।

নির্লজ্জের মতো শ্বশুরবাড়ীতে গান করার আগেই রাজ্যম সন্তান-সম্ভবা হয়ে পড়ে আর তার জন্যে তাকে বাপের বাড়ী চলে যেতে হয়। এইভাবে তার নারীজন্ম সার্থক।

বারান্দায় বাচ্চারা সব জড়ো হয়ে চেঁচামেঁচি করছিলো। 'কেন সব ঝগড়া-ঝাঁটি করছো, এখানে এসে বোসো' বলতেই দুই ছেলে মার কাছে এছে বসলো। ওদের মধ্যে একজনের বয়স পাঁচ আর অন্যজনের চার।

'ছোট খোকা ঘুমোচ্ছে, না?' রাজ্যম জিজ্ঞেস করে।

'নাক ডাকাচ্ছে।' বড় ছেলে জবাব দেয়।

'তোমরা চেঁচামেচি করলে ও উঠে পড়বে না?'

মার কথা শুনে বড় ছেলে একটু হাসলো। নিজেদের দোষ বুঝতে পেরে একে অপরের দিকে তাকায়।

'সামনের বাড়ীর মেয়েটি মিঠে গলায় গান গাইছে। বসে শোনো।'

মার কথা শুনে ভালো ছেলের মতো দুজনে গান শুনতে লাগলো। বাচ্চাদের দেখাশোনা করা, মিষ্টি কথায় ভুলিয়ে ঠিক পথে নিয়ে যাওয়া, ধোঁয়া না খেয়ে উনুন ধরানো— এ সবই রাজ্যম অনায়াসে শিখে গেছে।

সামনের বাড়ীর মেয়েটা তান ধরেছে। ওর গলার তান ঝরনার মত ঝর ঝর শব্দে বইতে বইতে মাঝে মাঝে জলপ্রপাতের ধারার মত উদ্বেলিত মুখর হয়ে উঠছে। ও তারস্বরে গলা ছেড়ে গান্ধারে স্থির হয়ে তান সাধতে লাগলো।

রাজ্যম দেহে যেন হাতীর বল ফিরে পায়। নিত্যকার জীবনে স্বাস্থ্য ও আনন্দের জন্যে সংগীত একান্ত প্রয়োজনীয়। নিজে গাইতে না জানলেও গান শুনে রসাস্বাদন করলেও তাতে লাভ।

সরবতে পিঁপড়ে পড়ার মতো মেয়েটি সংগীতের যে রস আস্বাদন করছিলো, তাতে বাধ সাধতে তার ছোট ভাইটি সেখানে এসে হাজির হ'লো।

'গিম পদনি···সরি সনি পদনী···' ব'লে সে বেসুরো গাইতে আরম্ভ করলো। মেয়েটি তিতিবিরক্ত হয়ে গান বন্ধ করে দিলো।

'এই নীলায়েক, যখন গান শিখতে ডাকি তখন তো আসিস না। গোলমাল করতে তো সবচেয়ে আগে আসিস।'

'কেন, আমার তান কি ঠিক হচ্ছে না?'

'বাবাকে আগে আসতে দে, সব বলে দেবো।'

'দানি পানি সরি সনি দনি পদনি…' ছেলেটি আর একটি তান ধরে। বেসুরো, বেতালা, কোনোরকমে সে গেয়ে চলেছে।

এখন যে আবহাওয়ার সৃষ্টি হয়েছে তাকে যদি গান বলতে হয় তা হলে একটা ফাটা বাঁশও গান গাইতে পারে। সেটা কিছু আশ্চর্যের ব্যাপার নয়।

'বাবাকে আসতে দে পাজী।' বলে মেয়েটি গান গাওয়া বন্ধ করে দিলো। রাজ্যমের ভীষণ রাগ হয়। মেয়েটি যে গানটা গাইছিলো তার রাগ ও সুর রাজ্যমের খুব ভালো জানা ছিলো।

'বেশ ভালো গাইছিলো। এখন আর কে গান করবে?' রাজ্যম বলে।

'ও আর কেন গান গাইছে না?' বড় ছেলে জিজ্ঞেস করে।

'দেখতে পাচ্ছো না তোমাদের মতো দুষ্টু ছেলে এসে গোলমাল করায় ও রেগে গান বন্ধ করে দিয়েছে?'

'ও কি ক'রে গাইছে?'

'গান শিখে গাইছে।'

'তুমি গাইবে?'

'খুব গাইবো। তোমাকেও শিখিয়ে দেবো।'

'ধ্যেৎ, পুরুষরা গায় না।'

'পুরুষরাও গায় বাবা। তোমাকেও শিখিয়ে দেবো।'

'তা হলে শেখাও।'

'পরে শেখাবো,' বলে রাজ্যম পা মেলে ঘরে শুয়ে পড়ে।

'একটু পা টিপে দে তো।'

বড়ছেলে মার পা টিপতে থাকে।

'তোমার হাত টিপে দেবো মা?' বলে ছোট ছেলে হাত টিপতে সুরু করে।

রাজ্যম শুয়ে শুয়েই কল্যাণ রাগের একটা গান গাইতে থাকে। গানের অনেক কিছুই রাজ্যম ভুলে গেছে। অস্তরা-বিস্তার সব তালগোল পাকিয়ে গেছে।

'ও মেয়েটি তোমার চেয়ে ভালো গায় মা।' বড় ছেলে বলে।

'আমি তো সব ভুলে গেছি বাবা।'

পাশের ঘরে ঢাকনা পড়ার শব্দ হয়। সারা ঘরটা যেন কেঁপে ওঠে।

'বোধ হয় কুকুর এসেছে, যা তাড়িয়ে দে। ঘরে ভাতের কাঁসিটা আছে।' মার কথা শুনে তুই ছেলে ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

'কুকুর নয়, বেড়াল। ভাতের ওপরের ঢাকাটা ফেলে দিয়েছে।' বড় ছেলে বলে।

'যাক্, বাঁচা গেছে। আর রাঁধতে হ'লো না। যা দিনকাল পড়েছে, এখন কুকুর-বেড়ালের এঁটো খেতে হবে। দরজা বন্ধ করে হুড়কো দিয়ে আসবি তো।' রাজ্যম বলে।

'তুমিই তো গান শুনতে ডেকেছিলে।' বড় ছেলে জবাব দেয়।

'হ্যাঁ বাবা, আমিই তোমাদের ডেকেছিলাম, আসার সময় দরজা বন্ধ করে আসা উচিত ছিলো, বুঝলে।' রাজ্যম আস্তে আস্তে ক'রে ওদের বুঝিয়ে বলে।

ভেঙ্কটাপয়য়া ফিরে আসে।

'বাড়ীর পেছন দিকে সুন্দর সুগন্ধ আর জ্যোৎস্না।' ভেঙ্কটাপয়য়া বলে।

'আরে, এতো তাড়াতাড়ি কি করে ফিরে এলে?' রাজ্যম জিজ্ঞেস করে।

'কাজ হয়ে গেলো।'

'পাপের প্রায়শ্চিত্ত হ'লো?'

'খানিকটা তো হয়েছে।'

'আরো কোথাও গিয়েছিলে নিশ্চয়।'

'রামো, রামো।'

'তোমার মুখভঙ্গী আর কথা বলার ছিরি যা।'

'ছি, ছি।'

'কি করে এ কথা বলবো?'

ভেঙ্কটাপয়য়ার বগলে তোয়ালের মধ্যে কাগজে মোড়া একটা প্যাকেট।

'ওটা আবার কি?' রাজ্যম জিজ্ঞেস করে।

'তোমায় খুলে দেখাবো।'

প্যাকেটের মধ্যে চার আঙুল চওড়া জরিপাড় শাড়ী। তার সঙ্গে ম্যাচিং ব্লাউজ পিস। মহারানী থেকে সাধারণ যে কোনো মেয়েরই এ শাড়ী পছন্দ হবে।

'কিনে এনেছো?'

'হ্যাঁ, কিনেছি। সব টাকা শেষ হবার আগে কিনেছি।'

'টাকা পেলে কোথায়।'

'সত্যি কথা যদি বলি তো তুমি আমায় ক্ষমা করবে না।'

'কি করেছো, বলোই না।'

'আগে কথা দাও যে তুমি মন খারাপ করবে না?' বলেই সে নিজের হাতটা এগিয়ে দেয়। হাতটা তার কাঁপতে থাকে। রাজ্যম নিজের হাত ওর হাতের ওপর রাখে।

'এভাবে কাঁপছো কেন? কি করেছো? চুরি করো নি তো?'

'তার চেয়েও খারাপ কাজ করেছি। যখন টাইফয়েডের জ্বর আবার নতুন করে এলো, তখন আমি হতাশ হয়ে পড়ি। একজন বন্ধু বাড়ী এসে ওটা দেখে দিয়ে দিতে বললো। শেষে সাহস করে করে ওটা আমি ওকে দিয়েই দিলাম।'

'কি দিয়ে দিয়েছো?'

'এখনও তুমি বুঝতে পারো নি? ওটাই নিয়ে গেছি। আড়াইশো টাকায় একজনকে দিয়ে দিয়েছি। আমি স্বপ্নেও ভাবি নি এতো টাকা পাওয়া যাবে। ভেবেছিলাম ওটা পুরোনো। কিন্তু ওরা বললো পুরোনোর দামই বেশি।'

এবার রাজ্যম বুঝতে পারে। ঘরের চারিদিকে দেখতে থাকে।

'আর দেখে কোনো লাভ নেই।'

'চলে গেছে।' বলে সে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে।

'আমি জানতাম তোমার খুব লাগবে। আমি সত্যিই ভুল কাজ করেছি।' অপরাধীর মতো সে দাঁড়িয়ে থাকে। স্বামীর মনের অবস্থা রাজ্যম বুঝতে পারে। তাই নিজের দুঃখ নিজের ভেতরেই চেপে রাখে।

'তুমি কিছু ভুল করো নি। যে কোনো গেরস্তই এরকম করতো। দায়ে পড়েই করেছো। টাকাটা তো খেয়ে উড়িয়ে দাও নি।'

আমি ভাবলাম 'আমাদের তো মেয়ে নেই, তিনটেই ছেলে। তাই সাহস করলাম।'

'যাক্‌গে, আমি তো অনেকদিন আগেই গান গাওয়া ছেড়ে দিয়েছি। বেহালাটা থেকেই বা কি বাহার হ'তো। মা সরস্বতীর আশীর্বাদ আমি পেয়েছি। মা চলে গেছে। যাবার সময় নিজের মাতৃত্বের পরিচয় রেখে গেছে। আমায় প্রাণদান করেছে। আমাকে শাড়ী

ও জামা দিয়ে গেছে।' বলতে বলতে রাজ্যমের চোখ জলে ভরে আসে। সামনে রাখা শাড়ীটা তুলেও দেখে না।

'চারপুরুষ ধরে থাকবে ব'লেই এই শাড়ীটা আমি কিনে এনেছি।' ব'লে ভেঙ্কটাপয়য়া শাড়ীর অর্ধেকটা পাট খুলে রাজ্যমের কাঁধের ওপর ফেলে দেয়।

'স্মৃতিটা তো থাকবে।' রাজ্যমের গলা কেঁপে ওঠে।

পূর্ণাহুতি

‘কতবার তো বলেছি এ হতে পারে না? তবুও শনির মতো পিছু পড়ে আছো। তোমাকেই বলছি, সাইকেল ছেড়ে দাও, দেরী হয়ে যাচ্ছে।’ পেরি শাস্ত্রী ঝাঁঝিয়ে ওঠে।

…আমি অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ি। আর পেরি শাস্ত্রী চট্‌পট্‌ সাইকেল চেপে চলে গেলেন।

রোদ ঝাঁ ঝাঁ করছে। ভোর হতেই সূর্যদেব অগ্নিমুখী হ’য়ে বেরিয়ে আসেন। সারাদিন হাওয়ার নামগন্ধ নেই, সূর্যাস্ত অবধি গাছের একটা পাতাও নড়ে না।

দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বোজকার মতো মন্দিরের চাতালে একটা গামছা বিছিয়ে শুয়ে পড়লাম। এখানে ওখানে একটু-আধটু ছায়া। চার পাঁচটা চড়াই পাখী এধার ওধার লাফাচ্ছে। মন্দিরের সামনে পানের দোকানে দাঁড়িয়ে একটা দশ বছরের ছেলে সোডা খাচ্ছে। দিন দশেক আগে ছেলেটির বাবা হঠাৎ মারা গেছে। নীরোগ শরীরে ঘুরে বেড়াতো। ছেলেটির বয়স কম ব’লে শ্রাদ্ধশান্তি করতে পারে নি। পেরি শাস্ত্রী তাই আমাকে দিয়েই শেষ কাজ করালো। এই কাজের জন্যে পঁচিশ টাকার কিছু বেশী পেয়েছিলাম।

সে যাক্‌। কিন্তু আজ কি ক’রে চলবে? কাল দুপুর থেকে খাওয়া জোটে নি। …ও তো এক লেবার ইনস্‌পেকটর, গ্রহের শান্তি

করিয়েছে, কালকেই ওর পূর্ণাহুতি ছিলো। বোধহয় পেরি শাস্ত্রীরই কাজ। ওদের বুঝিয়েছে যে ওদের গ্রহ খারাপ, তাই ওদের সব সুযোগ হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে। ওদের দিয়ে নবান্ন আর নগদ টাকা দান করিয়েছে। গতকাল এগারোটার সময়ই আমি ওদের বাড়ী গেছিলাম। সব কাজ শেষ হ'তে বেলা তুটো হয়ে গেলো। এই সব অনুষ্ঠান অনেকক্ষণ ধরে করে যজমানদের মনে গভীর বিশ্বাস জন্মিয়ে দেওয়াই পেরি শাস্ত্রীর কাজ। যজমানদের মনে হয় সব কাজ নিয়মমাফিকই হয়েছে। পেরি শাস্ত্রী যে সে লোক নয়··· কোনো কিছু নিয়ে পড়লে তার পিণ্ডি চটকে খাবে।

গতকালকার কথা ভেবে এখনও হাসি পায়। নবান্ন দান করার সময় গম দান করা নিয়ে একটা ঝামেলা বাধে। গম তো বাজারে পাওয়া যাচ্ছে না। তাই নিয়ে পেরি শাস্ত্রী আর নরসিংহমের মধ্যে বেশ কথা কাটাকাটি হয়ে যায়। আমার চুপ করে থাকাই উচিত ছিলো। এমনিতেই আমি বিশেষ কথা বলি না। কাল না জানি কি মতিভ্রম হয়েছিলো, ওদের ব্যাপারে মাথা গলিয়ে আমি সব উল্টোপাল্টা বলে ফেলি। তখন পেরি শাস্ত্রীর মুখের অবস্থা দেখার মতো। বড় বড় চোখ করে আমার দিকে তাকিয়ে ফেটে পড়ে, 'তুমি খামোখা কথা বলছো কেন? চুপচাপ বসে থাকতে পারো না? সবাই কথা বলবে! ছোট বড় এ সবের বালাই নেই!'

সত্যি আমি ভয় পেলাম। এর পর আমার পালা। আমাকে শনিদান ও মৃত্যুঞ্জয় দান গ্রহণ করতে হবে। এ ব্যাপারে আমার কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী নেই! আজ কেন, গত সাত-আট বছর ধরে এই গ্রামে আমি ছাড়া এ দান গ্রহণ করার আর দ্বিতীয় কোনো লোক নেই। যেই আমার পালা এলো, গামছাটা ঝেড়ে নিয়ে কাঁধে ফেলে

আসনে গিয়ে বসলাম। ঐ দম্পতী আমার পা ধুইয়ে প্রথমে আমায় শনির দান দিলো। একটু চাল, তিল ও নগদ একটা টাকা পাতায় রেখে এগিয়ে দিলো। সেটা গ্রহণ ক'রে আমি সঙ্কল্প করলাম: 'বাবু, তোমরা স্ত্রী-পুত্র নিয়ে সুখী হও, তোমাদের যেন সব রকম সম্পত্তি লাভ হয়। শনি ঠাকুর যেন তোমাদের পথের বাধা হয়ে না দাঁড়ায়। শনির কোনো খারাপ দৃষ্টি যদি থাকে তা এই দানের ভেতর দিয়ে যেন আমার ওপর এসে পড়ে। ...আমি সেটা শিরোধার্য করবো।' তার একটু পরে মৃত্যুঞ্জয় দানও গ্রহণ করলাম— একটু চাল, একটু তুলো, তেলে ভেজানো লোহার পেরেক ও একটা টাকা...। দান গ্রহণ করার সময় আবার সঙ্কল্প করি। 'বাবু, যদি তোমার পরিবারের কারুর কপালে অপমৃত্যুর রেখা থাকে তা হলে এই দানের মধ্যে দিয়ে তা যেন আমার প্রাপ্য হয়।' এর পর খানিকক্ষণ আমি বারান্দায় চুপচাপ বসে রইলাম। পেরি শাস্ত্রী সারাক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে থাকে, চোখে মুখে রাগ। বোধহয় আমার কথাগুলো এখনো ভুলতে পারে নি। তা না হলে এই বিরক্তির আর কি কারণ থাকতে পারে। মনে হয় যেন শনির দৃষ্টি পড়েছিলো আমার ওপর, তা না হলে এ সব কথা আমার মুখ দিয়ে বেরুলো কি করে। পেরি শাস্ত্রীর বিরাগভাজন হয়ে দিন কাটানো দায়।

আবার পাশ ফিরে শুলাম। মন্দিরের সামনে দিয়ে সিনেমার পোস্টার লাগানো গাড়ী চলে যায়। ব্যাণ্ডের শব্দ, চেঁচামেচি, হৈ হৈ... তারপর সব শান্ত... আবার সেই চড়াইয়ের কিচিরমিচির। সামনে ওষুধের দোকান। এক মহিলা ওষুধ কিনছিলেন। পাশ থেকে দেখে মনে হ'লো গঙ্গী। ভালো করে দেখলাম, গঙ্গী নয়।

এবার বুকের ওপর হাতছুটো রেখে চিত হয়ে শুলাম। গঙ্গীর চেহারাটা মনে পড়ে। গায়ের রঙ তো মিশকালো। কিন্তু শরীরের গঠন, হাঁটাচলার কায়দা হাসিখুশী ভাব, কথা বলার ভঙ্গিমা—সব মিশিয়ে ওকে অদ্ভুত লাগে। ওর দিকে তাকালেই লোকে মোহিত হয়ে যায়, ঠিক যেন মন্ত্রমুগ্ধ। তা না হলে মিষ্টি তাড়ি বেচার বোর্ড লাগিয়ে তলে তলে মদ বিক্রী করার সাহস আসে কি করে। কাল রাত্তিরে অন্ধকারে আমি ওর হাতে নগদ ছুটো টাকা আর চালের পোঁটলাটা তুলে দিলাম। একটু মিষ্টি হেসে বললে, 'পণ্ডিতমশাই, তোমার খাটুনির পয়সা আমায় কেন দিয়ে যাও! আমি তোমায় কিই বা দিতে পারি? তুমি তো কিছু করতেই··· রাজী নও। এক চুমুক মদ খেতে বললেই তো মুশকিলে পড়ে যাও। আমার রান্না ভাত খেতে বললেই তো ছুটে পালাও···।' এই কথা বলতে বলতে সে চালের পুঁটলিটা তুলে নেয়, টাকা ছুটো আঁচলে বাঁধে। তারপর আড়ামোড়া খেতে থাকে। আড়ামোড়া খেতে গিয়ে ওর বুকের ওপর থেকে আঁচলটা খসে পড়ে। আমার রক্ত অমনি চন্‌মন্‌ করে ওঠে। ছোটবেলায় স্কুলে 'মনুচরিত্র' কাব্য পড়েছিলাম। সেই গল্পের প্রগল্‌ভা নায়িকা বরুথিনির বর্ণনার শুধু একটা লাইনই আমার মনে আছে: 'প্রাঙ্কদ্‌ভূষণ বাহুমূলরুচিতো···' গঙ্গীকে আড়ামোড়া খেতে দেখে আমার এই লাইনটা মনে পড়লো। চুপচাপ ওখান থেকে চলে এলাম।

এ সব কথা এখন থাক। এখন আমার কি হবে। ছপুর তো গড়িয়ে এলো। এখনও তো কোনো যজমানের দেখা নেই। আজ বোধহয় উপোসীই থাকতে হবে। এই জন্যেই ···রা বলে, 'হাতে কিছু রেখো।' কিন্তু আমার রোজগার যে তেমন নয়। কি ক'রে

সঞ্চয় করি। এ দুনিয়ায় শনিদান, মৃত্যুদান নিয়ে আর মড়া ব'য়ে কেউই এক পয়সা বাঁচাতে পারে নি। এ কথা আমি বাজী ধরে বলতে পারি। হাতের কাছে একজনকেও দেখি না। আসলে ঐ পয়সাটাই যেন কি রকম। চোখে দেখার আগেই উবে যায়। হঠাৎ নিজের চেহারার কথা মনে হ'লো।

দাড়িতে হাত লাগিয়ে সামনের দিকে চেয়ে শুয়ে থাকি। সাত-আট বছর আগে আমার যে রকম স্বাস্থ্য ছিলো তা মনে করার চেষ্টা করি। আমার গায়ের রঙ তখন শ্যামবর্ণ, বেশ মনে আছে। চোখে তখন দীপ্তি ছিলো, মনে ছিলো আনন্দ। আজকের মতো চোখের তলায় কালি ছিলো না। চোখের দীপ্তি··· সে তো এই সব দান নিতে সুরু করার এক বছরের মধ্যেই মিলিয়ে গেছে। এখন গায়ের রঙ ঠিক কালো নয়, অদ্ভুত এক রকমের। মাঝে মাঝে নিজের দিকে তাকিয়ে নিজেই অবাক হয়ে যাই। সবুজ গাছের ডাল পোড়ালে যেমন রঙ হয়, আমার গায়ের রঙ অনেকটা তাই···

পেরি শাস্ত্রীর মতিগতি ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না। মনে হয় আমার ওপর খুব চটে গেছে। আমার সঙ্গে এর আগে কোনোদিন এ রকম ঝাঁঝিয়ে উঠে কথা বলে নি। আমি যা করেছি, ভুলই করেছি। সত্যি বলতে কি গমের দান নরসিংহম কিংবা পেরি শাস্ত্রী— যেই পাক না কেন তাতে আমার কি? আমায় তখন শনিতে পেয়েছিলো, না হলে এ সব কথা বলতে যাবো কেন? আমি কখনও কারুর সাতে পাঁচে থাকি না। সেদিন কেন যে এরকম হ'লো বুঝে উঠতে পারলাম না। আগেও তো অনেক অদ্ভুত ঘটনা দেখেছি, আজব সব কথাও শুনেছি। আমি তো জানতাম যে রামমূর্তি সেদিন মাথায় পাগড়ী বেঁধে অন্ধকারে লুকিয়ে লুকিয়ে

তাড়ির দোকানে মদ খেয়েছে। সেদিন তো বিশ্বনাথনকে পেছনের গলিতে গঙ্গীর হাত ধরে ফষ্টিনষ্টি করতে দেখলাম! শুধু তাই কেন, পেরি শাস্ত্রীকে কখনও কখনও সকাল বেলায় ইডলি আনিয়ে খেতে দেখেছি। ভেঙ্কটেশ্যামকেও তো কতবার আড়ালে লুকিয়ে বিড়ি খেতে দেখেছি। এ সবে আমার কি এসে যায়? সত্যি সত্যিই শনিই আমায় খেপিয়েছিলো। ও ভাবে আমার কথা বলা ঠিক হয় নি।

যাক্, যা হবার তাতো হয়েই গেছে। এবার আহার জুটবে কি করে তাই চিন্তা। চড়ুইরা কোত্থেকে ধান খুঁটে এনে খাচ্ছে। এক দৃষ্টিতে তাই দেখি। বড় চড়ুইপাখিটা ফুড়ুত করে উড়ে গিয়ে মুখে করে ধান নিয়ে আসে। ছানাগুলো ছোট্ট ছোট্ট হাঁ করে মার মুখ থেকে খাবার নিয়ে খায়। দেওয়ালে দেখি একটা বড় টিকটিকি চুপচাপ আটকে আছে। আশেপাশে কোনো পোকামাকড় দেখলে চোরের মতো চুপি চুপি গিয়ে তা গিলে ফেলে।

চড়চড়ে রোদ পায়ের ওপর এসে পড়লো। আমি চট করে চোখটা বন্ধ করে ফেললাম। বেশ গরম ও জ্বালা অনুভব করছি। চোখ খুলে একজনকে হেঁটে যেতে দেখে সময় জানতে চাইলাম। এগারোটা বেজে গেছে। দুর্বল শরীর, চোখ খুলতে পারছিলাম না। ঘুম পাচ্ছে। থাক্, এও ভালো। কাল সকাল অবধি একটানা ঘুমোতে পারলে ভালোই হয়। আসছে কাল এক অফিসারের বাড়ীতে পূর্ণাহুতি। কমপক্ষে একসের চাল, নগদ দুটো টাকা আর খাওয়া··· না, সেই পর্যন্ত উপোসী থাকতে হবে। আমার কাছে এ সব আর নতুন নয়। আগেও তো কতদিন এইভাবে অনাহারে কেটেছে।

ঘুম ভেঙে দেখি সূর্যাস্ত হবো হবো। চট করে উঠে পড়লাম।

হাই তুলে, তুড়ি দিয়ে, গামছাটা ঝেড়ে নিয়ে কাঁধে ফেলে মন্দিরের সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে রাস্তায় এসে পড়লাম।

ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে। সমুদ্দুর থেকে ঠাণ্ডা হাওয়া আসছে, বেশ লাগে। সূর্যঠাকুর তখন ডুবুডুবু। তাঁর দিকে তাকিয়ে বলি, 'হে সূর্যদেব! কাল আবার তাড়াতাড়ি এসো।'

আস্তে আস্তে খালের দিকে হাঁটতে থাকি। জলে দুপা নেমে আকাশের দিকে তাকালাম। সূর্যাস্তের রক্তিম আভা জলের ওপর পড়েছে, মনে হ'লো ঠিক যেন একটা লাল কাগজ। খালের ধারে গাছে গাছে পাখিরা কলতান করে চলেছে। আমার চারিদিকে জল, একটু স্থির হলে সেদিকে তাকিয়ে নিজের প্রতিবিম্ব দেখি। দাড়িটা খুব বেড়ে গেছে। নিজের ছায়া আর দেখতে সাহস হয় না। হাত দিয়ে জল কাটতে কাটতে এগিয়ে যাই। শরীরটায় ঠাণ্ডা জল লাগতেই বেশ একটা তৃপ্তিতে মনটা ভরে গেলো। অন্ধকার নেমে না আসা পর্যন্ত স্নান করতে থাকি।

স্নান সেরে গা হাত পা মুছে খালের ধারে অনেকক্ষণ বসে থাকলাম। অনেক রাত হ'তে উঠে পড়লাম। চারিদিক নিস্তব্ধ।

আস্তে আস্তে এগুতে থাকি। তাড়ির দোকানের সামনে এসে হঠাৎ থেমে যাই। কে যেন আমার পায়ে শেকল বেঁধে দেয়। গঙ্গা দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে, থেকে থেকে আড়ামোড়া খাচ্ছে। আমায় চিনতে পারে, ডাক দেয়, বলে, 'ঠাকুরমশাই, এদিকে একবার শুনে যাও।' আস্তে আস্তে ওর কাছে গেলাম। হ্যারিকেনের আলোতে গঙ্গীকে দেখলাম। ফিনফিনে সাদা একটা শাড়ী আর সেইরকম ফিনফিনে একটা জামা। ভেতরকার জামাটাও পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। হাসলে সাদা ধবধবে দাঁত ঝক্‌মক্ করে ওঠে।

মুচ্‌কি হেসে বলে, 'কি বাবুজী, স্নান সেরে বাড়ী ফিরছো? মুখ দেখে মনে হচ্ছে খাওয়া হয় নি। আমার রান্না হয়ে গেছে ...খাবে?'

ওর ঘরের দিকে এগুতে এগুতে বলি, 'না! . খাবো না... তুমি খেয়ে নাও... আমি 'মাম' (সঙ্কল্প) করে দেবো।'

'পণ্ডিতমশাই, তোমার কথা আমি কিছুই বুঝতে পারি না... একটু বোসো-না। প্যাসেঞ্জার এখন কেউ আসবে না... ততক্ষণে অনেক রাত হয়ে যাবে।' এই বলে গঙ্গী একটা কাঁচের থালায় খাবার বেড়ে নিয়ে আমার সামনে খেতে সুরু করে দেয়। থেকে থেকে আমি ওর দিকে তাকাই। হঠাৎ গঙ্গী হেসে ফেলে, কতবার আমায় চাল এনে দিয়েছো, কিন্তু কখনও আমার কাছ থেকে কিছু নাও নি। গেলাসও কখনও ছোঁও নি। ভুল করে যদি আমার হাত ঠেকে যায় তো ছুটে পালাও। যেন বিছেতে হুল ফুটিয়েছে।... আজ আমার কথা রাখো... আমি জানি আজ তোমার খাওয়া হয় নি; এখানে আমি ছাড়া কেউ নেই... একটু খেয়ে নাও... মাছের তরকারী ইচ্ছে না করে খেও না... শুধু রুসুনের চাটনি... খুব ভালো লাগবে।'

আমি চমকে উঠি ওখান থেকে বেরিয়ে পড়লাম। পেছন থেকে গঙ্গীর অট্টহাসি শুনতে পাচ্ছি।

পরের দিন ঐ অফিসারের বাড়ী গেলাম। বাড়ীটা খুব বড়, বারান্দায় লোক গিজ্‌গিজ্‌ করছে। ভেতরে পূর্ণাহুতির কাজ আরম্ভ হয়েছে। পেরি শাস্ত্রী বেশ জোরে জোরে মন্ত্র পাঠ করছে। যজমান পাতায় করে ঘিয়ের বাটী থেকে ঘি নিয়ে 'ওঁ সহায়' বলে হোমে আহুতি দিচ্ছে।

ওখানে আমার সঙ্গে কেউই কথা বললো না। বারান্দায় একটা থামে ঠেসান দিয়ে আমি বসে পড়লাম। বিশ্বনাথম সামনে বসে পৈতে দিয়ে পিঠ চুলকাচ্ছে। নরসিংহম দোরগোড়ায় বসে পেরি শাস্ত্রীর সঙ্গে স্বর মিলিয়ে মন্ত্র উচ্চারণ করছে। রামমূর্তি ও আর সবাই দেওয়ালের ধারে সার বেঁধে বসে আছে, ঠিক যেন এক সারি জলে ভেজা নিমগাছ।

ওদের পাশে একটা লোক বসেছিলো। তার ওপর নজর পড়লো। বয়স পঁচিশের কাছাকাছি, গায়ের রঙ ময়লা, খোঁচা খোঁচা দাড়ি, আধ-ময়লা একটা ধুতি পরে বসে আছে। চোখ বুজে কি যেন ভাবছে।

মনে একটা খট্‌কা লাগে তবুও ওকে নিয়ে মাথা ঘামালাম না; ছাদের দিকে চেয়ে বসে থাকি।

বেশ খানিকটা সময় কেটে যায়। পূর্ণাহুতির কাজ শেষ হয়ে গেল। এবার দানের পালা। বিশ্বনাথম, নরসিংহম, রামমূর্তি—আরো অনেকে একে একে ভেতরে যাচ্ছে, দান গ্রহণ করে পুঁটলি বেঁধে ফিরে এসে যে যার জায়গায় বসে পড়েছে।

যা ভেবেছিলাম ঠিক তাই। 'রামেশম্, তাড়াতাড়ি এসো!' পেরি শাস্ত্রীর গলা শোনা যায়। আগন্তুক চট করে উঠে ভেতরে চলে যায়। আমিও এগিয়ে যাই। ও দেখি বাটিতে পা রেখে বসে আছে। পা ধুইয়ে দেবার ব্যবস্থা হচ্ছে।

'পেরি শাস্ত্রী, এটা আপনার উচিত হয় নি। পরশু দিন আপনি আমাকে বলেছেন…' আমি চিৎকার করে উঠি।

পেরি শাস্ত্রী বড় বড় চোখ করে আমার দিকে তাকায়, বলে, 'উচিত-অনুচিত এবার বুঝি তোর কাছ থেকে শিখতে হবে… কাল থেকে পড়াতে আরম্ভ করিস… এখন বাইরে যা।'

নিজেকে একটু সামলে নিয়ে অফিসারটিকে বলি, 'দেখুন বাবুজী! এই ভালো মানুষটি পরশু আমাকে বলে দিয়েছিলো, আর আজ অন্য একজনকে ডেকে এনে দান দিচ্ছে। আপনিই এর বিচার করুন।'

লোকটি একটু চটে ওঠে। পেরি শাস্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বলে, 'এ সব কি ঝামেলা?' পেরি শাস্ত্রী এ প্রশ্নের কোনো জবাব দিলো না। ভদ্রলোকের স্ত্রীকে ডেকে বললো, 'দিদি, তাড়াতাড়ি করুন। পা ধুইয়ে দিয়ে এবার কাজ আরম্ভ করুন, দেরী হয়ে যাচ্ছে।' এই কথা ব'লে পেরি শাস্ত্রী তাড়াহুড়ো করতে থাকে। যজমান আর কিছু বলতে পারে না। স্ত্রী জল ঢালতে তিনি পা ধুয়ে দিয়ে পা-ধোওয়া জলটা মাথায় ছিটিয়ে দিলেন। দান বিধিমতে সম্পন্ন হ'লো। আমি অসহায়ের মতো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব দেখলাম। চাল, তিল··· নগদ টাকা··· সব দেওয়া হ'য়ে গেলো। এরপর মৃত্যুঞ্জয় দানও পেরি শাস্ত্রী ওকেই দিলেন। খিদেতে নাড়ী জ্বলে যাচ্ছে। চেঁচিয়ে উঠি, 'আমি তোমার কি ক্ষতি করেছি যে তুমি এমন অন্যায় ও অবিচার করলে।' কিন্তু কোনো লাভ হ'লো না। চাল, তুলো, লোহার পেরেক, নগদ টাকা··· মৃত্যুঞ্জয় দানও বিধিমতে হ'লো।

'যা হবার তো হয়ে গেলো, এখন আজকের মতো পেট ভরে খেতে পেলেই যথেষ্ট···' এই আশায় আবার থামে হেলান দিয়ে বসে পড়ি। চাল বাঁধছে যে লোকটি তার ওপর আমার সারাক্ষণ নজর। আমার দৃষ্টিতে যে রাগ আর ঈর্ষা জড়িয়ে ছিলো তা ঐ লোকটাও বুঝতে পারে, তাই সে একটি বারও আমার দিকে চোখ তুলে তাকালো না।

মনে মনে ভাবি এ আহাম্মক এসে জুটলো কোত্থেকে। এই সব শূদ্রের দান নেবার ওর কি দরকার পড়লো। দেখে মনে হ'লো

একটু পড়াশোনাও জানে। ইতিমধ্যে পেরি শাস্ত্রী বারান্দায় বেরিয়ে এলো। বিরক্ত হয়ে বললো, 'আরে, এখনও এইখানে বসে? তোমায় আমি তখন চলে যেতে বললাম না। কি মগজে ঢোকে নি? চলে যাও এখান থেকে···।' আমি ক্ষীণ কণ্ঠে বলার চেষ্টা করি, আজকের আহারটা যদি হয়।

পেরি শাস্ত্রী একেবারে তেলেবেগুনে জ্বলে ওঠেন, বলেন, 'না, না, ও সব কিছু হবে না, এখান থেকে চলে যাও।'

'আমি এমন কি অপরাধ করেছি?'

'আর একটা কথা বলবে না! আর কখনও আমার সামনে আসবে না, বুঝলে?'

আমি অফিসারের দিকে খুব করুণ চোখে চাইলাম। পেরি শাস্ত্রী বুঝতে পেরে তাড়াতাড়ি বলে ওঠে, 'বাবুসাহেব! আমার কথা শুনুন। এ সব ব্যাপারে আপনার কোনো অভিজ্ঞতা নেই। এই সব লোককে একটু লাই দিলে ছিনে-জেঁাকের মতো আপনার পেছনে লেগে থাকবে। আপনাকে শেষ করে ছাড়বে।' সব শুনে ভদ্রলোক একটু ঘাবড়ে গিয়ে ভেতরে চলে গেলেন।

আমি আর থাকতে না পেরে বললাম, 'ঠিক আছে। গরীবের এই দীর্ঘশ্বাস বিফল যাবে না। পেরি শাস্ত্রী, তুমি ভেবেছো এক গরীব ব্রাহ্মণকে পেটে মেরে আরামে থাকবে। কিন্তু তা হবে না। এই পাপের ফল তোমাকে ভুগতেই হবে। তোমারও ছেলেপুলে আছে, একটু বুঝেসুঝে চোলো।' রাগের মাথায় এই সব কথা বলে আমি সিঁড়ি দিয়ে নেমে এলাম। পেছন থেকে পেরি শাস্ত্রীর গলা শুনতে পেলাম: 'তুমি তো খুব বড় ব্রাহ্মণ সেজেছো হে। সন্ধ্যে হ'তে না হ'তেই তো তাড়ির দোকানে যাও। যা, যা, ভাগ!'

গরম পিচঢালা পথে আবার হাঁটতে সুরু করলাম। সূর্য তখন মাথার ওপর। যেন আগুন ছড়াচ্ছে। হাওয়া একেবারে বন্ধ। পেটেও তখন আগুন জ্বলছে। পথ যেখানে ঘুরে গেছে, সেখানে হঠাৎ পায়ে একটা কাঁটা ফুটলো। যন্ত্রণায় কাতরাতে কাতরাতে এক হাতে দেওয়ালটা ধরে অন্য হাতে কাঁটাটা টেনে বার করে ফেলি— পুরোনো মরচে-ধরা একটা পেরেক। পেরেকটা টেনে বার করতেই খুব খানিকটা রক্ত বেরিয়ে গেলো। পেরেকটা হাতে নিয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে কোনোরকম মন্দিরের চাতালে গিয়ে বসলাম। পেরেকটা হাতে নিয়ে দেখতে থাকি। এতোদিনে শূদ্রদানে আমি যত পেরেক নিয়েছি সেই সমস্ত পেরেক একটা চালুনির আকার নিয়ে আমার চোখের সামনে ঘুরতে থাকে।

সন্ধ্যেবেলা ঘুম ভাঙলো। সমস্ত শরীরে ব্যথা। সিঁড়ি দিয়ে নেমে এক সেকেণ্ডের জন্যে রাস্তায় এসে দাঁড়াই। ভয় হয় যদি জ্বর আসে। অনেকদিন আর জ্বর হয় নি। জ্বরের নামেই বুক কাঁপে।

রেলের ফটকের কাছে একটা বোর্ডে অনেকগুলো ওষুধের নাম লেখা দেখেছিলাম। ওষুধের লম্বা এক তালিকা দেয়ালে টাঙানো। সেখানে একটা বুড়ো সবসময় চেয়ারে চুপচাপ বসে থাকে।

আস্তে আস্তে হেঁটে সেখানে গেলাম। সারা রাস্তা আড়ামোড়া খেতে খেতে এসেছি। কি রকম অদ্ভুত লাগছিলো। দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে ভেতরে উঁকি মেরে দেখি; টেবিলের ওদিকে চেয়ারে বুড়ো লোকটি ছবির মতো বসে আছে। আমাকে দেখে ওর মনে কোনো চাঞ্চল্য দেখা দিলো না। ঘরে ঢুকে পড়ি। ভেতরে আর কেউ ছিলো না। আমাকে সামনে দেখে একটু আশ্চর্য হয়ে গেলো।

মোটা চশমাটা সুতো দিয়ে কান অবধি টেনে বেঁধে রেখেছে। আমি নমস্কার জানিয়ে আমার অবস্থা বললাম, 'ডাক্তারবাবু, এই পায়ে মরচে-ধরা একটা পেরেক ফুটেছে।'

একটু নড়েচড়ে বসে অবাক হয়ে আস্তে আস্তে বলেন, 'আচ্ছা! পেরেক ফুটেছে? মরচে-ধরা পেরেক?··· খুব সাংঘাতিক!' এই-কথাগুলো তিনি বার বার বলতে থাকেন। অন্দরের দিকে তাকিয়ে হাঁক পাড়েন, 'মা, একটু গরমজল নিয়ে এসো তো!' তারপর আমার দিকে তাকিয়ে একটা ওষুধের পুরিয়া খুলতে খুলতে বললেন, 'বাপরে! মরচে-ধরা পেরেক পায়ে ফুটে গেছে। খুবই ভয়ের ব্যাপার। ...প্রথমে পা ফুলে ওঠে; তারপর জ্বর আসে, তারপর সেপ্‌টিক্। কখনও কখনও পা-ও কেটে ফেলতে হয়। দেরী হয়ে গেলে প্রাণও··· হুস্···' বলে পাখী ওড়ানোর মতো হাতদুটো করলেন।

ভেতর থেকে একটি মেয়ে গরম জল নিয়ে এলো। গেলাসটা উনি হাত বাড়িয়ে নিয়ে নেন। পুরিয়ায় যে ওষুধটা ছিলো সেটা মুখে পুরে নিয়ে গরম জলটা খেয়ে মুখ মুছে নিলেন। আমি ভেবেছিলাম ওষুধ আর গরম জলটা বোধহয় আমারই জন্যে। আমি ভ্যাবাচ্যাকা মেরে গেলাম। খানিকক্ষণ বুড়ো চোখ বন্ধ করে বসে থাকে। তারপর হঠাৎ আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আরে, আপনি এখনও এখানে! পুরোনো পেরেক পায়ে ফুটে বেশ গোলমাল বাঁধাতে পারে। আমি একটু আগেই বলেছি, সেপ্‌টিক্ হবার ভয় থাকে। প্রথমে খুব তেড়ে জ্বর আসে, পরে পা ফুলে যায়···' আরো কিছু বলতে যাচ্ছিলো। ইতিমধ্যে ভেতর থেকে সেই মেয়েটি এসে ওকে থামিয়ে দেয়। বলে, 'তুমি চুপ করো দাদু, তোমাকে

এখানে কে বসতে বলেছে? ···শুনুন, আমার বাবা এখন গাঁয়ে নেই, আপনি পরে আসবেন। ইনি কিছুই জানেন না।'

'আমাকে বাঁচালে। তুমি শতায়ু হও মা, শতায়ু হও।' ব'লে আমি ওখান থেকে চলে আসি।

অনেকক্ষণ মন্দিরের চাতালে বসে রইলাম। রাস্তায় বেশ ভীড়। অতো ভীড়ের মধ্যেও আমি ঐ লোকটাকে চিনতে পারি। চট ক'রে ওঠে পড়লাম। ওর কাঁধটা চেপে ধরি। ও চমকে ওঠে। এক দৃষ্টিতে ওর দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে জিজ্ঞেস করি, 'আপনার নাম?'

'রামেশম্···'

ওর চোখে চোখ রেখে বলি, 'ভাই, তোমার এখন অল্প বয়স। এ সব ব্যাপার তুমি একেবারেই বোঝো না। পেরি শাস্ত্রী মিছিমিছি তোমায় এই ঝামেলায় টেনে এনেছে। যে নিশ্চিন্তে নির্বিঘ্নে জীবন কাটাতে চায় সে জেনেশুনে কখনও এ দান গ্রহণ করবে না। তুমি হয় তো এটাকে খুব হালকাভাবে নিচ্ছো। আমার দিকে তাকিয়ে দেখো আমার কি দশা হয়েছে। আমি তোমায় বলে বোঝাতে পারবো না যে এটা কি জঘন্য কাজ। এ মানুষকে গ্রাস করে ফেলে। শনিদেব আর যমদূত ঘাড়ে চেপে বসে। যত সব নীচ ভাব মনে আসে। জুয়োখেলা, নেশাকরা, বেপথে চলা··· সবরকম বদ খেয়াল··· চোখের জ্যোতি··· ।'

ও একটু চিন্তিত, হাঁটবার চেষ্টা করে। আমি যেতে দিলাম না: 'চোখের জ্যোতি নষ্ট হয়ে যায়। চোখদুটো কাঁচের গুলি হয়ে যায়। নিজের ওপর নিজের কোনো কর্তৃত্ব থাকে ··। শনি যে ভাবে চালান, সেইভাবে চলতে হয়। নিজেই বুঝতে পারি না নিজে কি

বলছি আর কি করছি। সব দিক দিয়েই অবস্থা খারাপ হয়ে আসে। বোধ হয় তুমি জানো না, এই শূদ্রদান কি খারাপ জিনিস।'

'আমি তো রোজ গায়ত্রী মন্ত্র জপ করি।' আস্তে করে সে উত্তর দেয়।

'শনিদেব আর মৃত্যুদেবকে তুমি সাধারণ জিনিস মনে করেছো। গায়ত্রী মন্ত্র জপ ওঁদের কাছে কিছুই নয়।' আমি খুব জোরে ব'লে উঠি। 'তা ছাড়া তুমি আজ আমার মুখের গ্রাস ছিনিয়ে নিয়েছো। এই পাপের ভাগ তোমায়ও নিতে হবে। আমি দু'দিন থেকে অভুক্ত।'

খানিকক্ষণ চুপ করে আবার জিজ্ঞেস করি, 'তোমার কোনো আত্মীয়স্বজন আছে?'

'ছোট ভাই আছে, পড়ছে। ওর জন্যে প্রত্যেক মাসে টাকা পাঠাতে হয়।'

'এই পয়সা পাঠাবে! তা হলে তার আর পড়াশুনো হয়েছে! সে চলে ফিরে বেড়ালেই যথেষ্ট।'

ওর চোখ লাল হয়ে যায়, ঠোঁট কেঁপে ওঠে। আমায় বলে, 'ছোট ভায়ের নামে কিছু বোলো না।'

আমি চিৎকার করে উঠি, 'বলবো, আরো বলবো। আমার মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়েছো। এই পাপের ফল··· তোমায় পেতেই হবে। এই দান গ্রহণ করে তুমি তোমার ছোট ভাইকে পড়াতে চাও। কি ভালো মানুষ! ওহে বাছা! তোমার ছোটভাই কি তোমারই মতো। দেখবে, কাঠের মতো দিন দিন শুকিয়ে যাবে, বদ স্বভাবের হবে, একেবারে অপোগণ্ড তৈরী হবে। আমার কথা ছেড়ে দাও। এ সংসারে আমার কেউ নেই। যারা এ সব দান

গ্রহণ করে তাদের এ সংসারে আপন ব'লে কেউ বেঁচে থাকতে পারে না বুঝলে ? সাবধান !'

দাঁতে দাঁত চেপে সে আমার দিকে রেগেমেগে তাকায়। বাক্য-বাণে কাজ হয়েছে দেখে আবার বলি, 'নিজের জ্ঞাতভায়ের ওপর তুমি যে অন্যায় করেছো, তা একেবারে বিফল যাবে না ! তার ফল তোমাকে, তোমার ভাইকে, তোমায় আমার প্রতিদ্বন্দ্বীহিসেবে যে দাঁড় করিয়েছে সেই পেরি শাস্ত্রীকে ভুগতেই হবে।' এইভাবে জোরে জোরে আমি ওকে কথা শোনাতে থাকি। ও বার বার পিছনে তাকায় আর এগোতে থাকে।

আমি আবার মন্দিরের চাতালে এসে বসে পড়লাম। ওর সঙ্গে এইভাবে কথা বলতে পেরেছি ভেবে বেশ একটু গর্ব অনুভব করি। একটু পরেই আবার মনে হয়, ওর সঙ্গে এ রকম নির্দয়ের মতো কথা বলে বোধহয় ভুলই করেছি। কিন্তু যখন মনে পড়ে যায় আজ দুদিন আমি অভুক্ত, তখন নিজেকে সামলে নি। রাত হতেই রোজকার মতো ঐখানেই শুয়ে পড়ি। সারা শরীরে যন্ত্রণা, যেন পিষে ফেলছে, মাথার যন্ত্রণাও সুরু হয়েছে··· পায়ে পেরেকটা যেখানে ফুটেছিলো, সেখানটা ভীষণ জ্বলছে। কাতরাতে কাতরাতে চোখ বন্ধ করি। হঠাৎ কাঁপুনি ধরে। হাজার হাজার লোহার পেরেক চালুনির মতো আমার মাথার চারদিকে ঘুরতে থাকে।

তিনদিন ধরে খুব তেড়ে জ্বর হয়। মাঝে-মধ্যে যখন একটু জ্ঞান ফিরে আসে তখন মনে হয় কে যেন আমার পাশে দাঁড়িয়ে আছে, গায়ে চাদর ঢেকে দিচ্ছে, মুখে ওষুধ ঢেলে দিচ্ছে। কে যেন আমার হাতে ইনজেকৃশন্ দিচ্ছে। গত তিনদিন আমি লোকটাকে চিনতে পারি নি।

জ্বর যখন ছেড়ে গেলো, চোখ খুলে দেখলাম, মন্দিরের এক কোণে একটা ছোট ঘরে তালপাতার চাটায়ে শুয়ে আছি। মাথায় বালিশ …পাশে ওষুধের ছুটো শিশি… পায়ে ব্যাণ্ডেজ… বাইরে দরজায় কার যেন ছায়া।

অনেক কষ্ট ক'রে আস্তে আস্তে ওঠবার চেষ্টা করি। এমন সময় বাইরের লোকটা ভেতরে এসে বলে, 'কি চাই আপনার? ও রকম করে এখন ওঠবার চেষ্টা করবেন না।'

'রামেশম্?' আমি আবার চোখ বুজে শুয়ে পড়ি। সে আমার পাশে বসে কপালে হাত রাখে। বলে, 'ঠিক আছে। আপনার গায়ে ঘাম দেখে আমি এখন নিশ্চিন্ত হলাম। আর জ্বর তো ছেড়ে গেলো। গত তিনদিন ধরে আপনার যা অবস্থা ছিলো তা দেখে তো রীতিমত ঘাবড়ে গেছিলাম। ডাক্তার যে ইনজেক্শন্ দিয়েছে, সে বোঝবার মতো হুঁশও আপনার ছিলো না।'

আমার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ে। চোখ বুজে থাকি। কিন্তু চোখের জল থামতে চায় না। সমানে বইতে থাকে। যাকে আমি সেদিন রাস্তায় দাঁড়িয়ে যা তা বলে অপমান করেছিলাম, বন্ধু, তুমি কি সেই?

চোখ খুলে যাকে গেলাসে ওষুধ ঢালতে দেখি তাকে মনে হয় যেন এক যোগী। 'এইটাই শেষ দাগ। এটা খেয়ে আপনি শুয়ে পড়ুন। আমি ডাক্তারের কাছ থেকে হয়ে আসি। যদি দরকার হয় তো ওষুধ নিয়ে আসবো।' কথা কটা বলে আমার মুখে ওষুধটা ঢেলে দেয়। আবার বলে, 'আজকেই ছোট ভায়ের চিঠি পেলাম। লিখেছে ঠিকমত পড়াশুনো করছে। ওর কোর্স আর এক বছরের মধ্যেই শেষ হয়ে যাবে… তারপর বড় অফিসারের চাকরী পাবে।

পরশু আমি ওকে তিরিশটা টাকা পাঠিয়েছি। এই রসিদ দেখুন, ওর সই দেখুন··· ইংরিজিতে কি সুন্দর লিখেছে···' এই সব বলতে বলতে ও চলে যায়।

পৃথিবীর বুকে অসাড়ে অন্ধকার নেমে আসে। মন্দিরপ্রাঙ্গণে কোনো পাখী হাহাকার করে ঘুরে বেড়ায়। মনটা হঠাৎ চঞ্চল হয়ে ওঠে। খুব আস্তে আস্তে সাহসে ভর করে উঠে পড়লাম। একটু একটু করে বাইরে এসে মন্দিরের চাতালে বসলাম। বুকের ভেতরটা তোলপাড় করতে থাকে··· একটা পাখী বিশ্রী একটা চীৎকার করে উড়ে যায়।

খানিকক্ষণ পরে দূরে লোকের ভীড় দেখতে পেলাম। লোকমুখে যা খবর পেলাম তা শুনে আমি থরথর করে কাঁপতে থাকি ; ওখান থেকে উঠে পড়ে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটতে থাকি। বুকের ভেতরটা ধড়ফড় করতে থাকে।

'কোথায় ?'

'মেন রোডের ওপর।'

টলতে টলতে আমি ছুটতে থাকি। আমার পেঁাছোবার আগেই সব শেষ হয়ে গেছে। রামেশম্ রাস্তার মাঝখানে, রক্তমাংসের পিণ্ডের মতো পড়ে আছে। লরীর ড্রাইভার নিশ্চয়ই একটা পাষণ্ড ছিলো, থামে নি পর্যন্ত। রাস্তায় লোকে লোকারণ্য।

আমার দুচোখ বেয়ে জল ঝরতে থাকে। ওর ওপর ঝুঁকে পড়লাম। ডান হাতটা তখনও মুঠো করা। হাতের দিকেই যেন সে চেয়ে আছে। মুঠোয় ওর ছোট ভায়ের লেখা সেই চিঠি··· কাঁদতে কাঁদতে ওর হাত থেকে চিঠিটা নিয়ে নি। রাস্তার হাল্কা আলোয় লেখাগুলো ভেসে ওঠে— 'আমার পড়া ঠিকমত চলছে,

আরো মন দিয়ে পড়বো। আর একটা বছর··· তারপর ফুল দিয়ে আমি তোমার পুজো করবো, দাদা!'

আমি চোখ বুজলাম, 'হ্যাঁ ভাই, ভালো করে পড়িস··· আমি যে তোর··· '

চোখ খুলেই দেখি পুলিশের লোক, ঘটনার পুরো বিবরণ জানতে ব্যস্ত।

ঠাকুরের পাল্কী

মানুষের কল্পনার রঙে রচিত হয়েছে 'কাশী মজলি' গল্প। কামদেবতা ও অন্যদের মনের গভীরে প্রবেশ করার ছলনার বিচিত্র দৃশ্যগুলি সানায়ের মিষ্টি সুরের মধ্যে দিয়ে শ্রোতাদের মনে ভেসে ওঠে। গল্পের উপসংহারের মতো সানায়ের সুরের মধ্যে থেকে থেকে ঢোল বেজে উঠছে। ঠাকুরের শোভাযাত্রা বেরিয়েছে; প্রতিটি বাড়ী থেকে নারকেল, প্রদীপ, ধূপ ইত্যাদি ঠাকুরের পুজোয় দিয়ে যাচ্ছে, শোভাযাত্রাও এগিয়ে চলেছে। হৈ হট্টগোল শুনে জগন্নাথন বাইরের চাতালে বেরিয়ে আসে। সেখান থেকে ঠাকুরকে মনে মনে প্রণাম জানায়।

রাস্তার মাঝখানে পাল্কী দাঁড়িয়ে যায়।

'আরে জগ্গূ! চলে আয়, চলে আয়। পাল্কীর তলা দিয়ে এদিক ওদিক ছুটবো। শুনেছি এতে খুব পুণ্যি হয়।' এই না বলে একটা ছেলে জগন্নাথনের বাড়ীতে এসে তার ছোট ছেলেকে পাকড়াও করে নিয়ে গেলো। দুজনেই পাল্কীর দিকে ছুট দিলো। অন্য সব ছেলেদের সঙ্গে এরা দুজনেও চোখ বন্ধ ক'রে পাল্কীর তলা দিয়ে ছুটোছুটি আরম্ভ করে দিলো। ভক্তি যে কি, তা এই বাচ্চারা জানে না। কিন্তু পাল্কীর তলা দিয়ে ছুটোছুটি করতে এদের বেশ মজা লাগে। এই প্রথম ওরা আবিষ্কার করলো যে এভাবে বার বার ছুটতে কি রকম মজা লাগে। পাল্কী চলছে, তার তলা দিয়ে ছুটোছুটি করতে আরো না জানি কত মজা। প্রতিটি ঘরে আর প্রত্যেকের মনে প্রতি মুহূর্তে যিনি লুকোচুরি

খেলছেন সেই নন্দকিশোর যদি এ খেলার কথা জানতেন নিশ্চয়ই জেদ ধরে পাল্কী থেকে নেমে বাচ্চাদের সঙ্গে এই খেলায় মেতে উঠতেন। পূজারীরা বাচ্চাদের বকাবকি করতে থাকে। জগ্‌গূর মা যখন তার পিঠে এক চড় মারে তখন সে বুঝতে পারে এই আনন্দ কতক্ষণস্থায়ী।

জগন্নাথন ওকে পাশে বসিয়ে বোঝাচ্ছিলেন। ওর গাল বেয়ে চোখের জল পড়ছে। 'আচ্ছা দাদু, আমি কি কোনো ভুল কাজ করেছি?' জগ্‌গূর দৃষ্টিতে যেন এই প্রশ্ন। কোলের কাছে গুটিসুঁটি মেরে জগ্‌গূ বসেছিলো। জগন্নাথন তাকে আরো কাছে টেনে নিয়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দেন। জগন্নাথনের মনে হয় ঠাকুর যেন তার আরো কাছে এসেছেন। লোকে বলে মা যশোদা নাকি একবার ঠাট্টা করে বলেছিলেন :

'চোদ্দলোক নিজের পেটে পুরে বসে আছে··· আর দেখতে তো ছোট ছেলে, এই বলে তো সবাই কেষ্টঠাকুরের প্রশংসা করে— জানি না কি করে এই চোদ্দলোক ধারণ করে আছে! কত বড়··· এই এতো বড় লোককে আমি কোলে তুলে নিয়ে খেলা করি··· কিন্তু আমার প্রশংসা কেউ করে না— সবই নিজের কপাল!'

কিন্তু যশোদার যে সৌভাগ্য হয়েছিলো, যারা পাল্কী নিয়ে যাচ্ছে, আজ তাদেরও সেই সৌভাগ্য।

'প্রতিদিন যাঁরা ঠাকুরের পুজো করেন তাঁরা যদি সৌভাগ্যশালী হন তা হলে না জানি যারা সবসময় ঠাকুরের পাল্কী বয় তারা এই সৌভাগ্য অর্জনের জন্য কোন সোনার ফুল দিয়ে ঠাকুরের পুজো করেছিলো···'

আর একজন বলছিলেন, 'সেই কাঁধ আর সেই বাহু জানি না কি ব্রত করেছিলো।'

শেষের এই কথা শুনে জগন্নাথন আনন্দে বিহ্বল হয়ে পড়লেন।

'সেই কাঁধ আর সেই বাহু জানি না কি ব্রত করেছিলো।' ঠাকুরের সঙ্গে যারা মশাল বয়ে নিয়ে যাচ্ছে তাদের হাতের মশালের মতো জগন্নাথনের হৃদয় আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগে এমনি ভাবেই দীপ্তমান হয়ে উঠেছিলো।

জগন্নাথনের টানাটানা চোখ। লোকে বলে ঠিক যেন ওর মামীর মতো ; করুণ চাহনিটাও। ছেলেবেলায় মেয়েরা লালন-পালন করেছে। যখন তিন বছর বয়সও পার হয় নি তখন ওর বাবা একশো বছরে মারা যান। মাকে সান্ত্বনা দিতে এসেছিলেন দিদিমা, তিনি আর ফেরেন নি। দিদিমার চিরসঙ্গী তাঁর ছোট বোন— ছোট দিদিমা— তিনিও পরলোকে পাড়ি দিলেন।

কখনও কখনও জগ্‌গূ সন্ধ্যেবেলায় জানলার ধারে দিদিমার কোলে বসে সারা দুনিয়ার নানান দৃশ্য দেখতো।

রাস্তায় যাওয়া ওর মানা। সন্ধ্যেবেলা খেলতে যাবার জন্যে জগ্‌গূ যে সব বাহানা করতো দিদিমার কাছে তা মোটেই ধোপে টিকতো না। একবার স্কুল থেকে বাড়ী ফেরার পথে সে সোজা প্লে গ্রাউণ্ডে গিয়েছিলো। কড়ে আঙুলে চোট লাগিয়ে যখন বাড়ী ফিরলো, তখন দিদিমা ফুটবলের এক পরিভাষা দিলেন :

কাজকর্মহীন ভবঘুরে জনা কুড়ি-বাইশ নিষ্কর্মা লোক বিকেলবেলা শ্মশানের মতো একটা মাঠে জড়ো হয়। মোটা সাইজের একটা নারকেলের মতো জিনিস মাঝখানে রেখে সকলে পা দিয়ে ধাক্কা মারে। আশ্চর্যের কথা যে এই অদ্ভুত খেলার আনন্দ উপভোগ করতে হাজার লোকের ভীড় জমে। ওদের লজ্জাও করে না।

বাড়ী থেকে জগ্‌গূকে যখন বেরোতেই দেওয়া হয় না ওর সাংসারিক জ্ঞান হবে কি করে? একদিন— তখন ওর বছর পনোরো বয়স,

নাইনথ ক্লাশে ফেল করে আবার পড়ছে— জগ্‌গূকে ওর মাস্টারমশাই পোস্টঅফিসে পাঠান মনিঅর্ডার করতে। মনিঅর্ডার কি করে করতে হয় মগজেই এলো না। পোস্টঅফিসে কাকে পয়সা দিতে হবে? ও স্কুলের বাইরে করবী গাছের তলায় মনমরা হয়ে বসেছিলো।

সুন্দরম ক্লাশ পালিয়ে সার্টের তলায় বইপত্তর লুকিয়ে যখন বাড়ী ফিরছিলো তখন জগ্‌গূর ঐ অবস্থা দেখে বলে, 'বাড়ী গিয়ে ছোট ভাইকে পাঠিয়ে দেবো।' বলেই ও হেসে ফেলে। ঠাট্টা করলে কি হবে? ও বাড়ী ফিরে সত্যিসত্যিই ছোট ভাইকে পাঠিয়ে দিয়েছিলো। ছোট হলেও শেষ পর্যন্ত মনিঅর্ডারটা ও-ই করেছিলো।

এতে জগন্নাথন যে একটু অপমানিত বোধ করে নি তা নয়। কিন্তু 'ঐ তিনজন' তার এই অসহায় ভাবকে তার মধ্যে শেকড় গেড়ে বসতে দেয় নি।

'ওরা তো গরীবের ছেলে··· কোনো উপায় নেই বলেই সব কাজ নিজেদের করতে হয়। আর তুমি রাজার ছেলে। বাইরে পা না বাড়ালেও তোমার কাজ ঠিকই হয়ে যাবে।' মা বলেন।

'এখন তো ব্যাপারই আলাদা··· শেষ সময় এসেছে তো? তাই দিনও পালটে গেছে, পুরোনো আদব-কায়দাও বদলে গেছে। ঐ সব দিনের কথা যখন মনে হয় তখন ভাবি, আজকাল নিজেদের যে মানুষ বলে গণ্য করি তাই যথেষ্ট। আমার শাশুড়ী বলতেন যে তোমার দাদামশাই যখন স্কুল ফাইনালে পড়েন তখনও পর্যন্ত বেড়াতে, খেলতে, স্কুলে পৌঁছে দিতে, বিকেলবেলা কোলে করে বাড়ী নিয়ে আসার জন্যে একটা চাকর ছিলো।' দিদিমা বলেন।

'আর একটা কথা রাজম্মা···, ওদের ছেলেপুলেরা··· পেটভরে খেতে পায় না, ওদের কেবল হাড় গিলগিলে দেখায়। আমাদের ছেলের

সুন্দর স্বাস্থ্য, গোলগাল চেহারা আর হাসিখুশী দেখে ওদের হিংসে হয়। ছেলের আবার নজর না লেগে যায়।' ছোট দিদিমা বলেন।

'আমাদের কুলের প্রদীপ' এই কথা বলে ওকে খুব আদর যত্নে ওঁরা মানুষ করেছেন। কিন্তু সেই কুলের প্রদীপকে বড় করার জন্যে ওঁরা যেভাবে মাখন, মালাই আর চাল খাওয়াতে লাগলেন, তাতে উপকারের চেয়ে অপকারই বেশি হয়েছে। একজায়গায় বেঁধে রাখলেও টিয়াপাখীরা চারদিকে ওড়ার চেষ্টা করতো। শুধু মিষ্টি পেয়ারা খেয়ে সন্তুষ্ট নয়: ডানাকাটা টিয়াপাখীদের উড়তে সাহায্য করা উচিত, খাওয়ানো উচিত, বাসা না থাকলে বাসা বেঁধে দেওয়া উচিত··· এই সব সমস্যার সমাধান খুঁজতে খুঁজতে ওর বড় বড় চোখ আরো যেন বড় হয়ে যায়।

'আরে বাপরে! কত চাল দিয়েছে··· হতভাগা নাগাম্মার তো একটু আক্কেল থাকা উচিত?··· ছোট ছেলে ও কি বুঝবে? যতটা চাল দিলো, সবটাই থলিতে পুরে ফেলেছে··· আচ্ছা দাঁড়া, পুলিশ ডেকে তোকে উচিত শিক্ষা দিচ্ছি।' শেষবেশ ভিখিরীটা গেল আর দিদিমা অন্য কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন··· কিন্তু ঐ দৃশ্যটা ছোট জগন্নাথনের স্মৃতিতে চিরকাল গাঁথা হয়ে রইলো।

বেচারী··· ভিখিরী··· বুড়ী আবার অসুস্থ··· তার আপন বলতে কেউ নেই··· চোখ, হাত-পা সবই গেছে— তাকে যদি দু'মুঠো চাল বেশি দিয়ে থাকে, তাতে কি এসে যায়। দু-একদিন আগেই তো এক বস্তা চাল এসেছে।

একদিন ছোট দিদিমা বলেন, 'দেখ রাজম্মা।··· তোমার ছেলেকে আর আমরা সামলাতে পারছি না।··· আমরা বড়দের কথা বিনা তর্কে মেনে নিয়েছি, বড়দের শ্রদ্ধা-ভক্তি করেই দিন কাটিয়েছি।

বাড়ীতে যে সব চাকর কাজ করতো, বাড়ীতে কি রান্না হয়েছে যাতে জানতে না পারে, তারজন্যে তাদের কিছু দেখতে দেওয়া হ'তো না। এ নয় যে দেবার ক্ষমতা নেই···। চাকরবাকরদের নজর ভালো নয়··· নজর লাগলেই বিছানা নিতে হয়। এরকম আমি অনেক দেখেছি। এখন দেখো তোমার সুপুত্তুর কি কাণ্ড করেছে।'

সেই কাণ্ডটা হ'লো এই:

দিদিমা অড়হর ডালের চাটনি বাটছিলেন।

'দিদিমা! আমায় একটু দাও,' এই বলে সে হাত পেতে দেয়। দিদিমা সেই আধো-বাটা চাটনি একটু ওর হাতে দেন। সেই চাটনি চাটতে চাটতে যখন পাশের ঘরে যায়, তখন ঝি চিট্টেম্মা ঐ ঘর ঝাঁট দিচ্ছিলো। তার শাড়ীর আঁচল ধ'রে তার ছোট মেয়ে গৌরী ঘুরছিলো। জগ্‌গূকে দেখে হেসে ফেলে। ওর হাসি জগ্‌গূর ভালো লাগে। একটু চাটনি গৌরীর হাতে দিয়ে বলে, 'খেয়ে দেখ, কেমন চমৎকার চাটনি হয়েছে··· আর একটু নিয়ে আসবো?' দুজনে একসঙ্গে খায়, জগ্‌গূর বেশ মজা লাগে।

'দাঁড়াও, দাদাবাবু! মা যেন দেখে না ফেলেন,' চিট্টেম্মা বলে। আর তাই হ'লোও। কিছুই মার নজর এড়ালো না।

কেন? এটা কি ভুল কাজ?··· খেতে বসার সময় অনেকটা করে চাটনি নিয়ে নিজেদের খেতে বসতে দেখেছে জগ্‌গূ। মেয়েটার হাতে যদি একটু চাটনি দিয়ে থাকি, তা কি দোষের?

এ সব প্রশ্ন তার চোখে। ভাষায় ব্যক্ত করে না। তাই প্রশ্নের উত্তরও পায় না।

ও যখন ক্লাশ সেভেনে পড়ে তখন একটা ঘটনা ঘটেছিলো সেটা ও কোনোদিন ভুলতে পারবে না।

হঠাৎ ওর জ্বর হল। আর ঐ তিনজন যা কষ্ট করেছে তা বলার নয়। অনেক কিছু বেটে বুটে খাওয়ালো। কপালে ঠাকুরের ভস্ম লাগালো। মন্তরটন্তর করলো। মাদুলী পরালো। কিন্তু ওকে সবচেয়ে বেশি আরাম দিয়েছিলো সামনের বাড়ীর সত্যম, জগ্‌গূর স্কুলের সহপাঠী। সে কিছুই করতো না, শুধু খানিকক্ষণ তার কাছে বসে থাকতো। শরীর কেমন আছে, কি পথ্য করছো, কিছুই প্রশ্ন করতো না। যতক্ষণ বসে থাকতো··· এধার ওধারের গল্প করতো··· স্কুলে নতুন মাস্টারমশাই এসেছেন, প্রথম যেদিন স্কুলে আসেন, কোনো একটা ছেলে নাকি সাইকেলের হাওয়া বার করে দেয়··· স্কুল থেকে ফেরার পথে একদিন একটা দু পয়সা কুড়িয়ে পায়··· ওর বড় ভায়ের সে কথা বিশ্বাস হয় না। তাই ওকে একটা চড় মারে··· পড়শী রাধার বাড়ী নতুন রেডিও যেটা কেনা হয়েছে সেটা দুদিন পরেই খারাপ হয়ে গেছে··· ওদের বাড়ীতে কোথা থেকে একটা বাদামী রঙের বেড়াল এসেছে, তার তিনটে বাচ্চা হয়েছে··· এই ধরনের নানা গল্প ও করে যেতো। এতে কতটা সত্যি, কতটা মিথ্যে, বলা কঠিন··· কিন্তু যতক্ষণ এই সব কথা শোনাতো ততক্ষণ জগ্‌গূ জ্বর, জ্বালা-যন্ত্রণা সব ভুলে থাকতো। এই সূত্রে তাদের বন্ধুত্ব আরো বেড়ে গেলো। জগ্‌গূ সেই প্রথম বুঝতে পেরেছিলো স্নেহ কত মধুর। সুস্থ হয়ে দুজনে একসঙ্গে স্কুলে যাতায়াত করতে লাগলো।

একবার তিনদিন সত্যমের দেখা নেই। তিনদিন দেখা না হওয়ায় জগ্‌গূ একদিন সত্যমের বাড়ী যাবার জন্যে তৈরী। দিদিমা ওকে বাড়ীর ভেতরে বন্ধ করে শেকল তুলে দেন।

'বাবা আমার! আমরা বাড়ীতে কি করতে আছি? আমাদের

বলা-কওয়া নেই, এভাবে বাইরে যাওয়াটা ঠিক নয়। ছোট-বড় ভালো-মন্দ সব বিবেচনা করে কাজ করা উচিত। যদি তোর কিছু হয়ে যায়, তবে তোর মুখ চেয়ে যারা বেঁচে আছে তাদের কি হবে? যে বাড়ীতে বসন্ত হয়েছে না জিজ্ঞেস করে তুই তাদের বাড়ী যাচ্ছিস?' জগ্‌গূর মাথায় কিছুই ঢোকে না। ও গিয়ে মাকে জিজ্ঞেস করে।

'হ্যাঁ বাবা, সত্যনারায়ণের বসন্ত হয়েছে। এ অসুখটা বড় ছোঁয়াচে। ছোঁয়াচে অসুখ বিসুখ শুনলে যেতে নেই।'

জগ্‌গূর বুক কেঁপে ওঠে। চোখে জল এসে যায়।

'তা হলে আমি ওখানে গিয়ে ওর সঙ্গে দেখা করতে পারবো না?'

'দেখা করতে কেন পারবে না। ও সেরে স্নান করে উঠলে নিশ্চয়ই দেখা করবে। তার আগে ওদিকে যেও না, বুঝলে? আমার মাথার দিব্যি। শুনেছি খুব বেরিয়েছে।'

এর পর আট-দশদিন জগন্নাথন নাওয়া খাওয়া করে নি, ঠিকমত ঘুমোতেও পারে নি। সব সময় সত্যমের কথা ভেবেছে। একবার যদি তাকে যেতে দিতো! জানলার কাছ থেকেই সত্যমকে জিজ্ঞেস করে আসতো, 'ভাই, কেমন আছো? আমি জগন্নাথন, আমার দিকে তাকাও। শরীর এখন কেমন, স্নান কবে করবে? আমরা দু'জনে হাত ধরাধরি করে কবে আবার স্কুলে যাবো?'

মার কথা ঠিক বিশ্বাস না হওয়ায় সায়েন্সের টিচারকে জিজ্ঞেস করে। 'একেবারে সত্যি কথা বলেছেন, জগন্নাথন! স্মল পক্স খুব সাংঘাতিক জিনিস। মার কথা অগ্রাহ্য কোরো না— তাতেই তোমার ভালো হবে।'

শেষ আশাটাও ত্যাগ করলো। সদর দরজায় দাঁড়িয়ে থাকে।

ওদের বাড়ী থেকে যে বেরোয় তাকেই জিজ্ঞেস করে, 'সত্যম কেমন আছে? এখনি কি আমি দেখা করতে পারি?'

জগন্নাথনকে আর বেশিদিন এ রকম জিজ্ঞাসাবাদ করতে হ'লো না। 'জন্মিলে মরিতে হবে' এই কথার সত্যতা সত্যম শিশুবয়সেই প্রমাণ করেছিলো।

জগন্নাথন ভাবে ও ভীষণ অন্যায় করেছে। এ অন্যায়ের কোনো প্রতিকার নেই। মা, মাস্টারমশাই, এমন কি, বিধাতা এসে মানা করলেও তার সত্যমকে দেখতে যাওয়া উচিত ছিলো, এই চিন্তায় বেশ কিছু দিন ও জর্জরিত হয়ে রইলো। 'সত্যম! তুমি আমায় ক্ষমা করবে?' বলেই সে ডুকরে কেঁদে উঠতো। দুর্বলচিত্ত লোকেদের এই ধরনের চিন্তা আরো বেশি পীড়া দেয়। তার যে চোখ সবসময় বিস্ফারিত হয়ে থাকতো, আজ এই অকর্মণ্যতার জন্যে সঙ্কুচিত হয়ে গেছে। ছেলেবেলা থেকেই সে কোনোদিন কিছু চাওয়া দরকার বোধ করে নি; মুখের ওপর কারুর কথার প্রতিবাদ করে উত্তর দিতে শেখে নি। এই সব কথাগুলো মনের মধ্যে জট পাকিয়ে ওর মনকে উত্তেজিত করে তোলে। মনে অশান্তির ঝড় ওঠে।

স্কুল ফাইনালে উঠতে উঠতে জগন্নাথন এমন কয়েকটা কাজ করেছিলো যা' বাড়ীর লোকের মোটেই পছন্দ হয় নি। অথচ সেগুলো না করে ও মনে স্বস্তি পায় নি। বাড়ী থেকে নিজের স্কুলের মাইনে নিয়ে গিয়ে গোপালম বলে একটি গরীব ছেলের নামে টাকা জমা করে দিয়েছিলো। বাজার থেকে জিনিসপত্র আনার জন্যে যে চাকরটা ছিলো তাকে ছুটি দিয়ে দিয়েছিলো। রোজের মতো সেদিনও খেলতে যাবে বলে তৈরী। মা, দিদিমা ও ওর বোন এই দেখে মাথা খুঁড়তে থাকে। জগন্নাথনকে কিছু বলার

ক্ষমতা তাদের ছিলো না। ওর মৌন থাকাটাই ওর কবচ হয়ে দাঁড়ায়।

মিথ্যে অভিমানের ভয়ঙ্কর বন্ধন ভেঙে ও যখন বাইরে বেরিয়ে এলো তখন অনেক কিছুই দেখতে পেলো। বুঝতে শিখলো কি বিরাট সংসার। ওর দৃষ্টির প্রসারতা বাড়লো। সেই সময় স্কুলে ওকে সবচেয়ে বেশি আকর্ষণ করতো কামেশম। সে এক অদ্ভুত ঘটনা।

একবার ক্লাসে কামেশম চীৎকার করে তার সতীর্থদের এক লেকচার দিচ্ছিলো। ঘরের মধ্যে জগন্নাথনকে ঢুকতে দেখে লেকচার থামিয়ে দিয়ে বললো, 'এই কথাটা ঐ আঠারো বছরের খোকাকে বোলো না ; ভয়ে, আতঙ্কে ও অসুখে পড়বে।' কামেশমের এই কথা শুনে জগন্নাথনের দিকে তাকিয়ে সবাই হেসে উঠেছিলো। অহেতুক এই ঠাট্টায় ও আঘাত পায়। জিজ্ঞেস করার সাহস হয় নি, তাই চুপ করেছিলো। ওর অবস্থা বুঝতে পেরে ওর এক সহপাঠী ওকে সব কথা খুলে বলে।

গতরাতে কামেশমের সামনের বাড়ীতে চুরি হয়েছে। কামেশমের ঘুম ভেঙে যেতে ও চোরের পিছু নিয়ে ধরে ফেলে। ওর মা এ কথা শুনে ভীষণ ভয় পেয়ে যান। কপাল চাপড়াতে থাকেন। 'বাছা ! আমাদের বাড়ীতে নয়··· আমাদের লোকেদের নয়··· তুমি তো ছোট ছেলে··· চোরেদের কাছে ছুরি থাকে, এ রকম বিপদজনক কাজে কেন মাথা গলাও ?'

'পুরুষ মানুষ বলেই করেছি।'

'কি বললি, আবার বল।' পেছন থেকে তার বাবা ধমকে ওঠেন।

'একবার নয়, একশোবার বলবো। আমি পুরুষমানুষ।'

ওর বাবা এক চড় কষিয়ে বললেন, 'আবার বলবি!' কিন্তু কামেশম হার মানে নি। শেষ পর্যন্ত ওকে মারতে মারতে ওর বাবাই ক্লান্ত হয়ে পড়েন। ওর মা বলেন, 'কি একগুঁয়ে বাবা। এতো তো মার খেলি, কিন্তু চোখ দিয়ে একফোঁটা জলও বেরুলো না।'

'কেন জানো, আমি পুরুষ মানুষ।' কামেশম জবাব দেয়।

জগন্নাথন মনে মনে বলে, 'একেবারে খাঁটি কথা।' বাপঠাকুর্দার পয়সায় আনন্দ করে, পায়ের ওপর পা দিয়ে বসে, অনায়াসলভ্য ভাগ্যের জন্যে নিজেকে ভুলে, অপরের দুঃখকষ্ট ও মৃত্যুতে এতোটুকু বিচলিত না হয়ে, নিজের জীবনকেই জীবনের সর্বস্ব মনে ক'রে ক্ষণস্থায়ী কূপমণ্ডূকের মতো জীবিত থাকার লোক তো অনেকই আছে। কিন্তু সত্যিকারের যে পুরুষ কামেশম, সে প্রতিবেশী বাচ্চার খিদে দেখে বিচলিত হয়ে পড়ে। সামনের বাড়ীতে চুরি হবার খবরে ছুটে যায়।

কামেশমের সারা দেহে প্রহারের দাগ দেখে সবাই অবাক হয়ে যায়।

'কামেশম! তোমার বাবার কি এতটুকু বোধ নেই? ছেলেকে এইভাবে কেউ মারে?'

কামেশম গর্বে ও হাসিতে ফেটে পড়ে।

'আরে মার খেয়েছি তো কি হয়েছে। আজ দাগ পড়েছে, কাল মিলিয়ে যাবে। এমন কাজ করা চাই যা লোকে কিছুকাল মনে রাখবে। ...চোখের সামনে কোনো অন্যায় ঘটছে দেখে যদি আমরা চুপ করে থাকি তা হলে তো মানুষ আর জন্তুতে কোনো

তফাৎই থাকে না··· আমাদের এমন কাজ করতে হবে যা আমাদের মানুষ করে তোলে··· ?'

জগন্নাথনের শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠে।

'কামেশম, আমাকেও তোমার দলে নিয়ে নাও না ?' সাহস করে এই কথা যে বলতে পেরেছে তা ভেবেই জগন্নাথন সারাটা দিন আনন্দে বিভোর হয়ে থাকে। তার এই উৎসাহ-উদ্দীপনা কতটা সত্যি তা পরখ করার দিনও শিগগিরই এসে গেলো।

আসলে ব্যাপারটা ছিলো এই :

গ্রামে সবাইয়ের বাড়ীতে যে জল দিতো সেই সুব্বয়া হঠাৎ মারা গেলো। যা পেত তাতেই ও সন্তুষ্ট থাকতো। দিনরাত যার যতটুকু দরকার তার সাহায্যে সুব্বয়া সবসময় হাজির থাকতো। অথচ চারদিনের জ্বরে মারা গেলো।

প্রত্যেক ব্রাহ্মণ পরিবারে ওর যে অতো খাতির তারও একটা কারণ ছিলো। ওর চেনা-পরিচিত কোনো বাড়ীতে যদি কারুর অসুখ হ'তো, তা হলে অষ্টপ্রহর ও রুগীর সেবা-শুশ্রূষায় কাটিয়ে দিতো। যে সব ছোঁয়াচে রোগে মা-বোন ও অতি নিকটজনও কাছে যেতে ভয় পেতো, সুব্বয়া সেখানেও নির্ভীকচিত্তে সেবা করতো। জলওয়ালা সুব্বয়া আস্তে আস্তে পরোপকারী সুব্বয়া নামে পরিচিত হয়ে উঠলো। পরসেবায় অক্ষয় হয়ে ও পরলোকে চলে গেলো।

ঐ সুব্বয়া কামেশমের বাড়ীতেও জল দিতো।

একদিন সুব্বয়ার মা ভেঙ্কম্মাকে নিজের মার সঙ্গে কথা বলতে দেখে কামেশম আশ্চর্য হয়ে যায়। গতকাল দুপুরেই তো নিজের ছেলেকে ভগবানের হাতে সঁপে দিয়ে এসেছে। এই অবস্থায় অন্য

লোকেদেরই তাকে তার বাড়ীতে গিয়ে সান্ত্বনা দিয়ে আসার কথা। কিন্তু একি? মাকে দেখেই ভেঙ্কম্মা কেঁদে ওঠে। মা ওকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, 'আর কেঁদো না ভেঙ্কম্মা! তুমি কি করবে বলো? এই বুড়ো বয়সে তোমার কপালে এই দুঃখ ছিলো··· আমাদের হাতে আর কি আছে?'.

'সে কথা বলছি না অন্নপূর্ণাম্মা! গ্রামে কারুর মৃত্যু হ'লে সে এগিয়ে গিয়ে শেষ কাজের সব ব্যবস্থা করতো··· মা বাপকে সান্ত্বনা দিয়ে ধৈর্য ধরতে ব'লে তাদের কোল থেকে মৃত ছেলেকে শ্মশানে নিয়ে গেছে। সে সব আজও ছবির মতো চোখের সামনে ভাসছে। না জানি কত অনাথেরই অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সে করেছে··· আমার এমনই পোড়া কপাল যে আমি মরলাম না, সে চলে গেল··· ওকে সবায়ের দরকার হ'তো··· কিন্তু আজ ওর দরকারে কেউ আসে না··· ওর লাশ নিয়ে যাবার জন্যে কেউ আসে নি··· আমি একা বুড়ী মানুষ, কি করবো দিদি।'

ভেঙ্কম্মা আবার ডুকরে কেঁদে ওঠে। মা ওর হাতে দুটো টাকা দিলো। ভেঙ্কম্মা যখন ফিরে যাচ্ছে তখন বাইরে কামেশমের সঙ্গে দেখা।

'বাবা আমায় কলম কেনার জন্যে দু'টাকা দিয়েছে। আমার কলমের এমন কোনো দরকার নেই। কলম না থাকে পেন্সিলে লিখবো··· মাস্টারমশাই যদি মারেন তো মারুন··· এটুকু মার খেলে আমি মরে যাবো না··· এই নাও ঠাকুমা, এ দুটোও রাখো, কোনো কাজে লাগবে।'

ভেঙ্কম্মার চোখে জল ভরে আসে।

'না বাবা! মা দিয়েছেন ব'লে এটা নিয়েছি। আমার টাকা নিয়ে

কি হবে। কাল বেলা দুটোর সময় মারা গেছে··· এখনও পর্যন্ত তার দাহ হয় নি··· এই গাঁয়ে সবসুদ্ধ দুশো ব্রাহ্মণ পরিবার আছে··· দূর থেকে সবাই চোখের জল ফেলে চলে গেলো, দাহের ব্যবস্থার কথা একবার কেউ চিন্তাও করলো না,··· আমি একা বুড়ী মানুষ, ··· আমার দ্বারা কিছুই সম্ভব নয়। বাবা! কামেশম।'

কামেশমের মার কথা মনে পড়ে যায়।

'আমাদের হাতে কি বা করার আছে?'

কামেশম নিজের দুটো হাতের দিকে ভালো করে দেখে। জামার হাত গুটিয়ে বাহুপেশী দেখে। রক্ত গরম হয়ে ওঠে।

'আমাদের মনে যদি কিছু থাকে তো হাতে সব আছে।' তার চোখ দুটো জ্বল জ্বল করে ওঠে।

'ঠাকুমা! মুনি ঋষিদের মতো মিউনিসিপ্যালিটির লোকেরা এসে তোমার ছেলের লাশ নিয়ে যাবে, এ অপযশ এই গ্রামের আমি হতে দেবো না··· চলো, আমি সঙ্গে যাচ্ছি···'

এই সময় কামেশমের মুখের ভাব ও চলার ভঙ্গি দেখে সংসারে অভিজ্ঞ বিচক্ষণ ব্যক্তিরাও প্রভাবিত না হয়ে পারলো না। সামনে ভেঙ্কম্মাও পেছনে কামেশমকে যেতে দেখে ওর বন্ধু-বান্ধবেরা বিনা বাক্যব্যয়ে ওর পেছু পেছু চলতে থাকে। ঠাণ্ডা হাওয়ার হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্যে কানেতে স্কার্ফ বেঁধে জানলা দিয়ে জগন্নাথন দেখছিলো। কামেশমকে দেখতে পেয়ে জগন্নাথন স্কার্ফটা ফেলে দিলো, শুধু স্কার্ফই নয়; নিজের অকর্মণ্যতা ও কাপুরুষতা সবই ও জলাঞ্জলি দিলো। সেই সময় ও যে শুধু মানুষই ছিলো তা নয় মনীষীও। হ্যাঁ, ঠিক সেই সময় পোকার খোলস ছেড়ে রঙবেরঙের পালকের ছটা মেলে প্রজাপতির মতো সেও নিজের জড়তা আর

অন্ধকারকে কাটিয়ে ওঠে। হ্যাঁ ঠিক সময়··· হ্যাঁ তখনই অমাবস্যার অন্ধকার ভেদ করে দেওয়ালীর শোভা ফুটে ওঠে।

পাছে সে পেছনে পড়ে যায় সেই ভয়ে ছুটে গিয়ে শুধু দলেই যোগ দিলো না, সোজা কামেশমের কাছে গিয়ে তার হাত ধরে দাঁড়ালো।

তখন ছেলেদের একবারেরও জন্যে এই চিন্তা মনে আসে নি যে বড়রা কি বলবে। তার চেয়ে আশ্চর্য ব্যাপার যে ছোটদের বকবার খেয়াল বড়দের হ'লো না। তখন নিজেদের চিন্তা নিয়ে তাঁরা ব্যস্ত—

'আমার মা-বাবা এখনও জীবিত··· আমার শ্মশানে যাওয়া চলবে না।'

'কাল অবধি আমার জ্বর ছিলো, আমার তো ভয় করছে।'

'আমার ঘরে যে অশৌচ চলছে, না হলে নিশ্চয়ই যেতাম।'

'আমার স্ত্রী অন্তঃসত্ত্বা, লোকে বলে আমার শ্মশানে যাওয়া উচিত নয়।'

এই ধরনের নানা রকমের ছুতো করে যারা পাশ কাটিয়েছিলো তারাই এখন এগিয়ে এসে 'আমি কাঁধ দেবো, আমি কাঁধ দেবো' বলে রব তোলে।

সুব্বয়ার শবযাত্রা··· ঠাকুরের শোভাযাত্রার মতো ধূমধাম করে এগুতে থাকে।

শবদেহে কাঁধ দিয়ে কামেশম যে কথাগুলো বলছিলো তা জগন্নাথন জীবনভোর মনে রাখবে :

'আমরা বড়াই ক'রে বেড়াই যে আমরা খুব মহৎ কাজ করি··· যখন সত্যি এই ধরনের কাজের দায়িত্ব এসে পড়ে তখন দূরে

পালাই··· এই ধরনের জীবন জীবনই নয়, মৃত্যুর সমান। আমাদের শুভকাজের যে সঙ্কল্প তা আজ এখানেই হওয়া উচিত। আমরা যে ব্রতের ব্রতী তার মহারম্ভ আজ এখান থেকেই হোক। আমরা সবাই এই মৃতদেহ একবার করে কাঁধে নেবো।' এই ব'লে সবায়ের কাঁধে সে মৃতদেহ রাখলো। যে বাচ্চারা ছোট, তারা মৃতদেহের তলা দিয়ে ছুটোছুটি করতে থাকে।

জগন্নাথন জগ্‌গূকে আরো কাছে টেনে নেয়। কপালে হাত ঠেকিয়ে নমস্কার করে।

'ঠাকুরের পাল্কী তো চলে গেছে দাদু।' নাতি একটু অবাক হয়ে বলে।

'না··· না···' দাদু বিড়বিড় করতে থাকে। সমস্ত মুখে বড় বড় চোখ দুটোর জ্যোতি দেখে জগ্‌গূ কিছু বুঝতে পারে না।

সে দাদুর গলা জড়িয়ে ধরে।

যন্ত্রজীবী

জেনারেল হসপিটালের মরচুয়ারীতে অটপ্‌সী চলছে। পাথলজীর প্রফেসর শ্রীধর নিপুণ হাতে বডি ডিসেক্ট করছিলেন। যে সমস্ত উল্লেখযোগ্য অংশ তাঁর চোখে পড়ছে তা তিনি সমবেত ছাত্রদের উৎসাহের সঙ্গে বুঝিয়ে দিচ্ছেন। সেদিন যে ছাত্রীটি এ্যাসিসট্যাণ্টের কাজ করছিলো, সে দ্রুত নোট করে যাচ্ছিলো।

'দেখো, এ্যান্টিবায়টিক এ্যারায় সিফিলিস 'এ রকমভাবে শেকড় গাড়তে খুব কমই দেখা যায়। এর আগে এ রকম কোনো কেস চোখে পড়ে নি। কিডনিটায় দেখো, কেমন প্যাসেচ হয়ে গেছে! তোমরা 'ফিল' করে দেখো, এখানে কন্‌সিস্‌টেন্সিটা কত 'ফার্ম'··· আই সে ইট ইজ উড হার্ড··· এই নাও লিভার··· ব্রেন···ইউটেরস··· ইউ ফিল দি লিঙ্ক গ্ল্যাণ্ডস হেয়ার··· টিপিক্যাল হিট এ্যাপিয়ারেন্স··· হোয়াট এ ওয়াণ্ডারফুল টারশিয়রী স্টেজ ইট ইজ···।'

আর এক ঘণ্টার মধ্যেই অটপ্‌সী শেষ হ'লো। লাশের দেহ থেকে যে অংশগুলো খুব সাবধানে কেটে নেওয়া হয়েছিলো, সেগুলোকে বাক্সের মধ্যে ভালো করে রেখে মিউজিয়ামে এ্যারেঞ্জ করার কথা এ্যাসিসট্যাণ্টকে বলে প্রফেসর শ্রীধর ওয়াস বেশিনে হাত ধুয়ে বাইরে বেরিয়ে গেলেন।

মরচুয়ারীর বাইরে ঐ মৃত স্ত্রীলোকটির পাঁচ-ছজন আত্মীয় গাছের তলায় বসে আছে। শ্রীধর ভাবলেন ওরা বোধহয় লাশের জন্যে

বসে আছে। এখন এই ক্ষতবিক্ষত দেহটা নিয়ে গিয়ে মাটিতে পোঁতার পরই এই নিরীহ লোকগুলোর আর ঐ মৃত নারীর আত্মার শান্তি হবে। কি অদ্ভুত এরা! শরীরের আসল অংশগুলোই তো কেটে নেওয়া হয়েছে। সেগুলো মিউজিয়ামে সংরক্ষিত থাকবে। শুধু শুধু এই সারহীন শরীরটাকে নিয়ে গিয়ে ওরা অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া করবে।

শ্রীধরের ভগবানে বিশ্বাস নেই। অন্ধবিশ্বাসকে তিনি ধারে কাছে ঘেঁষতে দেন না। পুরোনো রীতিনীতি ও ব্যবস্থা ওঁকে এতটুকুও স্পর্শ করে না। আমরা যাকে এ্যাটাচমেণ্ট বলি, তিনি ও সবের ধার ধারেন না।

নিজের ঘরে গিয়ে হাতমুখ ধুয়ে খাবার জন্যে যেই টিফিনকেরিয়ার খুলতে যাবেন অমনি টেবিলের ওপর টেলিফোনটা বেজে উঠলো। উঠে গিয়ে রিসিভারটা তুলে নিলেন।

ওধার থেকে ডাঃ রমার গলা ভেসে আসে— 'ডক্টর কন্‌গ্র্যাচু-লেশন।'

'কি ব্যাপার?'

'শ্রীদেবীকে একজামিন করলাম। সী ইজ প্রেগনেণ্ট। প্রাইম ভীষণ 'উইক'। ভালো খেতে দিতে হবে। আপনি বোধহয় জানেন না শ্রীদেবী আমার কাছে এসেছেন। ওঁর সন্দেহ হওয়াতে আমার কাছে একজামিন করাতে এসেছেন··· থার্ড মান্‌থ চলছে।'

শ্রীধরের কানে যেন তালা লেগে গেছে। মুহূর্তের মধ্যে নানা চিন্তা এসে ওঁর মনে আতঙ্ক সৃষ্টি করলো। রিসিভারটা হাতে কাঁপছে। 'মাই গড,' নিষ্প্রভ হ'য়ে মনে মনে বলেন।

পোর্টিকোতে গাড়ী দাঁড় করিয়ে শ্রীধর সোজা ভেতরে ঢুকে

সোফায় বসে পড়লেন। দরজায় তাঁকে স্বাগত জানাবার জন্যে শ্রীদেবী যে অপেক্ষা করছিলেন তা যেন লক্ষ্যই করলেন না।

শ্রীদেবীও অনুমান করেছিলেন যে শ্রীধর এই রকমই করবেন। একমিনিট চুপচাপ থেকে আস্তে আস্তে সোফার পেছনে গিয়ে দাঁড়ালো।

'খবরটা শুনে তুমি নিশ্চয়ই চিন্তিত হয়ে পড়েছো?'

মুখ তুলে একটা শূন্যদৃষ্টি মেলে তিনি শ্রীদেবীর দিকে তাকালেন। প্রায় সময়ই তিনি এইরকম ভাবেই তাকান। অর্থপূর্ণ দৃষ্টি নিয়ে তিনি খুব কমই তাকান।

'বোসো, বলছি।' প্রথমে স্ত্রীকে একটু খুশী করার জন্যে বলে ওঠেন।

'ঠিক আছি, বলো না।' স্ত্রী দাঁড়িয়েই উত্তর দেন।

'এ ভাবে নয়, বোসো না।'

শ্রীদেবী সামনের সোফাটায় ব'সে পড়ে ওঁর দিকে জিজ্ঞাসু নয়নে তাকায়।

'শোনো,' বলে সুরু করলেন মেডিকেল কলেজের প্রফেসর শ্রীধর, 'আমার কথা শুনে বিচলিত হ'য়ো না। পাঁচ বছর হ'লো আমাদের বিয়ে হয়েছে। দুবছর তো বিলেতেই ছিলাম। দু'বছরের মধ্যে আবার আমাকে স্টেট্‌সে যেতে হবে। এবারে ইচ্ছে ছিলো তোমাকেও সঙ্গে নিয়ে যাবো। এখনও পর্যন্ত ছেলেপুলের কোনো সখ হয় নি। আমার মনে এমন কোনো ভুল ধারণা নেই যে সন্তান হ'লেই আমাদের জীবন পূর্ণতায় ভরে যাবে আর জন্ম সার্থক হবে। এ সব ঝামেলা আমার ভালো লাগে না। এটাই আমাদের পথের কাঁটা। আমরা তো আর বুড়ো হয়ে যাই নি! একটা কথা

জিজ্ঞেস করছিলাম, তুমি কি চাও আমাদের এই 'হ্যাপিনেস' শেষ হয়ে যাক ?'

শ্রীদেবী দীর্ঘশ্বাস অনেক কষ্টে চেপে গেলো। কথা শুনে মনে দুটো প্রশ্ন জাগে। প্রথম প্রশ্ন : 'হ্যাপিনেস' কাকে বলে ?' দ্বিতীয় : 'এখন এ সব কথা তোলার কি মানে হয়, যখন সব কিছুই হাতের বাইরে ?'

'সবই তো শুনলে' এইরকম চোখে মুখে ভাব নিয়ে স্ত্রীর দিকে তাকালেন। শেষে বললেন, 'এখন বলো, তুমি কি ঠিক করলে ?' জোর করে মুখে একটু হাসি টেনে এনে স্ত্রী বলল, 'তুমিও বেশ অদ্ভুত লোক যা হোক, এতে আমার বলার কি আছে ?'

'বলার কিছু নেই ?' নিরাশ হয়ে পড়েন প্রফেসর।

'না।'

'আমি ভাবতেও পারি নি এতো তাড়াতাড়ি এই বিপদ এসে পড়বে।' হাত কচলাতে কচলাতে প্রফেসর নিজের মনে বলে ওঠেন। এই রকম এক অদ্ভুত পরিস্থিতিতেও নিজের হাসি চেপে রেখে শ্রীদেবী উঠে গিয়ে শ্রীধরের কাছে গিয়ে বসলো। একটু সমীহ করে শ্রীধরের কাঁধে হাত রেখে বলে, 'শোনো।'

শ্রীধর স্ত্রীর মুখের দিকে তাকান। সেই ভাবলেশহীন দৃষ্টি ও নিশ্চল কণ্ঠস্বর : 'শ্রীদেবী ! এই মায়ামমতা, এই চেষ্টাপ্রচেষ্টা আমার স্বভাববিরুদ্ধ। আমার জীবনটা আমার স্বভাবের অনুকূল হওয়া চাই। আমি যা কিছু চাই, যেভাবে থাকতে চাই, আমার জীবনে আমি সেটাকেই বড় ক'রে দেখি। আকস্মিক ঘটনা, বা অবাঞ্ছিত বন্ধন আমি ভালোবাসি না। তুমি আমাকে জানো। বিরহ-মিলন, একের প্রতি অন্যের অনুরাগ, প্রেমের আকস্মিক

বিস্ফোরণ, অণুতে অণু, রক্তয় রক্ত ইত্যাদি দুর্বল চিন্তার শিকড় গেড়ে এগিয়ে গিয়ে জীবনে বিকাশের পথকে রোধ করা— এ সব আমার মোটেই পছন্দ নয়। জগতের এটাই সবচেয়ে বড় দুর্বলতা। যুগটা যন্ত্রের, বিজ্ঞান বিপ্লব এনেছে জীবনে, মানুষের বুদ্ধি রবারের মতো নমনীয় হবে, দড়ির মতো টানলে ছিঁড়ে যাবে না।'

অনেক চেষ্টা করেও শ্রীদেবী চোখের জল সামলাতে পারলো না। চোখের জল গড়িয়ে পড়তে লাগলো।

'যারা কাঁদে তাদের আমার বড় অদ্ভুত লাগে।'

'তোমার কঠিন হৃদয়,' একটু রেগে উঠে রুদ্ধকণ্ঠে শ্রীদেবী বলে ওঠে।

'বোধহয় ঠিকই বলেছো।' তিনি উঠে পড়লেন। বাড়ী ফিরে কাপড়-চোপড় ছাড়া হয় নি। রোজকার মতো আজ কফিও খাওয়া হয় নি। আস্তে আস্তে করিডরে গিয়ে একটা সিগারেট ধরিয়ে বাইরের দিকে তাকালেন।

'কঠোরতাই বোধহয় আমার ভালো করেছে। হয় তো এর জন্যেই এতো কম বয়সে প্রফেসর হতে পেরেছি। প্রেমের উন্মাদনাকে যদি কঠোরভাবে দমন করতে না পারতাম তবে এতো দিনে হয়ত আমি গ্র্যাজুয়েটই থেকে যেতাম। এটা যে সত্যি তা তুমি জানো।'

শ্রীদেবী কোনো জবাব দেয় না। নিস্তব্ধতার বুক চিরে তার কান্নার হাল্কা আওয়াজ ভেসে আসে।

শীতের দিন। ঠাণ্ডা দক্ষিণে হাওয়া থেকে থেকে বইছে। পৃথিবী, আকাশ অনেক আগেই ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। আস্তে আস্তে পৃথিবীর অন্ধকার নেমে এলো। প্রফেসর সাহেবের বাড়ীর সামনে বাগান থেকে গোলাপ, লিলি, মালতী, যুঁই-এর লতা থেকে একটা

সৌরভ চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। যেখানে উনি দাঁড়িয়ে ছিলেন তার একটু দূরে ইউক্যালিপটস আর কর্পূরের গাছ থেকে মৃদু একটা সুগন্ধে বাতাস ভারি হয়ে উঠছে। হায়দ্রাবাদের মোরেডপল্লী এলাকায় একটা নির্জন জায়গায় নিজের পছন্দমত তিনি বাড়ী তৈরী করেছেন। সুন্দর বাগান, সুন্দর সুন্দর রঙ বেরঙের ফুলের গুচ্ছ —সবই শ্রীদেবীর আবেগ-মধুর মনের নিরন্তর প্রচেষ্টার ফসল।

প্রফেসর শ্রীধর যত আপন ভেবে মড়ার শরীরের মাংসের টুকরো ও মাইক্রোস্কোপের সঙ্গে কথা বলতে পারেন ততটা ফুল ও গাছপালার সঙ্গে পারেন না। তাদের রূপ রস ও গন্ধ তাঁকে কোনোভাবেই আকৃষ্ট করতে পারে না। ইঁট আর সিমেণ্টের তৈরী আর মোজেক ফ্লোরিঙের ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে বাড়ীটাকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখাতে বেশ নিপুণ।

খানিকক্ষণ পরে সিগারেটটা ফেলে দিয়ে পেছন দিকে না তাকিয়ে তিনি বলতে থাকেন: 'সাধনা আমার জীবনে চরম লক্ষ্য। লক্ষ্যে পৌঁছোনোর বাধাগুলো হচ্ছে টিউমারের মতো। আমার কথা যদি শোনো তো আমরা এই বাধা সহজেই কাটিয়ে উঠতে পারি। এমন কি দেরী হয়েছে, সবে তো এক মাস না তুমাস। তাই না? তোমার শরীর তো এমনিতেই ভালো থাকে না। আমার সন্দেহ জাগছে শেষ পর্যন্ত তুমি ঠিকমত প্রসব করতে পারবে কি না। একটা ছোট্ট প্রাণের জন্যে নিজের জীবন বিপন্ন করা মিয়ার 'ফুলিশনেস'··· আমার কথা শোনো। আমাদের এই অবস্থায় আমি এটা চাই না। এখনও সময় আছে··· আমি নিজে ডাক্তার। একে রোধ করা আমার পক্ষে এমন কিছু কঠিন ব্যাপার নয়।'

এক মিনিট··· না··· এক মুহূর্তের নিস্তব্ধতা। ঠিক ভূমিকম্পের আগে ধরিত্রীকে সমুদ্র গ্রাস করে ফেলবার পূর্বমুহূর্তে আগ্নেয়গিরির

অগ্ন্যুৎপাতের আগে যেমন মুহূর্তের জন্যে সব নিগূঢ় নিস্তব্ধতায় ছেয়ে যায়··· ঠিক সেই রকম একটা থমথমে শান্তভাব, তারপরেই প্রলয়ঙ্কর।

উনি চমকে উঠলেন ; পেছনে ফিরে দেখলেন। শ্রীদেবী অজ্ঞান হয়ে মাটিতে পড়ে গেছে।

রাতের ডিম্ আলো সারা ঘরে। দেওয়ালে ঘড়ির টিক্‌টিক্ আওয়াজ। বারোটা বেজে গেছে।

শ্রীদেবীর চোখে ঘুম নেই। গলা অবধি চাদর ঢাকা দিয়ে শুয়ে শ্রীদেবী ভাবতে থাকে। সন্ধ্যেবেলার এই ঘটনার পর যখনই তার স্বামীর কথা মনে পড়ে তখনই বুক কেঁপে ওঠে। আজ তার কাছে শ্রীধর স্বামী নয়, প্রফেসর শ্রীধর ; একজন যন্ত্রজীবী। আজ রাতে চোখে ঘুম আসছে না। চোখের জলে বালিশ ভিজে উঠছে। সে জল আজ রাতে আর শুকোবে না।

আধোবোজা চোখে সে স্বামীর খাটের দিকে তাকায়। রোজকার মতো ওদিকে পাশ ফিরে শুয়ে, বোধহয় গভীর নিদ্রায় মগ্ন।

সব সময় এই রকমই হয়। এটাই ওঁর ব্যক্তিত্ব। কখনও কখনও শ্রীদেবী ভাবে যে নিজের ব্যক্তিত্বকেও শ্রীধরের মতো করে তুলবে ; কিন্তু ইচ্ছে হয় না। ওরকম ব্যক্তিত্ব নিয়ে থাকার চেয়ে যেমন আছে তেমনিই ভালো।

এখন ওর বয়স পঁয়ত্রিশের কোঠায়। দোহারা চেহারা, লম্বা, বলিষ্ঠ। সজীব দৃষ্টি কিন্তু শান্ত। সুন্দর মুখাবয়বে কোনো ক্লান্তির ছায়া পড়ে না। কালো মসৃণ চুল, একটাও পড়ে নি, একটাও পাকে নি। এই বয়সে প্রফেসর হওয়াটা বড় সহজ কথা নয়।

চোখটা ওঁর দিকে ফিরিয়ে নিয়ে শ্রীদেবী একরকম জোর করেই চোখ বুজলেন। ওঁর মা সারদাম্মা বিয়ের আগে ওকে বলেছিলেন :

'ও নিজে যেটা ভালোবাসে, সেটা সামলে রাখতে পারে না। তার মূল্যও জানে না। আমার ভয় হয় সবার কাছ থেকে ও দূরে সরে না যায়। তোমার কাছে আমার অনুরোধ, তুমি তা হতে দিও না। দেখো মা, তুমি ঐ পাথরকে ঘৃণা করো না তো?'

ও নিজের বুড়ী মাকে অভয় দেয়, তাঁর কথা মেনে নেয়।

পাপ আর পুণ্যের কথা নিয়ে যখন আলোচনা হ'তো তখন শ্রীধর বলতেন: 'পাপ আর পুণ্য— এ দুয়ের কোনো বিশেষ মূল্য আমার জীবনে নেই। জন্ম ও মৃত্যু— জীবনের প্রস্তাবনা বা উপসংহার নয়। আমি জীবনই বুঝি। জীবনটা একটা লোহার পাত্র। কাটা, ফাটা কিংবা ফুটো হ'লে চলবে না। যখন থেকে আমার জ্ঞান হয়েছে, আমি পদার্থবিদ্যায় বিশ্বাসী। এর মানে এই নয় যে আমি ব্যক্তিত্বহীন বীভৎস একটা জীব। আমার নিজের ক্ষেত্রে আমার ব্যক্তিগত রুচি, অরুচি, ইচ্ছা ও অনিচ্ছা আছে। সেগুলো কিন্তু অন্ধবিশ্বাস নয়, সেগুলো আমার মানসিক বিকাশে সাহায্য করে।

'সেগুলো কি?' ঠাট্টাচ্ছলে শ্রীদেবী প্রশ্ন করে।

'শোনো, বলছি— তোমাকে আমি চাই। এই সত্য আমি অস্বীকার করি না। এটা চিন্তা করতে আমার ভালো লাগে। এই, এই ধরনের।'

শ্রীদেবী কিছুটা বুঝতে পারলো, খানিকটা পারলো না। যতটা বুঝতে পারে তাতে ওর মনে স্বামীর জন্যে কোনো সহানুভূতি জাগে না। যা বুঝতে পারে না তার জন্যে মনে কোনো জানবার কৌতূহলও জাগে না।

শ্রীধরের জীবনে কোনো কিছুরই প্রতি বেশি আসক্তি নেই। প্রেমের জয়গানও উনি করেন না, কল্পলোকেও বিচরণ করেন না। যা তিনি চান তার জন্যে অক্লান্ত পরিশ্রম করেন। আলসেমির

কোনো স্থান নেই ওঁর জীবনে। নিজের ইপ্সিত বস্তুকে তিনি শ্রদ্ধার চোখে দেখেন। কিন্তু 'অতিমানব' তিনি নন, 'সাধারণ' মানুষ। তিনি কখনও দুঃখে কাতর হয়ে হায়, হায় করেন না, কিংবা অতি আনন্দে বিহ্বলও হয়ে পড়েন না। কান্নাকাটি, ভাবোচ্ছলতা —এ সব ওঁর কাছে হাস্যকর। জীবন মন্থন করতে পারেন, তার মধ্যে তিনি প্রবেশও করতে পারেন। নিজের অভিষ্টবস্তু তিনি পান আর তার মাধুর্যও উপভোগ করেন। কিন্তু অতীত নিয়ে তিনি মাথা ঘামান না।

শ্রীদেবী নিজেকে ওঁর সামনে কখনও মেলে ধরে নি। কোনো কিছু ভাব প্রকাশ না করে গাম্ভীর্যের সঙ্গে কাজ করে যায়। কিন্তু আজ রাতে ও বড় দুঃখী, মনের ব্যথাকে ও আজ প্রকাশ করে ফেলেছে। এটা ওদের দুজনের ব্যক্তিগত ব্যাপার। এটা মান-অভিমানের ব্যাপার নয়।

শ্রীদেবী যা অনুমান করেছিলো, তা ঠিক নয়। শ্রীধরও শুয়ে শুয়ে চিন্তা করছিলেন। অনেক ভেবেচিন্তে শেষকালে ও ঠিক করলে: 'ঠিক আছে, যা ওঁর ইচ্ছে।'

'আই এ্যাম সরি ডক্টর। দিস্ ইজ এ কেস অফ্ হাইড্রো-সেফালিস'— মিডওয়াফিরীর প্রফেসর রমা দেবী সাত মাসের পর সমস্ত ইনভেসটিগেশন করে বললেন। শ্রীধর একটু বিচলিত হলেন।

'পেনডিমেট্রি ফাইনডিংস তো খুবই ফেবারেব্‌ল্। ফীটস এখনও পর্যন্ত হেলদি। রেয়ার কেস বলতে পারেন। ট্রায়ল লেবার দিয়ে যদি কোনো লাভ না হয় তো ক্রেনিয়াটমি করে দেবো। আপনি কি বলেন?'

শ্রীধর মাথা নাড়লেন। একটু ভেবে নিয়ে বললেন, 'ট্রায়ল-লেবারের রিস্ক কেন নিচ্ছেন ডক্টর? সোজা ক্রেনিয়াটমি করে দিলে তো…'

'জানি না কেন, ডেলিভারি হতে পারে মনে হচ্ছে। শ্রীদেবীর প্রাণের কিছু ভয় নেই। আপনি সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকবেন।' রমা দেবী আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বললেন। ক্রেনিয়াটমি করে কোনো-রকমে ফীটসটাকে ডেসট্রয় করার কথা তিনি বলতে চাইতেন, কিন্তু রমা দেবী তা মানবেন না। তাই 'গুড বাই' বলে তিনি বেরিয়ে আসেন। সিগারেটের পর সিগারেট জ্বলে যায়। প্রত্যেকটা মুহূর্ত যেন দুঃসহ যন্ত্রণা।

ওঁর জীবনে এই প্রথম, সময় যেন কাটতে চায় না। এতক্ষণে উনি শ্রীদেবীর কদর বুঝতে পারেন আর বুঝতে পারেন মানুষের আর যন্ত্রের মধ্যে তফাৎ।

'হায়, হায়, আনন্দের সঙ্গে যে দুঃখকে ভোগ করতে পারে না সে দুঃখী।' ফোনটা বেজে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে রিসিভার তুলে নেন।

নরম্যাল ডেলিভারি, মেল চাইল্ড, দুজনের কনডিসানই ভালো।' রমা দেবী নিশ্চল কণ্ঠে বলেন। তিনি শ্রীধরকে অভিনন্দন জানালেন না। তাঁর কণ্ঠস্বরে লেশমাত্র অভিব্যক্তি নেই। কারণটা উনি জানেন।

'থ্যাঙ্ক ইউ ডক্টর।' ব'লে রিসিভারটা রেখে দেন শ্রীধর।

বাচ্চা লাল রঙের, হাত-পা কাঠের মত লিকলিকে। গায়ের চামড়া একেবারে ঢিলে। তালের মতো বড় মাথা; যে রকম বড় মাথা সেই রকমই বড় বড় চোখ; অদ্ভুত নাক আর মুখ …সেই শিশু ঐ ঘরে মানুষ হচ্ছে। শ্রীধর বাচ্চাটাকে যখনই দেখেন তখনই

ভাবেন ওঁর প্যাথলজি মিউজিয়ামে এ ধরনের কোনো স্পেসিমেন নেই। এই ছেলেটির বড় হওয়া দেখে শ্রীধরের আশ্চর্য লাগে। এই ধরনের বেশির ভাগ বাচ্চারাই পেটেই মারা যায়। ফীটসকে বার করার জন্য মাথাটাকে কেটে ছিন্ন ভিন্ন করতে হয়। জন্মাবার সময় বাচ্চাটার মাথা এতো বড় ছিলো না ব'লেই প্রসব করা সম্ভব হয়েছিলো। সে জন্মেছে, বড় হচ্ছে আর হাসে।

শ্রীধর জানেন, এ ধরনের বাচ্চারা বেঁচে থাকলে এক অদ্ভুত জীব হবে। উনি বাচ্চাটাকে কয়েকবার এমনভাবে দেখেন যেন ল্যাবরেটরীতে কোনো জিনিসকে মন দিয়ে দেখছেন। বাচ্চাটাকে কোনোদিন কোলে নিয়ে আদর করেন না, কখনও তার সঙ্গে কথা বলেন না। শ্রীদেবীর সঙ্গে শিশুটির বর্তমান এবং ভবিষ্যতে কি হ'তে পারে তা নিয়েও তিনি কোনো আলোচনা করলেন না।

শ্রীদেবী ওর নাম-রাখলো—"করুণ।'

বাচ্চাটার সম্বন্ধে শ্রীদেবীও কিছু কিছু জানে। ডক্টর রমা দেবী ওকে বলেছিলেন যে এটা কনজেনিট্যাল এ্যানামলি। ব্রেনে ফ্লুইড জমে গেলে এই রকম হয়।

শ্রীদেবী ভগবানে বিশ্বাস করে। পাপ, পুণ্য আর প্রারব্ধ মানে। তাই 'নিজের পাপের ফল' মনে করে মনের বেদনা মনের ভেতরেই লুকিয়ে রাখে।

মুহূর্তের জন্যেও বাচ্চাটাকে কোল থেকে নামায় না। খুব আদর করে, আদর করে কথাও বলে। কে কি করে বুঝবে ওকে যখন চুমু খায় তখন ওর দুচোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ে কেন?

স্বামীর সঙ্গে বাচ্চা সম্বন্ধে কোনো কথাই ও বলে নি। বাচ্চাকে লোককেও নিতে বলে না। স্বামীর সামনে বাচ্চাকে কখনও আদর

করে না। বাচ্চাটার সঙ্গে ও খেলা করে এটা কখনও শ্রীধর দেখে ফেলেন তা ও চাইতো না। স্বামীর সঙ্গে ওর সম্পর্ক সেই আগের মতোই রয়ে গেছে।

করুণের জন্যে অনেকগুলো খেলনা ও কিনেছে। ছোট্ট বাচ্চাদের মতো ঐ খেলনা নিয়ে ওর সঙ্গে খেলে। বাড়ীতে অতিথি এলে বাচ্চাকে তাঁদের সামনে নিয়ে যায় না। তাঁদের দেখলেই বাচ্চাকে ভেতরে নিয়ে গিয়ে লুকিয়ে রাখে। অভিমান করে নয় যদি তার বাচ্চাকে দেখে কেউ সান্ত্বনা দিতে আসে কিংবা কোনো কিছু মন্তব্য করে— যা শুনে ওর রাগ হতে পারে।

একবার করুণের জ্বর হ'লো। কষ্টে কাতরাচ্ছিলো। শ্রীদেবী ভয় পেয়ে গেল ; সঙ্গে সঙ্গে স্বামীর কাছে গিয়ে হাজির।

'খোকার জ্বর হয়েছে, একবার ওকে দেখবে ?' কাঁদতে কাঁদতে স্বামীকে বলে।

'চলো' বলে শ্রীধর এগোলেন।

খাটে বসে ওকে পরীক্ষা করে শ্রীধর বলেন, 'শ্রীদেবী, ভয় পাবার কিছু নেই, মাইল্ড ব্রঙ্কাইটিস হয়েছে। এক্ষুণি ওষুধ আনিয়ে দিচ্ছি।'

ডাক্তার যেভাবে রোগীর দেখাশোনা করে, শ্রীধর সেদিন নিজের ছেলেকেও সেইভাবেই দেখলেন।

রাত্রিতে আওয়াজ হতেই পাশ ফিরে দেখলেন। টিমে আলোয় শ্রীদেবী ছেলেকে বোতলে করে দুধ খাওয়াচ্ছে। শ্রীধর ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলেন, বারোটা বেজে গেছে। 'শ্রীদেবী ! এ কি করছো ? রাত দশটার পর আর ভোর ছটার মধ্যে 'ফিড' দিতে নেই। ওকে খাইয়ো না।'

শ্রীদেবী সঙ্গে সঙ্গে দুধ খাওয়ানো বন্ধ করে দিয়ে ছেলেকে

পাশে শুইয়ে ঘুম পাড়াবার চেষ্টা করতে লাগলো। কিন্তু বাচ্চা কাঁদতে থাকে। কাঁদতে কাঁদতে তার হেঁচকি সুরু হয়েছে। যখন আর কিছুতেই সামলাতে পারলো না তখন করুণস্বরে বললো, 'ও চুপ করবে না, দুধ খাওয়াবো?'

'রোজ এভাবেই চলে?'

'যখন কাঁদে, দুধ দি।'

'পড়াশোনা করেছ, এতো নির্বোধ কেন?'

শ্রীদেবী কোনো জবাব দিলো না। বাচ্চার কান্না এখনও থামে নি। ও তাকে করিডরে নিয়ে গিয়ে পায়চারি করতে থাকলো, স্বামীর ঘুমের যাতে ব্যাঘাত না ঘটে। দুদিন পরেই বাচ্চার জ্বর সেরে গেলো।

একদিন শ্রীদেবী ঘর থেকে হলের দিকে যাচ্ছিলো। দেখলো শ্রীধর খুব মনোযোগ দিয়ে ছেলেকে দেখছেন। শ্রীদেবী বুঝলো না শ্রীধর এতো মন দিয়ে কি দেখছেন। বোধ হয় নিজের সাবজেক্ট সম্বন্ধীয় কোনো 'স্পেসিমেন'এর গ্রস এ্যাপিয়ারেন্স দেখছেন। শ্রীদেবীর মনে হয় ওর সারা শরীরে সহস্র বৃশ্চিক দংশন করছে। পেছন থেকে চুপচাপ এসে 'খুব ঠাণ্ডা লাগছে' বলে বাচ্চার প্রায় মাথা অবধি চাদর ঢেকে দেয়।

প্রফেসরের সঙ্গে দেখা করতে মাঝে মধ্যে ওঁর বন্ধু-বান্ধবেরা আসতেন। সবাই জিজ্ঞেস করতেন: 'হোয়াট ইজ্ দিস্ শ্রীধর! তোমার ছেলেকে আমরা এখনও দেখলাম না।'

'ও হেলদি চাইল্ড নয়। হাইড্রোসেফ্যালাস নামে একটা রোগ আছে। আমেরিকায় প্রতি পাঁচশোটা বাচ্চার মধ্যে এই রকম একটা বাচ্চা জন্মায়। হয়তো কখনও এ রকম বাচ্চা আপনাদের

চোখেও পড়েছে— হেঁড়ে মাথা, বড় বড় চোখ, ডিসপ্রোপোরসনেট হাত-পা… ' এই ভাবে শ্রীধর লেকচার দিয়ে যান।

'আসুন, দেখে যান,' বলে শ্রীধর তাদের ভেতরে নিয়ে যাবার জন্যে উঠলেন।

'থাক্ গে, দেখার আর কি আছে।' বন্ধুরা বিব্রত হয়ে পড়েন।

'নো, নো, তাতে আর কি হয়েছে, আসুন।' ব'লে শ্রীধর তাঁদের ভেতরে নিয়ে যান।

শ্রীদেবী সবকিছুই শুনছিলেন। দ্বিধায় পড়লেন। ওর মনে হয় ওর বুকে কেউ যেন হাতুড়ি পিটছে। সভ্যতা কি? বা কি নয়? বাচ্চাকে তাড়াতাড়ি কোলে তুলে নিয়ে ও ঘরের ভেতরে ঢুকে দরজা বন্ধ ক'রে দেয়।

'শ্রীদেবী, দরজা খোলো, আমার বন্ধুরা বাচ্চা দেখতে এসেছেন।' দরজায় টোকা দিতে দিতে শ্রীধর বলেন।

ভেতর থেকে জবাব এলো না।

'আজ থাক। অন্য কোনোদিন দেখবোখন।' সঙ্কোচের সঙ্গে বন্ধুরা বলে ওঠেন।

ঘরের মধ্যে বাচ্চাকে কাপড়ে জড়িয়ে নিয়ে বেদনা জর্জরিত হয়ে বসেছিলো শ্রীদেবী। দূর থেকে শ্রীধরের কণ্ঠস্বর শুনতে পেলো: 'সী ইজ এ্যান এ্যাডুকেটেড লেডি, বাট এ সেন্টিমেণ্টাল ফুল।'

বাচ্চা এখন একটু বড় হয়েছে। পাশ ফেরে, উপুড় হতে পারে। হেঁড়ে মাথা নিয়ে যখন বাচ্চা উপুড় হয় তখন শ্রীধর কৌতূকপূর্ণ দৃষ্টি নিয়ে দেখেন, আনন্দ পান— যেন কোনো এডুকেশানাল ফিল্ম দেখছেন।

একবার উপুড় হতে গিয়ে খাট থেকে পড়ে যায়। মাথায় আঘাত লাগে, রক্তও বেরোয়। সারাটা দিন শ্রীদেবী দুশ্চিন্তায় কাটায়। এ সব দেখে শ্রীধর শ্রীদেবীকে সাবধান করে দিয়ে বললেন, 'শ্রীদেবী, তোমাকে বার বার এক কথা মনে করিয়ে দিতে হচ্ছে ব'লে আমার খারাপ লাগছে। মায়ায় এতো জড়িয়ে পড়লে এর পরিণাম ভালো হবে না।

মা আর ছেলের সম্পর্ক ক্ষতিকর না লাভজনক, তা দাড়ি-পাল্লায় নিক্তির ওজনে যাচাই করতে শ্রীদেবী জানতো না। তবুও কথা আর বেশী দূর এগোতে দিলো না। চুপ করে থাকলো।

একদিন বিছানায় শুয়ে বাচ্চাটা যখন খেলছিলো, তার দিকে ইসারা করে শ্রীদেবীকে শ্রীধর বলেন, 'দিনে দিনে এর মাথাটা আরো বেড়ে যাচ্ছে, না?'

শ্রীদেবী মাথা তুলে সোজা শ্রীধরের দিকে তাকায়। রক্তবর্ণ চোখ! 'দেখো, তোমায় অনেকদিন থেকে একটা কথা জিজ্ঞেস করবো ভাবছি।'

শ্রীদেবীর এমন দৃঢ় কণ্ঠস্বর শ্রীধর আগে কখনও শোনে নি। নিষ্প্রভ দৃষ্টি নিয়ে তিনি তাকিয়ে থাকেন।

'তুমি ওর বাবা, সেটা তুমি কবে বুঝতে শিখবে?' উত্তরের জন্যে প্রতীক্ষা করে না, জবাবও চায় না! ছেলেকে নিয়ে ভেতরে চলে যায়।

অনুভূতি কি বস্তু, তা শ্রীধরের অজানা। তাই তিনি নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন।

শেষে যা হবার তাই হ'লো। ভাগ্য শ্রীদেবীকে পরিহাস করে। বাচ্চা ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়তে থাকে। চাহনি ক্রমশ ঘোলা হয়ে আসে, পাগলা হাসি মিলিয়ে যায়। পেটে, মাথায় ও

গলায় নানারকম কমপ্লিকেশন দেখা দেয়··· কোনো অশুভ সময় মাথা ঝটকাতে থাকে। তিনদিন ধ'রে এইরকম চলে। শেষে এক অশুভ মুহূর্তে নিজের এই বীভৎস বিকৃত রূপকে ছেড়ে নতুন কোনো রূপের সন্ধানে বেরিয়ে পড়ে।

ওর মৃতদেহ কোলে নিয়ে শ্রীদেবী কঁ'দতে থাকে। মুখে কথা নেই, কারুর ওপর কোনো অভিযোগও নেই।

অনেকক্ষণ পরে শ্রীধব শ্রীদেবীর কাছে গিয়ে বলেন, 'আর তুমি এ ভাবে কতক্ষণ কাঁদবে, দাও ওকে— আমি নিয়ে যাই, শেষকৃত্য করে আসি।' শ্রীদেবী একবার মাথা তুলে শ্রীধরের দিকে তাকায়। তারপর আস্তে আস্তে ছেলের মৃতদেহটা স্বামীর হাতে তুলে দিয়ে বলে, 'নিয়ে যাও।'

ছেলের মৃতদেহ শ্রীধর দুহাত দিয়ে তুলে নিলেন। গাড়ীর পেছনের সীটে মৃতদেহ রেখে সামনে স্টিয়ারিং-এ এসে শ্রীধর বসলেন। গাড়ী বাড়ী থেকে বেরুলো। ক্রমে দূরে মিলিয়ে গেলো।

তিনদিন শ্রীদেবী যেন অন্য জগতেব মানুষ। খাওয়া-দাওয়া ছেড়ে দিয়েছে। ঘুমও নেই। কারুব সঙ্গে কথা বলে না। তাঁর প্রাণে একটা ব্যথা ক্রমাগত বাজছে : এই নিরীহ প্রাণীর ওপর ঘোরতর কোনো একটা অন্যায় করা হয়েছে। দিন দিন ও দুর্বল হয়ে পড়ে। শ্রীধর ঘণ্টার পর ঘণ্টা শ্রীদেবীর পাশে বসে ওকে সান্ত্বনা দিতে থাকেন ; যদিও এটা শ্রীধরের স্বভাববিরুদ্ধ। শ্রীদেবীকে খুশি রাখতে ও তার মন ভোলাতে তিনি নানা ভাবে চেষ্টা করলেন। যখন কিছুতেই আর কিছু হ'লো না তখন শ্রীধর বললেন, 'দুঃখই আমাদের জীবনের পরম শত্রু। আর এই সত্যটা তুমি উপলব্ধি ক'রো।'

ঘরদোর, সারা বাড়ী ঘিরে আছে বাচ্চার স্মৃতি। বড় মাথা, ছোট্ট ছোট্ট হাত-পা, আধো আধো বুলি, সেই মুখ…

সেই মুখের 'মা, মা' ডাকের ক্ষীণ আওয়াজও ও শুনতে পায়। হৃদয় ক্ষতবিক্ষত হ'য়ে যায়।

'আমার কপালে, আমার কপালে নেই,' বলে বুকফাটা আর্তনাদ করে।

বাচ্চার সরল মুখ যেন বলে ওঠে, 'মা আমার কি দোষ? আমার তা হলে এ শাস্তি কেন?'

'বাছা, এ শাস্তি তোমার নয়, আমার। আসলে এ আমার শাস্তি নয়, এ আমার কর্মের ফল, আমার কপাল।'

সে ব'লে ওঠে, 'এ সব কথা ভুলে যাও মা, আমার মরণই ভালো। বেঁচে থাকলে সবায়ের ভ্রূকুটি আমায় জর্জরিত করতো।'

'তাদের আমি ভস্ম করে দেবো, শেষ করে দেবো, শাপ দেবো।'

ও বলে, 'না মা, আমার জন্যে তুমি তোমার জীবন কেন নষ্ট করবে?'

'বাবারে, আমি কি পাষাণ। আমি যদি এই ভাবে জন্ম নিতাম তো আমার কি দশা হ'তো।'

এই রকম নানান মানসিক দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত ও জর্জরিত হয়ে পড়ে থাকে।

'মাই গড। বড়রা নরকের কথা বলতেন, দেখছি তা মিথ্যে নয়, এইটাই নরক।' সিগারেট ধরাতে ধরাতে শ্রীধর ভাবেন।

প্যাথলজি মিউজিয়ামে বাকী সব স্পেসিমেন মেলান। এতো আকর্ষণীয় ছিলো না যত ছিলো শুধু ঐ নতুন হাইড্রোসেফ্যালাস স্পেসিম্যানে, যা শ্রীধর যোগাড় করেছিলেন।

'কনজেনিট্যাল হাইড্রোসেফ্যালাস— সাধারণত ইনট্রাইউটেরাইন

লাইফেতেই ফীটস মারা যায়। দিস ইজ এ রেয়ার কণ্ডিসান—পাঁচ মাস অবধি বেঁচে ছিলো।' এই ব'লে শ্রীধর ছাত্রদের স্পেসি-ম্যানটা দেখাতেন।

উনি সেন্টিমেণ্টের ধার ধারতেন না, অন্ধবিশ্বাস ওঁর ধারে-কাছেও ঘেঁষতে পারতো না। কিন্তু তা সত্ত্বেও এই স্পেসিম্যানটা তাঁর কাছে বড় আকর্ষণীয় ছিলো। উনি রোজ এক ঘণ্টা মিউজিয়ামে কাটাতেন। 'রাউণ্ড' দিতে দিতে ঐ স্পেসিম্যানটার কাছে এসে আপনা হতেই থেমে যেতেন। পাঁচ মিনিট ধরে ওখানে দাঁড়িয়ে থেকে নিষ্পলক চোখে দেখতেন। ফরম্যালিনে রাখা হেঁড়ে মাথা ও ছোট্ট শরীরের এই স্পেসিমেনটা যত দিন যায় তত যেন ওঁর মনে ছাপ রাখে।

ওখানে এসে দাঁড়ালেই ওঁর হৃদয়স্পন্দন দ্রুত হ'য়ে উঠে, ঘেমে নেয়ে ওঠেন। বিজ্ঞানের জ্ঞান প্রসারের জন্যে মিউজিয়ামে রাখা এই বস্তুটা তাঁরই শরীরের অঙ্গ, তাঁরই রক্তকণা।

গোড়ার দিকে তিনি বুঝতে পারেন নি যে এ ধরনের ভাবপ্রবণতা তাঁকে আস্তে আস্তে ঘিরে ফেলছে। ভেবেছিলেন সব কিছুই যন্ত্রের মতো চলবে। কিন্তু এই হৃদয়ের স্পন্দন, এই ভাবপ্রবণতা দেখে শ্রীধর বুঝতে পারেন, এক অজ্ঞাত শক্তি তাঁকে ক্রমশ কাবু করে ফেলছে। লজ্জাপেয়ে যান··· ভাবেন ঐ জায়গাটায় আর দাঁড়াবেন না। তাড়াতাড়ি ঐ জায়গাটা থেকে চলে যাবার চেষ্টা করেন, কিন্তু পা যেন সরে না। ঐ জায়গাটায় পৌঁছোলেই তিনি থমকে দাঁড়ান। সঙ্গে সঙ্গে আপনা হতেই ওখানে দৃষ্টি চলে যায়। অপলক নেত্রে দেখতে থাকেন। কখনও বা জোর করে এগিয়ে যেতেন। কিন্তু আবার কোনো না কোনো অছিলায় তাঁকে আবার ঐ জায়গায়

ফিরে আসতে হ'তো। এই অশান্তির হাত থেকে রেহাই পাবার জন্যে শ্রীধর ঠিক করলেন যে তিনি আর ঐ মিউজিয়ামের মুখো হবেন না। এ ব্যাপারে তিনি সচেষ্টও হলেন, কিন্তু একদিনের জন্যেও সফল হলেন না। জোর করে মন থেকে এই চিন্তা দূর করার যত চেষ্টা করেন ততই মন তাঁকে ঐ জায়গায় টেনে নিয়ে যায়। ঐ মিউজিয়াম তাঁকে যেন চুম্বকের মতো টানে। সংযম আর আকর্ষণের সংঘাতে শ্রীধর ক্রমশই দুর্বল হয়ে পড়েন। ক্লান্ত হয়ে চোখ বুজে বলে ওঠেন, 'বাপরে!' ওঁর অজ্ঞাতেই পা আর চোখ কাজ করে যায়।

এই ধরনের অনুভূতি শ্রীধরের জীবনে এই প্রথম। ভীষণ এক মনের দ্বন্দ্ব সুরু হয়ে গেছিলো— অন্তর্দ্বন্দ্ব। নিজের মনের সঙ্গে সমানে যুদ্ধ করেন, দাঁতে দাঁত চেপে নিজের ওপর রাগ দেখান, নিজেকেই নিজে অস্ত্র দেখান। বিজ্ঞানের লালসা থেকে সুরু করে সংঘর্ষ, জীবনে প্রতিষ্ঠা, আকর্ষণ, মমতা, মোহ— তারপর মনের সমতা— এই ভাবে নানা ভাব তাঁর মনকে জর্জরিত করতে থাকে, তাঁকে নাড়া দিয়ে, কাঁদিয়ে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। ঘুমন্ত অবস্থায়ও ছেলের চেহারা মনে ভেসে ওঠে, স্বপ্নেও যেন কি সব বলে যায়।

নিজের অস্বাভাবিক মানসিক অবস্থা কাটিয়ে উঠে শ্রীধরের এই পরিবর্তন চোখে পড়তে শ্রীদেবীর কয়েক সপ্তাহ লাগে।

একদিন শ্রীধর বিছানায় শুয়ে কড়িকাঠের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। পাশে একটা আওয়াজ হ'লো। কিন্তু তাঁর কানে গেলো না। শ্রীদেবী তাঁর গায়ে হাত না দেওয়ার আগে তাঁর কোনো হুঁশ ছিলো না। চমকে উঠে শ্রীদেবীর দিকে তাকাতেই শ্রীদেবী ব'লে ওঠে, 'কিছু বলবে?'

'কি বলবো ?'

'তোমার মধ্যে একটা পরিবর্তন এসেছে। কোনো কারণে তুমি খুব চিন্তিত আছো, দুর্বল হয়ে পড়েছো, চেহারার সে জৌলুস ক্রমশ চলে যাচ্ছে, সবসময়ই অন্যমনস্ক থাকো, স্বপ্নেও কি সব বলো। এ রকম কেন হচ্ছে ?' শ্রীদেবী ওঁর বুকে হাত রেখে আদরের সুরে বললো।

আশ্চর্য হয়ে উনি জিজ্ঞেস করেন, 'সত্যি ? সত্যি বলছো আমার মধ্যে পরিবর্তন এসেছে ?'

'বিশ্বের ইতিহাসে এ একটা উল্লেখযোগ্য বিষয়। তোমার মধ্যে অনেক পরিবর্তন এসেছে। নিজের চোখকেই বিশ্বাস করতে পারি না।'

'এর যে কারণ কি তাও বুঝতে পারি না।'

'থাক, কারণ আমি জানতে চাই না। কিন্তু তুমি সহজ ও স্বাভাবিক হও। তোমার সম্বন্ধে আমার এতোদিনের যে ধারণা তাকে ভাংতে দিও না, তোমার দুর্বলতা তুমি কাটিয়ে ওঠো।'

শ্রীধর অনেকক্ষণ স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে থাকেন। তারপর বলেন, 'শ্রীদেবী, তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করতে চাই।'

'বলো।'

'আমাকে সত্যিই কি খুব অদ্ভুত মনে হচ্ছে ?'

শ্রীদেবী একটু আশ্চর্য হয়ে স্বামীর দিকে তাকান। বুকে হাত বুলিয়ে দিচ্ছিলেন। হাত থেমে যায়।

'আমার ওপর কখনও তুমি কি রাগ করেছিলে, আমার ওপর কখনও কি তোমার বিতৃষ্ণা জন্মেছিলো ?'

শুনেই শ্রীদেবী চট করে উঠে পড়ে। 'এটা প্রশ্ন নয়, এটা বাক্যবাণ।'

নিজেকে সামলে নিয়ে নম্র হয়ে বলে, 'আমার ধারণা ছিলো,

এ ধরনের প্রশ্ন কোনোদিন তুমি আমায় করবে না। ভেবেছিলাম এ রকম কোনো প্রশ্ন করার কোনো অবকাশ হবে না। তোমার আচরণ, অনুশাসন আমি সহ্য করতে পারি, কিন্তু তোমার এই ধরনের প্রশ্ন নয়। এ ধরনের প্রশ্ন আর কোনোদিন ক'রো না। আমায় ক্ষমা করো। যদি আঘাত করে থাকি …।' এই ব'লে শ্রীদেবী চলে যায়।

শ্রীধর দীর্ঘশ্বাস ফেলেন। শ্রীদেবী জানে না যে শ্রীধর কি করেছেন। যদি জানতে পারে তো কি হবে? আগ্নেয়গিরি কি ফেটে পড়বে?

এক মহাপ্রলয় আসন্ন। পৃথিবীর বুকে ফাটল ধরেছে। আগ্নেয়-গিরির অগ্ন্যুৎপাত সুরু হয়ে গেছে। লাভা ছড়িয়ে পড়ছে। সমুদ্র পৃথিবীকে গ্রাস করতে আসছে, কালবৈশাখী সুরু হয়েছে, আগুনের লেলিহান শিখা, চচ্চড়ে রোদ, জোয়ারকে মাতিয়ে তোলার মতো প্রবল ঘূর্ণিঝড়, পৃথিবীকে পাতালে টেনে নিয়ে যাচ্ছে প্রবল ভূমিকম্প— 'হায়, হায়' বলে তিনি চিৎকার করে ওঠেন।

জানলা দিয়ে আকাশ দেখছিলো শ্রীদেবী। চিৎকার শুনে ছুটে এলো, 'কি গো? কি হ'লো?' খুব চিন্তিত হ'য়ে শ্রীধরের মুখের ওপর ঝুঁকে পড়লো।

সারা গা ঘামে ভিজে গেছে, থরথর করে শ্রীধর কাঁপছেন। তাঁর মনে হয় শ্রীদেবীর কণ্ঠস্বর যেন অন্যলোক থেকে ভেসে আসছে। অনেক কষ্টে চোখ খুললেন।

'কি গো? এখন কেমন মনে হচ্ছে?' মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ে শ্রীদেবী জিজ্ঞেস করে।

'স্বপ্নে দেখলাম সর্বনাশ হ'য়ে গেছে।' ক্ষীণস্বরে শ্রীধর বলেন। সমস্ত শরীরটা কালিমাখা হ'য়ে গেছে—

'তুমি বোধহয় বেশি চিন্তা করছো। তাই বোধহয় …' খানিকক্ষণ দুজনেই চুপচাপ।

'আমার মনে হচ্ছে হপ্তাখানেক ধ'রে আমি অসুস্থ।'

শ্রীদেবী ঘাড় নাড়ে।

'বাপরে, এতোদিন ধরে আমি কখনও অসুস্থ থাকি নি। তাই বোধহয় …'

'কি?'

'তাই বোধহয় এই সব চিন্তা …'

'এ ভাবে নিরাশ হলে চলবে না। দুদিন আরো বিশ্রাম করো, একেবারে স্বাভাবিক হ'য়ে যাবে।'

'স্বাভাবিক হয়ে যাবো?' ঠোঁটের এক কোণে হাসি ফুটে ওঠে।

'হাসছো কেন?'

'সন্দেহ হ'লো, তাই।'

'কিসের সন্দেহ?'

শ্রীধর কোনো জবাব খুঁজে পান না। তাই এমনি ব'লে ওঠেন, 'আবার আমি সহজ ও স্বাভাবিক হ'তে পারবো কি না, তাই।'

শ্রীদেবীর পায়ের তলার মাটি যেন সরে যায়।

'এরকম কথা বোলো না।' রুদ্ধকণ্ঠে শ্রীদেবী ব'লে ওঠে।

'শ্রীদেবী!'

'কি বলছো?'

'ওদিকে বাইরে একবার তাকাও।'

শ্রীদেবী বুঝতে পারে না দেখার কি আছে। বলে, 'দেখবার কি আছে?'

'দেখার অনেক কিছু আছে— অস্তগামী সূর্যের রশ্মি ঢেকে ফেলছে

যে মেঘগুলো, আমাকে দেখে বিদ্রূপের হাসি হাসছে যে বাতাস আর আমাকে উপহাস করছে যে গাছগুলো, দেখতে পাচ্ছো না ?'

শ্রীদেবীর বুকে যেন একটা বোঝা চেপে বসে। দুঃখে ভেতরটা কাঁদতে থাকে।

'এ সব কথা বোলো না, তোমার দুটো পায়ে পড়ি।' গলা ধ'রে আসে শ্রীদেবীর।

আবার সব নিশ্চুপ। মাথাটা নিচু করে একটু সঙ্কোচের সঙ্গে শ্রীদেবী বলে :

'আজ শনিবার, বিকেলবেলার দিকে একটু মন্দিরে যাবো ভাবছি, ঘুরে আসবো।'

'ঘুরে এসো, দ্বিধা করছো কেন ?'

'বাড়ীতে একলা থাকতে পারবে তো ?'

'তুমি কিছু চিন্তা কোরো না, আমি ভালোই আছি।'

'বেশ ভালো কথা, কিন্তু এখনও তুমি খুব দুর্বল, খাট থেকে নেমো না যেন। যাবো আর আসবো।' অনেকবার ধরে সাবধান ক'রে শ্রীদেবী চলে যায়।

একটা একটা করে মিনিট কাটতে থাকে।

শ্রীধরের আর খাটে শুয়ে থাকতে ভালো লাগে না। আস্তে আস্তে উঠে বসেন। মনে হয় ঠিকই আছে। আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ান। তখনও ঠিকই মনে হয়। আস্তে আস্তে চলে করিডরে দেয়ালের কাছে দাঁড়িয়ে পড়েন।

আকাশে কালো মেঘ। পশ্চিম পাহাড়ে সূর্য হেলে পড়েছে। বৃষ্টি হবে বোধহয়।

শ্রীদেবী হেঁটে গেছে। ফেরবার সময় ভিজে না যায়। এই ভেবে চিন্তিত হয়ে পড়েন।

ঠিক এই জায়গায়, ঠিক এই সময়, প্রকৃতির ঠিক এই রকম একটা অবস্থায় শ্রীধর শ্রীদেবীকে বলেছিলেন, 'আমি বাচ্চা হতে দেবো না।' এই ধরনের ইঙ্গিত দিয়ে কথা বলেছিলেন।

সে জন্মালো, বড়ও হ'লো, আবার শেষ হ'য়ে গেল। 'না না, সে শেষ হয় নি।' একটা বজ্রগম্ভীর আওয়াজ ভেসে আসে।

তিনি চমকে ওঠেন। হ্যাঁ, ওর দেহের তো শেষ হয় নি। ব্যবসায়িক প্রয়োজনে তিনি নিজের চোখের সামনে তো সেটা রেখে দিয়েছেন। কিন্তু এই ব্যাবসার পরিভাষা আলাদা। এ সরস হৃদয়ের ব্যাবসা নয়।

'আমি শেষ হয়ে যাই নিঁ বাবা। আমি শেষ হয়েযাইনি। আমাকে ধরে রেখেছে, লোশানে ডুবিয়ে রেখেছে। জারের ভেতর দিয়ে সবাই আমাকে দেখে। আমার বড় মাথাটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে।'

'এক হপ্তা··· সাত দিন। বাপরে। প্রাণটা শরীরের মধ্যে এতোদিন এমনি করে বেঁধে রেখেছে। এতোদিন··· ও কি ক'রে সহ্য করছে? কি করে বেঁচে আছে?'

'এটা আশ্চর্য নয়···' তার চোখ দিয়ে রক্তকণার মতো এক এক ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়তে থাকে।

'তুই পাথর, তুই পাষাণ।'

মন চলবার আদেশ দেয়।

'আমার শক্তি নেই, শক্তি নেই।'

'তাই তো বলছি তুই পাষাণ, তুই পাথর।'

'জ্বর আছে যে, শরীরে বল নেই।'

'মরবি না, পাথর মরে না।'

'হ্যাঁ, পাথর মরে না।'

চোখ যেদিকে গেলো, সেইদিকেই এগিয়ে চললেন, মাথা আর চলে না। এতো শীতেও ঘাম ঝরছে, 'যাবো, নিশ্চয়ই যাবো।' ···বাড়ীর পোর্টিকো থেকে এ্যামব্যাসাডার গাড়ী ছুটে বেরিয়ে যায়।

মিউজিয়ামে ঢুকে তিনি দেওয়ালের সুইচটা টিপে দিলেন। সারা হলটা আলোয় আলো।

'ঐ নাও··· ঐ তোমার···' ত্বপা এগিয়ে যান। আলো নিভে যায়। সব অন্ধকার, ঘন অন্ধকার। কিছুই দেখা যায় না।

'বিট্টু, তুমি কোথায়?' ভেতর থেকে একটা আওয়াজ।

'এদিকে বাবা, এদিকে। আমাকে এরা বেঁধে রেখেছে। নিঃশ্বাস নিতে পাচ্ছি না।'

'এক মিনিট, এই আমি এলুম বলে।' একদিন সেন্টিমেন্টের যিনি ধার ধারতেন না সেই প্রফেসর শ্রীধর আজ ছটফট করতে করতেঃ টলতে টলতে এগিয়ে যান।

ঐ ঘন অন্ধকারে চারিদিকে অসংখ্য রোগের ভয়ঙ্কর বীভৎস চিহ্ন— মেয়েদের, বাচ্চাদের, বুড়োদের— হৃদয়রোগের, ক্যানসারের, যক্ষ্মার, সিফিলিসের, প্রাইমারীর অসংখ্য··· অসংখ্য চিহ্ন··· ওর সংগ্রহ··· মানসিক সম্পত্তি—

'বাবা, বাবা, এদিকে বাবা।'

চারিদিক থেকে শব্দ ভেসে আসে। চারিদিক থেকে কে যেন তাঁকে ডাকছে। রাস্তা দেখতে পাচ্ছেন না। কখনও পাশে পাশে যান, কখনও আগে যান।

টক্··· টক্··· টক··· পায়ের শব্দ।

'কে ওখানে?' দাঁড়িয়ে তিনি জিজ্ঞাসা করেন। ওঁর নিজের পায়ের আওয়াজই বোধ হয় ওঁকে ভয় দেখাচ্ছে। চারিদিকে নিঝুম, নিস্তব্ধতায় ছেয়ে যায়। তিনি আবার এগিয়ে যান।

'বাবা! বাবা!!'

ঐ ডাকেতে করুণা, দীনতা আর কাতরতা ফুটে ওঠে।

কে যেন হাসছে।

'কে ওখানে?' আবার তিনি হাঁক দেন।

'এদিকে বাবা। এদিকে বাবা।'

পোঁছে গেছেন। হাত বাড়িয়ে শিশিটার গায়ে হাত বোলান। ওর বিশ্বাস এটাই ঐ জিনিস।

'তুমি তো বিট্টু।'

'হ্যাঁ, বাবা।'

কাঁচের জারটা তিনি তুলে নেন। বেশ ভারী মনে হয়। কাছে নিয়ে জড়িয়ে ধরার জন্যে ছটফট করতে থাকেন। হাত কাঁপছে।

ওটা যেন আরো ভারী মনে হয়। হাতের জোর যেন কমে আসছে।

তিনি বুকে ওটা জড়িয়ে ধরেন··· হাতে আর ধ'রে রাখতে পারছেন না। তেষ্টায় ওঁর বুক ফেটে যাচ্ছে। ধড়াম··· শব্দ আর বিট্টু বলে উনি চিৎকার করে ওঠেন।

আলো জ্বলে ওঠে। থরথর করে শ্রীধর কাঁপছেন, সামনে তাঁর টুকরো টুকরো ভেঙে-পড়া কাঁচের জার, চারিদিকে ছড়িয়ে-পড়া ফরমলিন, তার মধ্যে সদ্যোমৃত এক মাংসপিণ্ড।

শ্রীধর ঝুঁকে পড়ে নিজের ছেলেকে কোলে তুলে নেন। মুহূর্তের জন্যে অপলকনেত্রে দেখেন। 'আমি তোমার প্রতি সুবিচার করবো।'

উনি উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। ছেলেকে কাঁধে নিয়ে ঐ ভাবে বেরিয়ে পড়েন।

মিউজিয়ামের একটা নমুনাকে পাগলের মতো গাড়ীতে তুলে রাখেন প্রফেসর শ্রীধর। দূরে দাঁড়িয়ে এ্যাটেনড্যাণ্ট ও ওয়াচম্যান আশ্চর্য হ'য়ে দেখতে থাকে। গাড়ী শ্মশানের দিকে ছুটে চলে।

নিজের মনের ভারবেদনা আর গ্লানি শ্রীধর স্ত্রীর কোলে মাথা রেখে কাঁদতে কাঁদতে বলতে থাকেন। এই কান্নায় কত সুখ, কত শান্তি! শ্রীদেবী তাঁর মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে, চুল কুলোতে কুলোতে মৌন হয়ে চোখের জল ফেলতে থাকে।

কোনো কিছু গোপন না ক'রে সব কিছু শ্রীধর শ্রীদেবীকে খুলে বলেন।

'শ্রীদেবী! আমি উপযুক্ত পিতা হ'তে চাই, উপযুক্ত পিতা আমাকে হ'তে হবে।'

আজকের ঘটনাচক্র এই ধরনের পরিণতি না নিলে আর ওঁর মনের এই পরিবর্তন না হ'লে শ্রীদেবী বোধ হয় তাঁর সঙ্কল্প এই ভাষায় প্রকাশ করতেন: 'আমার এ্যাবরশান করিয়ে দাও।'

কিন্তু এখন পট পরিবর্তন হয়েছে। এখন কথাই আলাদা। নতুন কিশলয় দেখা দিয়েছে।

'তোমার যা ইচ্ছে··· আর সাত মাসের মধ্যে··· ' এই কথাগুলো শ্রীধরের কানে মধুগুঞ্জন করে ওঠে।

কাক

রামনাথম স্কুল মাষ্টার। গাঁয়ে থাকতো ব'লে কোনোরকমে দিন কেটে যেতো। তার সংসারকে অকূলে ভাসিয়ে হঠাৎ সে মারা গেল। রামনাথমের দুই ছেলে, দুই মেয়ে। বড় ছেলে ছাড়া বাকী তিন ছেলেমেয়েই বুদ্ধিমান। বয়স অনুপাতে সকলেরই বুদ্ধি হয়েছে, কিন্তু বড় ছেলের হয় নি। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে গতর বেড়েছে, বুদ্ধি বাড়ে নি। একেবারে নির্বোধ আর বোকা।

রামনাথমের জীবদ্দশায় এই চিন্তাই তাকে ভাবিয়ে তুলতো। বড় ছেলে তাড়াতাড়ি মানুষ হ'য়ে উঠবে, বুড়ো বয়সে সে একটু আরাম পাবে, এরকম কোনো আশাভরসা রামনাথমের ছিলো না। তাই রামনাথম হাল ছেড়ে দিয়েছিলো। ভবিষ্যতের কথা ভাবলেই তার দারিদ্র্যের সর্বনাশা রূপ চোখে পড়তো। তার নিজের বলতে এক ফালি জমিও ছিলো না। সম্পত্তি বলতে স্ত্রী, ছেলেমেয়ে আর পাখীর ডানার মতো নিজের দুটো হাত। তাতেই সে খুশী ছিলো। শুধু যখন ভাবতো তার অবর্তমানে সংসারের কি হাল হবে তখনই যা চিন্তিত হয়ে পড়তো। বাইরে সে ভাব কিন্তু প্রকাশ করতো না, শুধু গম্ভীর হয়ে থাকতো। কারুর কাছে কখনও কাঁদুনি গাইতো না। উল্টে বলতো, আমার কিসের অভাব। আমার ছেলেমেয়েরাই আমার সব। ছেলেমেয়ে নিয়ে ছোট্ট এই পরিবারটি এতোদিন মানসম্ভ্রমের সঙ্গে দিন কাটাচ্ছিলো।

সেদিন মঙ্গলবার। রামনাথম স্ত্রীকে বললো, 'দেখো, আমার বোধহয় জ্বর হয়েছে।' ঘরে যে ওষুধ ছিলো তাই দেওয়া হ'লো। গত পঁচিশটা বছর ধরে সে বাড়ীর তৈরী ওষুধ কিংবা বাজার থেকে তৈরী করে আনা ওষুধ দিয়েই রোগের চিকিৎসা করে এসেছে। ডাক্তার ডেকে রোগে সর্বস্ব খোয়ানোতে তার ভীষণ আপত্তি ছিলো।

সামান্য জ্বর, তাড়াতাড়ি কমে যাবে, আশা করা গেছিলো। কিন্তু দুপুরের মধ্যেই জ্বর বাড়লো, সব শেষ হয়ে গেলো।

'কি যে দুর্ঘটনা ঘটে গেলো।' বলে সবাই আক্ষেপ জানালো। দুপুর এগারোটা থেকে লাশ পড়ে আছে। অনেক রাত অবধি দাহ করা সম্ভব হয় নি। মহালক্ষ্মীর আপত্তি ছিলো, তাই দাহ করা হয় নি। করুণভাবে মহালক্ষ্মী জানায়, 'অনেক আত্মীয়স্বজনকে তার করা হয়েছে, তারা হয়তো এক্ষুণি এসে পড়বে।'

রাতের শেষ বাসেও কেউ এলো না। পরের দিন ভোর অবধি অপেক্ষা করার জন্যে মহালক্ষ্মী কাতর অনুনয় জানায়। কিন্তু গাঁয়ের যাঁরা মাথা তাঁরা এতে আপত্তি জানান। এ ব্যাপারে গাঁয়ের লোকেরা আজও সংস্কার ও রীতিনীতি মেনে চলে। সহরের কোনো বাড়ীতে এই ধরনের দুর্ঘটনা ঘটলে বাড়ীর অন্যদিকের ভাড়াটিয়ারা দরজা বন্ধ ক'রে চুপচাপ খাওয়া-দাওয়া সেরে নেয়। কিন্তু গাঁয়ে তা হয় না। মৃতের সৎকার না হওয়া অবধি কেউ রান্নার নাম মুখে আনে না। এমন কি, কারুর ঘরেই উনুনে আগুন জ্বলে না।

সেই রাতেই দাহ করা হ'লো। হাড় কাঁপানো শীত। সজোরে উত্তরে হাওয়া বইছে। অনেকেই নিজের বাড়ীর দাওয়ায় বসে রামনাথমের গুণগান করতে থাকে।

বাইরে ঘরের দেওয়ালে মহালক্ষ্মী ঠেসান দিয়ে বসে ফুঁপিয়ে

ফুঁপিয়ে কাঁদছে। রাত একটা অবধি বাইরে বসে লোকেরা দীর্ঘশ্বাস ফেলে; রামনাথমের গুণগান করে। মহালক্ষ্মীর কানে এ সব কখনও স্পষ্ট কখনও বা অস্পষ্টভাবে ভেসে আসে। আধ ঘণ্টা পরেই গাঁ-টা ঘুমিয়ে পড়লো, চারিদিকে নিস্তব্ধতা ছেয়ে এলো।

তাকের ওপর প্রদীপটা টিম্ টিম্ করে জ্বলছে। ছেলেমেয়েরা কেঁদে কেটে শুয়ে পড়েছে। স্বামীর অনেক কথাই মহালক্ষ্মীর আজ মনে পড়ে। মন আরো ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ে। মনকে অনেক করে প্রবোধ দেবার চেষ্টা করে মহালক্ষ্মী। 'হে ঈশ্বর, ওকে না নিয়ে আমায় নিলেই তো ভালো করতে।' নিজের কপাল নিয়ে আফসোস করতে থাকে। মাঝে মাঝে চোখের পাতা এক হ'য়ে আসে। কিন্তু নানান ভাবনায় ঘুম আসে না। এলোমেলো নানান চিন্তা মাথায় ঘুরতে থাকে। জীবনের বাকী পথটা বড় রুক্ষ মনে হয়। গতকাল অবধি যেটা ভবিষ্যতের কথা ব'লে ভাবতে ভয় পেতো, আজ সেটা বাস্তবের ভয়ঙ্কর রূপ নিয়ে তার সামনে হাজির। সব কিছুই এখন সমস্যা।

হাওয়া হঠাৎ উল্টোমুখে বইতে সুরু করে। ছেলেমেয়েদের দিকে তাকাতে পারে না। বুক ফেটে যায় মহালক্ষ্মীর। ওরা সব শীতে কুঁকড়ে শুয়ে আছে। মৃত্যুতে সবাইকে কাঁদতে দেখে ওরাও কেঁদেছে। কিন্তু কিছুই বোঝে নি। ভালই হয়েছে! কথার মাঝে ওদের বাবার কথা উঠল, এ-কথা ও-কথা পাঁচ-কথা দিয়ে ওদের ভুলিয়ে দেওয়া যাবে। কিন্তু মহালক্ষ্মী ভুলবে কি করে, বাকী জীবনটা এই জ্বালায় জ্বলে মরতে হবে। স্বামীর কথা ভেবে অনেকক্ষণ কাঁদলো। ভোরের দিকে এবার কি হবে ভেবে কাঁদতে থাকে। টাক মাথা, ধুতি-পাঞ্জাবী পরা, তার ওপরে জহর কোট, কপালে তিলক, কোটরে

ঢোকা জেখ, সুকতলা খাওয়া জুতো, চোখে চশমা, হাতে ছাতা—পুরো চেহারাটা তার চোখের সামনে বার বার ভেসে ওঠে। আগামী দিনের কথা ভাবে, শুধু দেখতে পায় অন্তহীন অতল সমুদ্র, তার তটে সে দাঁড়িয়ে। চোখে সব কিছু অন্ধকার দেখে, মাথার ওপর ছায়াও দেখতে পায় না। অব্যক্ত এক বেদনায় কাতরাতে থাকে। চারটে ছেলেমেয়ে আর নিজে— পাঁচটা পেট চালাতে হবে— কি ক'রে কি করবে? মান-সম্মানের দিন ফুরিয়েছে, এতোদিন কারুর কাছেই হাত পাততে হয় নি! কিন্তু এখন কি করবে?

মহালক্ষী ভাবতে থাকে। আত্মসম্মানের সঙ্গে কোনো জীবিকা অর্জন করতে হ'লেও টাকার দরকার। সে খুব ভালোভাবেই জানে পয়সা ছাড়া কোনো কাজই সম্ভব নয়। তবুও ভাবে সম্মানের সঙ্গে বেঁচে থাকতে হবে। কিন্তু কি উপায়ে? সেটাই ঠিক করে উঠতে পারে না। ভদ্রম্মার কথা মনে পড়ে যায়। ভদ্রম্মার বয়স যখন পঁচিশ তখন স্বামী মারা যায়। তিনটে বাচ্চা। ও কি-করলো··· কি করলো··· কি করলো। আর ভাবতে পারে না। ভেঙে পড়লো। ভাবে, নিজের দশাও কি শেষে ভদ্রম্মার মতো হবে? এতোদিন মানসম্ভ্রমের সঙ্গে দিন কাটিয়ে এসেছে। এখন একেবারে অসহায়, পাঁচজনের দয়ার ওপরই তাকে নির্ভর করতে হবে। কেউ তার দেখাশোনা করবে না। কারুর সঙ্গেই কি তার কোনো সম্পর্ক নেই। ভদ্রম্মার মতো বাড়ী বাড়ী ঘুরে চাল-ডাল ঝাড়াবাছাই না করলে কি তার দিন চলবে না? একদিন ছিলো যখন ভদ্রম্মাও সবায়ের সঙ্গে মান-সম্ভ্রম নিয়ে উঠতো, বসতো। কিন্তু আজ! কেউই আজ আর ওকে নিয়ে মাথা ঘামায় না। যদি বা কখনও কথাবার্তা হয় তো সেই সম্মান দিয়ে আর কেউই বলে না।

ভদ্রম্মা ইদানীং সেন্টিমেণ্টাল হয়ে পড়েছে। কোনো কাজই ঠিকভাবে গুছিয়ে করতে পারে না। একবার নয়, দশবার বললেও মাথায় ঢোকে না। একদিন সেও বড় ঘরেরই মেয়ে ছিলো। তার ছেলেমেয়েদের কথা ভেবে লোকে তাকে দয়া করে। এই ধরনের কথাবার্তাই লোকে ওর সম্বন্ধে বলে। আগের সে সম্মান আর ওর নেই। এরজন্যে কিন্তু ও দায়ী নয়। দুহাত দিয়ে আঁকড়ে রেখেছিলো সংসারটাকে। ওর সে ক্ষমতা আজ আর নেই। পাহাড়ের বরফ গলে গেছে। হাতের মুঠো শিথিল হয়ে এসেছে।

মহালক্ষ্মী ভাবে, লোকেও এবার ওর সম্বন্ধে এই রকমই ভাববে। মহালক্ষ্মীর মনে পড়ে, সেও তো ভাড়া বাড়ীতে থাকে, এক্ষুণি তো তাকে এ বাড়ী ছেড়ে দিতে হবে। মনে পড়ে যায় সেই সব দীন দুঃখীর কথা যারা শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষায় গাছের তলায় তৃণের মতো নিঃসহায়ে জীবন কাটায়, যাদের পেট আর পিঠ এক হয়ে গেছে, চোখ যাদের কোটরে ঢুকে গেছে, চুল যাদের রুক্ষ, জট পড়ে গেছে।

দেওয়ালে ঠেসান দিয়ে বসে নিজের দুঃখটাকে চেপে থাকার চেষ্টা করে। দু'গাল বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ে। এই সব চিন্তা মনের মধ্যে তোলপাড় করে। চোখ খুলতেই বড় ছেলের দিকে নজর পড়ে। শিশুর মতো দুটো পায়ের মধ্যে হাতটা চেপে শুয়ে আছে। ঘুমোতে ঘুমোতে ওর মুখ দিয়ে নাল ঝরতে মহালক্ষ্মী অনেকবারই দেখেছে—ছি, ঠিক বাচ্ছাদের মতো! ওকে দেখতে দেখতে আরো উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে। আকারে তো ঠিকই বাড়ছে। কিন্তু তাতে সংসারের কোনো সুরাহা হয় নি। স্বামী যতদিন বেঁচে ছিলো, ওর কথাই ভেবে গেছে। আর এই ছেলের জন্যেই তাকে

অনেক দুঃখকষ্ট ভোগ করতে হবে। এই ছেলেই তো তার দুঃখ দুর্দশার কারণ। তার মন বিষিয়ে যায়। আধ ঘণ্টা পরেই আবার ছেলের জন্যে মায়া হয়। 'ওকে আমি মিছিমিছি দুষছি, ওর কি দোষ, ভগবান যদি ওকে বুদ্ধি না দেন তো কি করবে। ওকে ঘৃণা করলে নিজের মনের কালিমাই বেরিয়ে পড়বে। এতে ওর তো কোনো দোষ নেই। বাকী তিন ছেলেমেয়ের মতোই তো ও ছোট।' মহালক্ষ্মী নিজের মনকে বোঝাতে থাকে।

'খেতে পাক আর না পাক ওদের পড়াশোনা তো বন্ধ করা যাবে না। দরকার হলে, যে কোনো কাজই তাকে করতে হবে। ওদের পড়াশোনা চালু রাখতেই হবে।'

সমস্যার একটা সমাধান খুঁজে পায়। সেলাইয়ের একটা মেশিন কিনে কাপড় সেলাই ক'রে দিন কাটতে পারে। মেশিনে কাপড় সেলাই করতে মহালক্ষ্মী ভালোই জানে। এটাই ওর মনে ধরে। কিন্তু অনেক টাকার যে দরকার, কমপক্ষে দু-তিনশো টাকা। এতো টাকা পাবে কোথায়? গায়ে তো এক রত্তিও সোনা নেই। এর মধ্যে আবার কয়েকজনের ধারও শোধ করতে হবে।

ভাবে, এতোদিন গ্রামে আছি, হয়তো গ্রামের লোকের কাছ থেকে কিছু সাহায্য পাওয়া যাবে।

ভোর হয়ে আসে। ওর ঘুম ভেঙে যায়। হালকা রোদ ওর পায়ের ওপর এসে পড়েছে। ছেলেপুলেরাও চোখ রগড়াতে রগড়াতে উঠে পড়লো। সকালের প্রথম বাসেও কেউ এলো না। মহালক্ষ্মী লোকজনদের অস্থির কথা ব'লে তাদের টাকা দিয়ে দিলো। কাজ শেষ হতে বেশ সময় লাগলো। মহালক্ষ্মী মাটিতে আঁচল বিছিয়ে শুয়ে পড়লো। ভাবতে থাকে : 'সুখের দিনে লোকজনদের আসা-

যাওয়ার অন্ত ছিলো না। কিন্তু আজ, কেউই এলো না। কেন এতো পরিবর্তন? বোধহয় সকলেই নিজের কথা ভেবেছে। ভেবেছে, যদি এই অনাথের ভার তার ওপর এসে পড়ে। হ্যাঁ, তাই হবে।' রেগে ওঠে। আবার ভাবে: 'এদের সবায়েরই হৃদয় বরফের মতো ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। ভালোই হয়েছে, এদের মতো নিষ্ঠুর লোকের না আসাই ভালো।'

'মা, চিঠি।' বলে ছেলে ঘরে ঢুকলো। মহালক্ষ্মীর চিন্তার জাল কেটে গেল। চিঠি পড়তে সুরু করে।

সব চিঠিগুলোর ভাব সেই এক। 'এ খবর শুনে খুবই দুঃখ পেলাম যে রামনাথম অসুখে পড়েছে। ভগবানের কাছে প্রার্থনা, ও যেন শিগ্‌গির সুস্থ হয়ে ওঠে। নিজে গিয়ে দেখে আসবো ঠিক করেছিলাম কিন্তু অনিবার্য কারণে তা সম্ভব হ'লো না। এরজন্যে দুঃখ আরো বেশি।' মহালক্ষ্মী রেগে-মেগে সব চিঠি ছিঁড়ে ফেলে দেয়। দুনিয়ায় এ জাতের লোকের অভাব নেই। এরাও ব্যতিক্রম নয়। মিষ্টি মিষ্টি কথা শুধু, ওদের সম্বন্ধে মহালক্ষ্মী আর ভাবতে চায় না। ভেতর থেকে বিদ্বেষের একটা ভাব মোচড় দিতে থাকে। রাতে যে কথা ভেবেছিলো তা মনে পড়ে যায়। এ ব্যাপার নিয়ে কার সঙ্গে যে শলাপরামর্শ করবে তাই ভাবে। ভেঙ্কটায়য়াজীর সঙ্গে কথা বলে কোনো লাভ হবে না। পয়সা অন্ত তার প্রাণ। যদি কিছু না দেয় তো বড়ই লজ্জার ব্যাপার হবে। তা হলে কি রাজয়য়ার সঙ্গে কথা বলবে। রাজয়য়া বাড়ী আছে কিনা তা জানবার জন্যে মহালক্ষ্মী বড় ছেলেকে তার বাড়ী পাঠালো।

একটু পরে বড় ছেলে ফিরে এলো। রাজয়য়া সহরে গেছে।

'কবে আসবে রে?' মহালক্ষ্মী আস্তে জিজ্ঞেস করে।

'পনেরো দিনের মধ্যে তো নয়।'

একটু চিন্তা করে মহালক্ষ্মী : 'যা রামাইয়াজীকে একবার আমার সঙ্গে দেখা করতে বলে আয়। বলবি, বিশেষ দরকার। মা বিশেষ করে বলেছেন।' বড় ছেলে চলে গেল। রোদ উঠেছে, ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে। বাইরে কারুর কোনো সাড়াশব্দ নেই।' ছেলে-মেয়েরা গেল কোথায় ? 'ও বিট্টি বিট্টি !' কোনো সাড়া পাওয়া গেলো না ! দূর থেকে স্কুলের ঘন্টি শোনা গেলো। রাস্তায় লোকজনের আসা যাওয়া কমে গেছে। গোদাবরীতে মাঝিদের হট্টগোল শোনা যায়। পেছন দিকে একটা কাক সমানে ডেকে চলেছে। মহালক্ষ্মী একটু অস্বস্তি বোধ করছিলো। 'এ সব কথা কি করে রামইয়াজীকে বলবে ? কি মনে করবে কে জানে ?'

'মা, রামইয়াজী এসেছেন।' কোমর থেকে নেমে যাওয়া প্যাণ্টটাকে ওপর দিকে টানতে টানতে বড় ছেলে বলে।

মহালক্ষ্মী চিন্তার জাল কাটিয়ে উঠে মলিন মুখখানা আঁচল দিয়ে পুঁছে নিয়ে দরজার আড়ালে এসে দাঁড়ালো। অনেক কষ্টে সঙ্কোচ কাটিয়ে শেষে বলেই ফেললো, 'আপনার সঙ্গে একটা জরুরী ব্যাপারে পরামর্শ করতে চাই। তাই ডেকে এনে কষ্ট দিলাম। আমাদের অবস্থা তো আপনি সবই জানেন। এবার তো সংসারের পুরো দায়িত্ব আমার ওপর এসে পড়লো। এই ভার কি ক'রে বইবো কিছুতেই তা বুঝে উঠতে পারছি না।' বলতে বলতে মহালক্ষ্মীর গলার স্বর কেঁপে ওঠে। রামাইয়া কাতর স্বরে বললেন, 'আমিও তো সেই কথাই ভাবছি বোন ! আমারও তো ছেলেপুলে নিয়ে বেশ বড় সংসার। যতদিন আমার হাত-পা চলবে ততদিন এদের পেটও চলবে। তবুও আমি যা পারবো, করবো। এতে আমার নড়চড় হবে না।'

'আপনাকে আমি জানি, তাই এখানে ডেকে এনে কষ্ট দিলাম। আপনার মতো গণ্যমান্যদের বাড়ীতে ডেকে এনে কথা বলার ধৃষ্টতা আমার নেই। আপনি ওকে স্নেহ করতেন, সেই অধিকারে আপনাকে ডেকে এনে কষ্ট দিলাম। আপনি ভুল বুঝবেন না।' মহালক্ষ্মীর গলা কান্নায় ভেঙে পড়ে। রামাইয়া অনুনয় করে বলেন, 'না বোন, তুমি কিছু চিন্তা কোরো না, নিঃসঙ্কোচে আমায় সব বলতে পারো।'

'জামাকাপড় সেলাই করে সংসারের খরচা চালাবো, চিন্তা করছিলাম। সেলায়ের একটা মেসিন কিনবো ভাবছি। কমপক্ষে দু-তিনশো টাকা লেগে যাবে। কোনো জায়গা থেকে যদি এই টাকাটা ধার পাই তো···।'

রামাইয়া কথার মাঝেই বলে ওঠেন, 'এই কথাই আমি বলতে যাচ্ছিলাম। তাতো তুমিই বলে ফেললে।'

'আপনি কত উদার, সত্যি কত মহান।'

'রামনাথম এই গাঁয়ে গত পঁচিশ বছর ধ'রে মাষ্টারী করেছে। গাঁয়ের সবাই জানে যে ওর আর কোনো উপরি আয় ছিলো না। এখন এই বিপদের সময় গাঁয়ের সবারই তোমাদের সাহায্য করা উচিত। তাই ভেবেছি, সবাইকে বলে তোমাদের জন্যে যদি কিছু টাকা যোগাড় করা যায়। আমার খুবই বিশ্বাস ভগবানের আশীর্বাদে আমার সে চেষ্টা সফল হবে। কিন্তু এ ব্যাপারে তোমার মতামত না জেনে এগোতে আমি সঙ্কোচ বোধ করছিলাম।' এ কথা ব'লে রামাইয়া মহালক্ষ্মীর দিকে উত্তরের আশায় তাকালেন। মহালক্ষ্মী নিজের দুঃখ ও অভিমান ভুলে যায়, বলে, 'আপনি যা ভালো বুঝবেন।'

'তা হলে এবার আমি আসি,' বলে রামাইয়া উঠে পড়লেন।

মহালক্ষ্মী একটু নিশ্চিন্ত। মনে মনে এই মহাত্মাকে সহস্র প্রণাম জানায়। রাত্তিরেও মহালক্ষ্মী নিশ্চিন্তে ঘুমোলো। সকালে ঘুম ভাঙতেই দেখে রোদ উঠে গেছে। মহালক্ষ্মী বাড়ীর পেছন দিকে গেলো। ছেলেপিলেরা তখনও শুয়ে। ঝাঁট দিয়ে উনুন ধরিয়ে সামনের ঘরে এসে দেখে ছেলেপিলেরা সব দাঁতন নিয়ে দাঁত মাজছে। খানিক বাদে বড় মেয়ে এসে জিজ্ঞেস করে, 'মা, আমরা স্কুলে যাবো না?'

'আর ছুদিন, তারপরে আবার যাবে।' মহালক্ষ্মী ওকে বুঝিয়ে বলে। ছেলেপুলেরা যে যার রাস্তায় খেলতে সুরু করে। দশদিনের দিন অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া। চেনা জানা সবাই জড়ো হয়। পেছন দিকের দরজায় একটু আড়াল করে মহালক্ষ্মী বসলো। শ্রাদ্ধের কাজকর্ম ওখানে থেকে একটু দেখা যাচ্ছিলো। হোমের ধোঁয়া কুণ্ডলী পাকিয়ে আস্তে আস্তে আকাশের দিকে উঠে মিশিয়ে যায়। মহালক্ষ্মী অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে। থেকে থেকে লোকজনের কথাবার্তা আর বেদমন্ত্র উচ্চারণের মিলিত স্বর ওর কানে অস্পষ্টভাবে এসে পেঁাছোয়। মনে হয় অনেক দূরে কিছু কাজকর্ম হচ্ছে। সূর্য এবার ঠিক মধ্যাহ্ন গগনে। শরতের রোদে পিঠ পুড়ে যাচ্ছে। পাঁচিলের ওপর বড় বড় পিণ্ডি রেখে লোকেরা বসে আছে। ছুটো কাক পিণ্ডি খেতে আসছে, আবার উড়ে যাচ্ছে। অনেকক্ষণ এই ভাবে কাটে। মাথার ওপর চড়চড়ে রোদ, সবাই বেশ কাহিল হয়ে পড়েছে।

এক ভদ্রলোক একটু দূরে সরে গিয়ে বললেন, 'প্রেতাত্মা নিশ্চয়ই কোনো কিছুতে রুষ্ট হয়েছে। নিশ্চয়ই মৃতের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনো কিছু করা হয়েছে। কিংবা মৃতের কোনো কামনা অপূর্ণ রয়ে গেছে।'

'হ্যাঁ, আপনি ঠিকই ধরেছেন। তাই-ই হবে।' অন্য আর একজন

এই কথায় সায় দিয়ে বললেন। কানাঘুষো হ'তে হ'তে আস্তে আস্তে কথাটা সবার মধ্যে ছড়িয়ে পড়লো।

বড় ছেলেকে মনে মনে যে কোনো একটা সঙ্কল্প করে প্রণাম করতে বলা হ'লো। সে হাত জোড় করে বললো, 'আমি মন দিয়ে পড়াশোনা করবো।'

'না, না, তার কোনো দরকার নেই,' সমস্বরে সবাই ব'লে ওঠে।

শেষে কথাটা মহালক্ষ্মীরও কানে গিয়ে পৌঁছলো। কাঁদতে কাঁদতে বললো, 'আমাদের দিক থেকে তো কোনো ত্রুটি হয় নি?'

'উঁ, হুঁ, নিশ্চয়ই কোনো ত্রুটি হয়েছে।' একজন ব'লে উঠলেন।

মহালক্ষ্মীর রামাইয়ার কথাটা মনে পড়লো। কিন্তু সবার সামনে সে কথা বলতে মুখে বাধলো। লোকদের দয়া নিয়ে সে বেঁচে থাকবে, এটা কি তার স্বামীর পছন্দ নয়? এইভাবে অনাহারে না খেয়ে সবাই মরবে, এটাই কি সে চায়। এই কথাটা প্রমাণ করার জন্যেই কি ওরা সবাই জোট বেঁধেছে।

'শুনলাম, রামাইয়াজী কয়েকজনের সঙ্গে কথা বলে কিছু টাকার যোগাড় করেছেন, এটা কি সত্যি?' আর একজন প্রশ্ন করলেন।

'হ্যাঁ, সত্যি।' মহালক্ষ্মীর শান্ত কণ্ঠস্বর।

'হ্যাঁ, এবার বুঝেছি ঐটাই আসল ব্যাপার। এতোক্ষণ কেন বলো নি? রামনাথম আত্মসম্মান নিয়ে দিন কাটাতো! কারুর কাছে কোনোদিন হাত পাতে নি। এইভাবে চাঁদা তুলে তার পরিবারবর্গকে সাহায্য করা, তার কাছে কত বড় অপমানের ব্যাপার! কে জানে, এই ব্যাপারে তার আত্মা কত না কষ্ট পেয়েছে। এই টাকা আদায়ের চিন্তা ছেড়ে দিলে হয়তো তার প্রেতাত্মা সন্তুষ্ট হবে… '

মহালক্ষ্মীর মন দমে যায়: 'এই সঙ্কল্পটা ফেরত নিলে যদি কাকেরা এসে পিণ্ডিতে মুখ দেয়, তাহলে তার শেষ ভরসাও নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। তাছাড়া রামনাথম এ ব্যবস্থায় অসন্তুষ্ট হবে কেন? ছেলেমেয়েদের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে সেও তো কত উদ্বিগ্ন থাকতো। এ আমার ভুল আশঙ্কা যে এই সঙ্কল্প প্রত্যাহার করলেই কাকেরা এসে পিণ্ডিতে মুখ দেবে। আমি এ সবে বিশ্বাস করি না।' তবুও একবার বুক কেঁপে ওঠে। যদি কাকেরা সত্যি সত্যি তক্ষুণি এসে যায়......? তা হলে কি হবে?

শেষে ভীড়ের মধ্যে কানাঘুষো, টীকাটিপ্পনি সুরু হয়। 'এমনি কি এটা বিশ্বাসঘাতকের মতো আচরণ?' সে রকম মন্তব্যও শোনা গেলো। বাইরের সবাইর পীড়াপীড়িতে শেষে মহালক্ষ্মী বলেই ফেলে, 'আমি আমার এ সঙ্কল্প ত্যাগ করলাম।' বলার সঙ্গে সঙ্গেই বুকের ভেতরটা ধড়াস ধড়াস করতে থাকে। পাঁচ মিনিট কেটে গেল। সবাই ওখান থেকে সরে বারান্দায় এসে দাঁড়ালো। সবাই দূরে সরে গেলে এদের ভয়ে যে কাকেরা এতক্ষণ এগোতে পারছিলো না, —সবাই দূরে সরে যাওয়ায় তারা নির্ভরে উড়ে এসে তাড়াতাড়ি সব পিণ্ডি খেয়ে উড়ে গেলো।

যে যার মতো করে ঘটনাটার ব্যাখ্যা দিতে সুরু করলো।

'আমি আগেই বলেছিলাম না? রামনাথম কত বড় একজন মানী লোক ছিলো... এই ধরনের প্রস্তাবে সে কি করে সায় দেবে?'

ক্রমে এই ঘটনা পাড়াময় ছড়িয়ে পড়লো। রামাইয়া হতাশ হয়ে দোর গোড়ায় বসে পড়লেন। মনে মনে ভাবেন. 'মহালক্ষ্মী সত্যিই খুব অভাগী।' টাকা যোগাড়ের আশা তিনি ছেড়ে দিলেন।

পেছনের দরজায় দাঁড়িয়ে ছিলো মহালক্ষ্মী। এখন অজ্ঞান হয়ে মেঝেতে প'ড়ে আছে। কোনো হুঁশ নেই।

সবাই যে যার বাড়ী ফিরে গেছে। রামনাথমের ছেলেমেয়েরা হতভম্ভ হয়ে একে অন্যের মুখের দিকে তাকিয়ে বেহুঁশ মাকে ঘিরে ব'সে রইলো।

উপহার

দিন ঢলে পড়ে। বটগাছের জটা বেয়ে অন্ধকার নেমে এলো। খানা-ডোবা, খাল-বিল, নদী-নালা মায় সমস্ত পৃথিবীটাকে আস্তে আস্তে গ্রাস করে ফেললো। আকাশ যেন পৃথিবীর বুকে নেমে আসে। মনে হয় রাধার চোখের কাজলের রেখার মতো, শ্যামের দেহের শ্যামলিমার মতো, আর নন্দলালের ঘরে তৈরী ঘোলের মাঠার মতো দেখতে দেখতে অন্ধকার চারিদিক ঘিরে ফেললো।

এই ঘন অন্ধকারে গাছের তলায় কাঠ জ্বলছে। শ্যামের গায়ের ওড়নার মতো তার শিখা। এরা যেন সঘন অন্ধকারের গুণগান করছে। আগুনের সামনে বসে গোপন্না বাঁশ তাতাচ্ছে। তার সারা দেহে, আশে পাশে ছড়ানো বাঁশিগুলো আর দূরে জড়ো-করা বাঁশগুলোর ওপর আগুনের শিখা যেন আলোছায়ার ভাষা দিয়ে কাব্য-রচনা করছে।

সপ্তমীর তৃতীয় প্রহরের শেষ। কৃষ্ণের জন্মদিন। পঁচিশ বছর ধরে গোপন্না বাঁশি তৈরী করছে, আজও কিন্তু তা শেষ হয় নি। কালকে সেটা শেষ ক'রে অর্পণ করতেই হবে। কালকের মধ্যে শেষ করতে না পারলে এ জীবনে আর হবে না, সময় যে হয়ে এসেছে।

'বাবা! খাবে এসো-না।' ছোট্ট গোপম্মার ডাক গোপন্নার কানে গেলো না।

গোপন্না এখন বৃন্দাবনের চিন্তায় বিভোর। কৃষ্ণ এখন বৃন্দাবনে যাবে, পৌঁছোবার সময় আসন্ন। গোপিনীদের নূপুরের ঝঙ্কার শোনা যায়। চুড়ির রিনিঝিনি আর হাসিঠাট্টার গুঞ্জরণ। দূরে বেণুবন থেকে বাঁশির শব্দ ভেসে আসে। এই সব বিচিত্র সুরের মধ্যে এখনি মোহনের বাঁশি বেজে উঠবে।

না জানি গোপন্না কত যুগ ধরে এই ঝোপঝাড়ের মধ্যে বসে আছে। সে নিজেও তা জানে না। পাতার সঙ্গে পাতা হয়ে, ফুলের মাঝে ফুলের মতো ফুটে, নদীতটে বালিকণা হয়ে আর যমুনার জলকণার মতো নিথর হয়ে ব'সে সে কৃষ্ণের বাঁশির সুরে নিজের হৃদয়কে আপ্লুত করে তুলেছে। বিশুদ্ধ সুরলহরী থেকে একটা বিশিষ্ট সুর সে নিজের হৃদয়ে গ্রহণ ক'রে তার বিশ্বরূপ দেখার আগ্রহে তপস্যামগ্ন। এই বিশ্বরূপ হৃদয়ে ধারণ ক'রে সে নিজের কুটিরে ফেরে। নতুন একটা বাঁশ কেটে তাতে সুরমাধুরীর মূর্ছনা ফুটিয়ে তোলায় সচেষ্ট হয়। তার হৃদয়ের সুরমূর্ছনা যদি কোনো-দিন এই বাঁশিতে মূর্ত হয়ে ওঠে তবেই এই বাঁশি সে কৃষ্ণকে অর্পণ করবে বলে মনস্থ করেছে; কিন্তু তা আজও হয়ে উঠে নি। সেই সুরকে মুখরিত করার জন্যে সে সহস্র বাঁশি তৈরী করে। সেই সুরকে মূর্ত করার জন্যে সে তার প্রতিটি নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস বাঁশির মধ্যে দিয়ে নেয়। জীবনের পরিধি খুবই কম। একটা জীবনে কয়েক সহস্র শ্বাস-প্রশ্বাস বয়। এগুলো বৃথা নষ্ট করায় কি সার্থকতা? যমুনার তটে ঝোপে ঝাড়ে বসে কৃষ্ণের বাঁশরী শুনতে পেলেই সে শ্বাস বন্ধ ক'রে বসে পড়ে। আর এই ভাবে শ্বাস ও প্রশ্বাস যতটুকু সে বাঁচাতো তা বাঁশি বাজাবার কাজে লাগায়। ফুঁ দিলে বাঁশি বেসুরো বাজে। বাঁশির ভেতর কিছু থেকে গেছে ভেবে বাঁশির

ভেতরটা চেঁচে সাফ করে বাঁশি তৈরী করে উঠে পড়তো। বাজাতে পেলেই বাঁশি বেস্থরো বাজতো।

গোপন্না এর আগেও অনেক বাঁশি তৈরী করেছে। সে সব বাঁশি বাজিয়ে সে তৃপ্তিও পেয়েছে। কিন্তু একটা অবস্থায় তার মনে এক গভীর প্রশ্ন জাগে। বাঁশি নামিয়ে রেখে সঙ্গীতের কল্পনা করে। কল্পনার যে সঙ্গীত তাকে অনুভূতির রসে আপ্লুত করে বাস্তবে মূর্ত করে তুলতে চায়। একদিন ও সত্যের সন্ধান পায়। সঙ্গীতের অনুভূতি বাদ্যযন্ত্রের সাহায্যে উপলব্ধি করাটা মূর্খতা বলে মনে হয়। জলপ্রপাতকে বাঁশের মধ্যে বেঁধে রাখার চেষ্টা বাতুলতা। সাগরকে ঘড়ার মধ্যে আটকে রাখার প্রচেষ্টা মূর্খতার সামিল। গান গেয়ে সঙ্গীতের যে উপলব্ধি, কল্পনার সঙ্গীতে তার সহস্রাংশের এক অংশও সম্ভব নয়।

কল্পনার স্থরলহরী দিগ্‌দিগন্তে প্রসারিত হয়, আকাশ ছুঁয়ে যায়, সারা অন্তরীক্ষে মঞ্জুরিত হয়ে পড়ে। আস্তে আস্তে মিলনের স্থর মূর্ছনায় জন্ম নিয়ে স্থরসাগর আবার ওঙ্কার ধ্বনিতে রূপ নেয়, সমস্ত পৃথিবীকে মুগ্ধ করার মতো ভয়ঙ্কর অথচ অদ্ভুত রূপে প্রকাশিত। শ্রবণ-সঙ্গীতের মতো এ অপস্বর বা ছন্দোহীন নয়। যেমন সমস্ত দর্শন ও সব সত্য অর্ধ সত্য হ'য়ে অদ্বৈত সত্যের অন্তর্ভূত হয়ে তারই অংশরূপে সমাবিষ্ট, সেইরকমই এই সঙ্গীতে অপস্বর ও ছন্দোহীনতা পূর্ণস্বরের সংস্পর্শে এসে তার সৌন্দর্যকে আত্মসাৎ করে এক রমণীয় রূপ নেয়। 'প্রতি কণায় যেমন ভগবান তেমনি প্রতিটি স্বরেই সঙ্গীত।' এই কথার তাৎপর্য আজ সে বুঝতে পারে। গোপন্নার ক্ষীণকায় দেহ এ অনুভূতি সম্পূর্ণ গ্রহণ করতে পারে না। কল্পনায় যে সঙ্গীতের রূপ সে এঁকেছিল হৃদয় তা গ্রহণ করতে

অক্ষম··· দেহ শিথিল হয়ে আসে, বুক ফেটে যায়। সৌন্দর্য আর আনন্দ অনুভব করা যে এতো অসহনীয় তা সে কোনোদিন কল্পনাও করতে পারে নি। সে আজ তা অনুভব করছে, এ থেকে পরিত্রাণের আর কোনো পথ নেই।

ওকে এই অবস্থা থেকে বাস্তবে ফিরিয়ে এনে বাঁচিয়েছে—কৃষ্ণের বেণু। বাঁশির সুব শুনে সে বিমোহিত, জাগ্রত অবস্থায় সে তাতেই অভিভূত। কল্পনায় যে সুরকে সে অনুভব করতে চাইতো আজ বাস্তবে সেটাই প্রথম সে অনুভব করলো। এর পর প্রতিদিনই সে কৃষ্ণের সঙ্গ নিয়ে তার বাঁশির সুর শুনতো। গোড়ার দিকে গোপিনীবা ওকে দেখে ভয় পেতো, পরে তাকে একটা গাছ কিংবা গরু বলে ভাবতো।

গোপন্না ভাবে শ্রীকৃষ্ণ এই মনোরম সঙ্গীত কি ক'রে ঐ ছোট্ট বাঁশিতে ধরে রেখেছেন। একবার গোপন্না ওঁর বাড়ী গিয়ে ওঁর বাঁশিটা চুরি করে নিয়ে আসে। বাঁশিটা আঁচলের ভেতরে লুকিয়ে নিয়ে আসে। যমুনার তীরে এসে বাঁশি বাজাবার জন্যে আঁচল থেকে বাঁশি বার করতে গিয়ে দেখে বাঁশি নেই।

'কৃষ্ণ নিজেই ছলনাময়··· চোরের রাজা তিনি নিজেই, তাঁব বাড়ীতে চুরি কি ক'রে করবো?' গোপন্না বুঝতে পারে।

চোরের রাজা শ্রীকৃষ্ণ সন্ধ্যেবেলা গোপন্নার বাড়ী এসে বলে, 'গোপন্না! তুমি আমার বাঁশি নিয়ে এসেছো, না? যাক্ তাতে কিছু আসে যায় না, আমাকে আর একটা বাঁশি তৈরী করে দিও।'

কৃষ্ণের মুখে হাসি দেখে গোপন্না ঘাবড়ে যায়।

পরের দিন গোপন্না বাঁশি তৈরী করতে সুরু করে। যেদিন থেকে গোপন্না এই কাজ সুরু করে সেদিন থেকেই ওর মনে এক

নতুন উদ্দীপনা, এক নতুন চেতনা জাগে। আশা আর আনন্দের দোলায় দুলতে থাকে। ওর হাতে গড়া বাঁশি কৃষ্ণের হাতে শোভা পাবে। কৃষ্ণ সেই বাঁশি বাজিয়ে সজীব করে তুলবে। তাই সে বাঁশি তৈরী করতে থাকে। কৃষ্ণের ঠোঁট যে জায়গাটা চুম্বন, আঙুলগুলো যে সব জায়গায় স্পর্শ করবে, সে সব জায়গা গোপন্না সযত্নে মসৃণ করে।

বাঁশি তৈরী করেই বাজিয়ে দেখে, হৃদয় অধীর হয়ে ওঠে। বাঁশির সুর ঠিকমত বেরুলো না, কোথায় যেন চিড় খেয়ে যায়। মনে হয় দু-তিনটে বাঁশি যেন একসঙ্গে বাজছে। কৃষ্ণের হাতে এই বাঁশি বাজবে, এই কথা ভেবেই কি বাঁশি কেঁপে উঠেছিলো? ···

গোপন্না এটা ফেলে দেয়। আর একটা তৈরী করে, সেটাও এই রকম।

দ্বিতীয় দিন আবার অনেক বাঁশ আনলো। দশ-বারোটা বাঁশি তৈরী করে। একটা করে বাজায় আর ফেলে দেয়···

'যতক্ষণ না তোমার এই বাঁশি আমি তৈরী করতে পারবো ততক্ষণ আমি তোমার দিকে তাকাবো না'— মনে মনে গোপন্না সঙ্কল্প নেয়। সেদিন থেকেই এই বাঁশি তৈরী করাটা তার নিত্যকার কাজ হয়ে দাঁড়ায়— সন্ধ্যেবেলায় বৃন্দাবনে গিয়ে শ্যামের বাঁশি শোনা আর সকাল থেকে সন্ধ্যে অবধি বাঁশি তৈরী করা— এই তার কাজ।

গ্রামের সবাই ওর কথা বলাবলি করে, আশ্চর্য লাগে সবার। গোড়ায় গোড়ায় সবাই ওর প্রশংসা করতো। পরে সবাই ঠাট্টা-তামাশা শুরু করলো, বললো গোপন্নার গানের নেশা ছেড়েছে, বাঁশি তৈরী করার নেশা এবার ওকে পেয়ে বসেছে।

যে সব বাঁশি গোপন্না বাজে বলে ফেলে দিতো সেই সব বাঁশি

রাখাল ছেলেরা তুলে নিয়ে যেতো। গোপন্নার ভয় ঐ বাঁশির কোন একটা যেন কৃষ্ণের হাতে না পড়ে। তাই যত বাঁশি সে তৈরী করতো তা নিজের কুটীরের মাচায় রেখে দিতো।

যমুনার তীরে গোপন্নার কুটীর। কুটীরের পাশেই এক জায়গায় বাঁশের গাদা। গাছের তলায় উনুন দেখে গোপন্নাকে সবাই ঠাট্টা করে বলতো, 'বাঁশের একটা ছোট দোকানই খুলে ফেলো না। সঙ্গে সঙ্গে ব্যাবসাও হবে।'

গোপন্নার এই ঠাট্টা-তামাশায় মন দেবার মতো সময় ছিলো না, ছিল না ধৈর্য আর ইচ্ছে।

এ ভাবে পঁচিশ বছর কেটে যায়। কৃষ্ণ বড় হয়েছে। আর সে বৃন্দাবন যায় না; এখন সে নগরবাসী। রাজকার্যেই এখন তার বেশি সময় কাটে। তা সত্ত্বেও প্রত্যেকটা জন্মাষ্টমীর পরের নবমীর দিন সে আবার নতুন উৎসাহে বাঁশি তৈরীর কাজে লাগতো, আর ভাবতো, 'সামনের জন্মাষ্টমীর মধ্যে নিশ্চয়ই তৈরী হয়ে যাবে।' জন্মাষ্টমী আসে আর যায়, কিন্তু বাঁশি আর তৈরী হয় না। না জানি কি করে প্রত্যেকটা বাঁশিতেই চিড় খেয়ে যায়— যেন কেউ উপহাস করছে, কেউ অভিশাপ দিয়েছে…

'বাবা, ওঠো, খাবার খেয়ে নাও!' ছোট গোপন্না ডাক দেয়। গোপন্না ওর দিকে একবার তাকায়, দয়ায় ভরে ওঠে মন। মাকে তো হারিয়েছে, বাপ থেকেও নেই। এই অল্প বয়সে ও-ই রোজ বাপকে রান্না করে খাওয়ায়। নিজেই ও নিজের দেখাশোনা করে, নিজেকে ভুলিয়ে রাখে। এক দিক দিয়ে এটা ভালোই।

জন্মাষ্টমীর পর নবমীর দিন তার বাপের মৃত্যু হলে বাপের অভাব সে আর বুঝতে পারবে না। যে যার পথ আর ভাগ্য নিয়ে চলে।

'খাবার তো খাচ্ছি, কালকে কৃষ্ণের জন্মদিন··· কৃষ্ণের পিতা নন্দর বাড়ীতে গিয়ে চুপি চুপি এই বাঁশিটা দিয়ে বলবি যে তোমার বাবা এই বাঁশিটা পাঠিয়ে দিয়েছে।' ছেলেকে ডেকে গোপন্না বলে।

'আচ্ছা, বেশ, আগে খেয়ে নাও।'

নিজের ছেলেকে দেখতে দেখতে গোপন্নার বালক কৃষ্ণের কথা মনে পড়ে। এদিক ওদিক তাকিয়ে সে হঠাৎ ছেলেকে কাছে টেনে নিয়ে জড়িয়ে ধরে চুমু খায়।

ছোটুর অদ্ভুত লাগে··· এই প্রথম সে চুম্বনের স্বাদ পায়, গালটা পুঁছে ফেলে, বলে, 'খেয়ে নাও না।'

'বাঁশিটা নিয়ে পৌঁছে দিবি তো?'

'তুমি তো এমনি বলো, কাল সকালেই বলবে, এটা ভালো হয় নি, থাক, রেখে দে।'

'না, তা আর বলবো না। এবার যেটা তৈরী করবো, ঠিক করবো। কিন্তু, আমি তো আর দেখতে পাবো না,' করুণ হেসে গোপন্না বলে।

'খেয়ে নাও-না।' ছেলে আবার বলে।

পরের দিন সকালে গোপন্না ছেলেকে স্নান করিয়ে শুদ্ধ করলো, ধূপের গুঁড়ো দিয়ে চুলগুলো শুকিয়ে আঁচড়ে দিলো। আলতো করে একটা টিকি বাঁধলো। তারপর টিকিতে ফুল গুঁজে দিলো। হলদে ধুতি পরিয়ে দিলো। একটা চাদর কোমরে জড়িয়ে দিলো। কপালে কস্তুরির তিলক। চোখে কাজল, যাতে কারুর নজর না লাগে তার জন্যে গালে একটা কাজলের টিপ দিয়ে দিলো। ময়ূরের পালকের তৈরী হাত-পাখা থেকে একটা পালক নিয়ে মাথায় লাগিয়ে দিলো।

গোপন্নার ছেলের কিন্তু এ সব ভালো লাগে না। এ সব আগে সে কখনও বাবাকে করতে দেখে নি। অদ্ভুত লাগে তার। চোখ ছল ছল করতে থাকে। বাবার দিকে করুণ দৃষ্টিতে তাকায়। ছেলেকে নিজের হাতে মনের মতো করে সাজিয়ে প্রাণভরে একবার দেখে নেয় গোপন্না।

গোপন্না চমকে ওঠে··· একি ? এতো বালক কৃষ্ণ··· গোপাল কৃষ্ণ··· এখানে কি করে এলো ? অনেকদিন আগে যে বাঁশি ও নিয়ে এসেছিলো সেই বাঁশিই কি ফেরত নিতে এসেছে ?

গোপন্না খুঁটিয়ে দেখতে থাকে। কোনো সন্দেহ নেই··· ঐ কৃষ্ণ। আপনা হতেই হাত জোড় করে প্রণাম করলো। চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ে। ··· অশ্রু— দুঃখের কি আনন্দের, তা বোঝা যায় না।

'কি হয়েছে বাবা ?' বলে ছেলে থতমত খেয়ে বাবার গলা জড়িয়ে ধরে। বাবাকে প্রণাম করতে দেখে ঘাবড়ে যায়।

গোপন্নাও চমকে ওঠে। চোখের জল মুছে বলে, 'ভগবানকে প্রণাম করলাম বাবা।'

'কোথায় ? আমার বাঁশিটা কোথায় ?' ব'লে গোপন্না চারিদিক তাকায়। কিন্তু বাঁশি দেখতে পায় না।

'মাচার ওপর রেখে দিয়েছি বাবা। রাতে ইঁদুরে কেটে দেবে এই ভেবে।' ভয়ে ভয়ে ছেলে উত্তর দেয়।

'সত্যি ! সর্বনাশ হয়েছে।' গোপন্না বলে।

মাচাতেই তো ইঁদুরের আড্ডা। গোপন্না ছেলেকে বকাবকি করবে ভাবে। কিন্তু পারে না।

মাচায় উঠে দেখে খারাপ বাঁশি ভেবে যেগুলো ফেলে দিয়েছিলো,

সে গুলো স্তূপীকৃত পড়ে আছে। তার মধ্যে কোনটা পুরোনো আর কোনটা নতুন বোঝা শক্ত।

গোপন্না বাঁশিগুলো সব নামালো। এক এক করে বাজিয়ে দেখতে থাকে।

'এটা নয়।'

'এটাও নয়… '

'এটাও তো নয়…'

এক দিক থেকে তুলে নিয়ে অন্য দিকে ফেলতে থাকে। এধারের স্তূপ কমে, ও ধারে বাড়ে। হাতের সময় কমে আসতে থাকে।

দুপুরে ভাত খাবার সময় এলো, চলেও গেলো। কিন্তু গোপন্না 'মা, না, এটা নয়' এই বলে একটার পর একটা বাঁশি পরীক্ষা করে চলেছে।

ছেলের কাজে ব্যস্ত বাবার সঙ্গে কথা বলার সাহস হয় না। তাই সেও ওখানে চুপচাপ বসে থাকে। ঘামেতে কস্তুরীর তিলক গড়িয়ে পড়ে। চোখের কাজল ধেবড়ে যায়। ফুল শুকিয়ে ওঠে। ক্রমে তার আনন্দ ও উৎসাহ কমে আসে। উপোসী থাকায় কেমন একটু যেন নেতিয়ে পড়ে।

গোপন্নার আজ কোনোদিকেই ভ্রূক্ষেপ নেই।

এটা নয়…

এটাও নয়…

এই বাঁশির গাদার মধ্যে নতুন বাঁশিটা লুকিয়ে আছে। সেটাই কি আসল বাঁশি?

জানে না… গোপন্না জানে না। পরীক্ষা ক'রেও সে দেখে নি—আসলই হওয়া উচিত।…

দিন চলে যায়। সন্ধ্যে হয়ে আসে। গোপন্না আলো জ্বালে।

'বাবা, সন্ধ্যে হয়ে গেল, জন্মদিনও তো শেষ হয়ে এলো।' সঙ্কোচভরে ছেলে ব'লে ফেলে। গোপন্না ঘাড় নাড়ে।

আর তুটো, মাত্তর তুটো বাঁশি বাকী। ওর মধ্যে একটা বাজিয়ে দেখে।

এটাও নয়।

শুধু আর একটা রয়ে গেছে। তা হলে এটাই কি?··· জানে না ··· সকাল থেকে সে যে বাঁশি খুঁজছে, সেটা বোধহয় আসল নয়, এই গাদার মধ্যে মিশে গেছে··· এখন যেটা বাকী আছে— বোধহয় সেটাই যেটাকে ও বাজে বলে ফেলে দিয়েছিলো।

শেষ বাঁশিটা বাজিয়ে দেখার সাহস গোপন্নার নেই। সত্যি জেনেও মরার সাহস নেই। আর একটা বাঁশিও তৈরী করার ধৈর্য নেই। তৈরী করার সময়ও আর নেই।

'এটাই সেই,' মনে সাহস এনে গোপন্না বলে।

'মাধব!' ছেলে বলে ওঠে।

'না বাবা··· ছুটে চলে যা··· কানায়ের হাতে দিয়ে আয়··· ও নিজে দেখে বলে দেবে।' গোপন্না বলে।

ছেলে একটুও দেরী করে না। বাবার মত পালটে যাবার আগেই সে রওনা হতে চায়। অন্ধকারে ছুট দেয়।

পঁচিশ বছরের ঝড় আজ থামলো।

গোপন্না তুর্বল হয়ে পড়ে। কাল্পনিক সঙ্গীত অনুভব করার সময় যেমন তুর্বল হয়ে পড়েছিলো, এখনকার তুর্বলতাও অনেকটা সেই রকম। আজকেও তার সেই রকমই মনে হচ্ছে।···

গোপন্না তা হলে কি তার কাজ শেষ ক'রে ফেলেছে? ··· ভগবান কি ওর শুদ্ধ-স্বরের বাঁশি ফিরিয়ে দিয়েছেন।···

এতো বছরের সাধনার পর, এতো বাঁশি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার পর যে বাঁশিটা ও পাঠালো সেটা কিন্তু ও আর পরীক্ষা করে দেখলো না। তার পরীক্ষার ভার ও ভগবানের ওপরই ছেড়ে দিলো। যদি ওটার সুর ঠিকমত না বেরোয় তো উনিই ঠিক করে নেবেন।

দেখতে গেলে ওটা ঠিক কিনা সেটা নির্ণয় করার ক্ষমতা ওর কোথায়? ও কেন এটা ভাবছে ওটা ঠিক কিনা সেটা নির্ণয় করার ক্ষমতা কানাইয়ের নেই?

গোপন্নার হাসি পায়।

কত বড় ভুল··· পঁচিশ বছরের ভুল··· একটা জীবনের ভুল! সে কি রাগ করবে? না, শুধু হাসবে। 'গোপন্না একটা পাগল।' এই ভেবে মুরলীধর মুরলী বাজাবে। সমস্ত শ্রুতি নিজের মধ্যে সমাবেশ করে নিজের উদর থেকে, ওঙ্কার ধ্বনির মূল স্তোত্র ওঁর নাভি থেকে, ওঁর মঙ্গলময় মধুর অধর থেকে···

সেই অধর যা দুধ আর মাখনের স্বাদে মধুর হয়ে উঠেছে, সেই অধর যা রাধার অধরকে পবিত্র করে তুলেছে··· সেই প্রাণের ধারা বাঁশিতে প্রবেশ করে তাকে পবিত্র করে তুলবে।

গোপন্নার পাশে যে বাঁশি পড়েছিলো তার ছিদ্রগুলি দিয়ে মধুর হালকা সুরের মূর্ছনা বেরুতে থাকে। গোপন্না নিজের গালে কোমল স্পর্শ অনুভব করে।

একি? এই বাঁশিটাকে সে কোনো কাজের নয় বলে ফেলে দিয়েছিলো!

পরমুহূর্তে দ্বিতীয় বাঁশিটাও প্রথম বাঁশির মিষ্টি সুরের সঙ্গে সুর মিলিয়ে বাজাতে থাকে। খানিক পরেই ওখানে যত বাঁশি পড়েছিলো

তাদের সমন্বয়ে এক ভুবনমোহিনী সঙ্গীত সৃষ্টি হ'লো। গোপন্না উঠে পড়ে। ভ্রমরকে দেখবার জন্যে কীটেরা যেমনভাবে ঘোরে, গোপন্নাও সেইভাবে চক্কর খেতে থাকে। সব বাঁশি বাজছে। সব কটা থেকে বৃন্দাবনের শ্যামের মধুর সঙ্গীত শোনা যাচ্ছে। সমস্ত সুরই শুদ্ধ। একটা থেকেও খারাপ সুর বেরুচ্ছে না। ওর মধ্যে এমন একটা বাঁশিও ছিলো না যা ঠাকুরকে অর্পণ না করা যায়…

গোপন্না অবাক হয়। আনন্দে, পুলকে তার শরীর শিথিল হয়ে আসে। লক্ষ বাঁশির সুরসাগরে… ভগবান বিষ্ণু স্বয়ং আত্মবিভোর হয়ে বিরাজমান।…

বাঁশির সুরতান বন্ধ হবার কয়েকমুহূর্ত পরেই আরো মিষ্টি পায়ের শব্দ শোনা যায়। ছেলে বোধহয় ফিরে এসেছে। ও বলতে পারবে, গোপন্নার পাঠানো বাঁশিটা ঠিক হয়েছে কিনা। এখন এ কথা জানার কোনো মানেই হয় না। এর চেয়ে বড় সত্যের সন্ধান গোপন্না পেয়ে গেছে।

গোপন্না আস্তে আস্তে চোখ খুলে দেখে— সামনে দরজার কাছে বাল কৃষ্ণ!

পীতাম্বর, কোমরে কাপড় জড়ানো, কপালে কস্তুরীর তিলক, গালে কাজলের কালো চিহ্ন, জটাতে ময়ূরের পালক…

'কানাই, তুমি নিজেই এসেছো!' ব'লে গোপন্না উঠে করজোড়ে প্রণাম করে।

'বাবা, বাবা, কানাই তোমার বাঁশি বাজিয়েছে। আমায় খাইয়েছে… এখানে আমায় চুমু খেয়েছে… আর বাবা… কেষ্ট তোমার বাঁশি বাজাতে যাচ্ছিলো… কিন্তু… অনেক চেষ্টা করলো

···কিছু শোনা গেল না··· আসলে তান বেরুলো না,··· কিন্তু কেষ্ট খুবই ভালো··· আমাকে এখানে চুমু··· ’

গোপন্না আড়চোখে ঘরে পড়ে-থাকা বাঁশিগুলোর দিকে তাকায়।

এতোক্ষণ ধরে তান সেধে ক্লান্ত হয়ে পড়া বাঁশিগুলোর দিকে স্নেহের দৃষ্টি নিয়ে গোপন্না তাকায়। একটা বাঁশি তুলে নিয়ে চুমু খায়।

সুখী হাওয়ার ছোঁয়া

সানাইয়ের সঙ্গে সঙ্গে কাঞ্চিপুরমে সূর্য উঠলো। শেষাদ্রিও জিনের রেকাবের ওপর পা রেখে লাফ দিয়ে ঘোড়ায় চড়ে বসলো। এ অভিজ্ঞতা শেষাদ্রির আগে কোনোদিন হয় নি। তাই একটু ভয় পেয়ে যায়। কিন্তু ভয় পেয়েছে, এ ভাব দেখানোর সময় এখন নয়। লক্ষ জোড়া চোখ তার দিকে, তাকে পরখ করছে। তার প্রতিটি অঙ্গভঙ্গীই এখন গুরুত্বপূর্ণ। এইরকম পরিস্থিতিতে যতটা সাবধান হ'য়ে থাকবে সে, ততই ভালো…

শেষাদ্রি সামলে-সুমলে বসলো। মনে মনে যখন আশ্বস্ত হ'লো যে ঘোড়ার পিঠে ঠাটসে বসতে পেরেছে, তখন সে চারিদিকে একবার তাকালো। সামনে বাজনাবাদ্যি বাজছে। ঢোলের আওয়াজটাই বেশি করে কানে আসছে। যে সে ঢোল নয়। শিবের তাণ্ডব-নৃত্য দেখে বিহ্বল ষাঁড়ের গলার কম্বলের মতো। গলায় সোনার হার শোভা পাচ্ছে, মাথায় ঝাঁকড়া চুল কখনও নাচছে, কখনও দু'ভাগে ভাগ হয়ে আবার বিছিয়ে পড়ছে। কখনও কখনও চুলগুলো ভ্রমরের মতো ঘুরে ফিরে, পূর্ণিমার রাতে সমুদ্রের তরঙ্গের মতো হিল্লোলিত হচ্ছে। এই উন্মাদনায় ঢুলি খুব আন্তরিকতার সঙ্গে সবাইকে ডাক দিয়ে আদর ক'রে, গালে চুমু খেয়ে ঠোঁট নাড়িয়ে ভ্রূ কাঁপিয়ে নানা রকম মুখভঙ্গী, মাথা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে শেষে পরাস্ত হয়ে 'দাসো হম্' ব'লে মাথা নত করে ঢোলের মাধ্যমে স্বামী-স্ত্রীর দাম্পত্য জীবনের

হাজার রকমের ভাবভঙ্গী ব্যক্ত করতে থাকে। বরের দিকেই সবায়ের দৃষ্টি, সেই দৃষ্টি ঢুলি নিজের দিকে আকৃষ্ট করতে থাকে। ঢুলির ওপর বিরক্ত হয়ে সানাই-বাজিয়েরা তাদের সানাইয়ের মুখটা বরের দিকে করে নেয়। বলতে চায় এই হ'লো শেষাদ্রি, এ আজ বর সেজেছে, সবায়ের দৃষ্টি আজ এর দিকেই নিবদ্ধ। বাজনাদারদের পাশে দাঁড়িয়ে সমঝদাররা বাজনা উপভোগ করছিলো। সানাই আর ঢোলের সঙ্গে মাথা নাড়িয়ে তারা সমানে চুট্‌কি ও তালে তাল দিয়ে চলেছে। বরের পেছনে রেশমী শাড়ী পরে সৌভাগ্যবতী রমণীরা আর ঘাগ্‌রা আর ওড়না পরা কুমারীদের দল— নিজের নিজের বয়স ও সামর্থ্য অনুযায়ী বেশভূষা করে শোভাযাত্রার শোভা বাড়াচ্ছিলো। ভাবছিলো শুধু এই শোভাযাত্রা কেন, সারা পৃথিবীটা আমাদের ওপর ভর করে এগুচ্ছে। এই চিন্তায় উল্লসিত তন্বীর দল মন্দগতি হাঁসেদের চকিত ক'রে মত্ত হাতীর সঙ্গে যেন পাল্লা দিয়ে এগিয়ে চলেছে। সবায়ের অলক্ষ্যে শেষাদ্রি একবার নিজের দিকে ভালো করে তাকিয়ে নেয়। আশ্বস্ত হয় এই ভেবে যে বর হিসেবে তার কিছু খামতি নেই। মাটিতে লুটিয়ে-পড়া ধুতির কোঁচা, চকমকে সেণ্ট-লাগানো রেশমের পাঞ্জাবী, বাঁ কাঁধ থেকে ডান কাঁধ অবধি ঢাকা রেশমী চাদর, গলায় ফুলের মালা! তার আর কিসের অভাব? দিব্যি জাঁকিয়ে বসে আছে। এই অবস্থার একটা ফটো তুললে ওকে ঠিক শোভাযাত্রার মধ্যে হেঁটে চলা ছোট গাধার মতো দেখাবে।

শেষাদ্রি আবার মাথা তুলে তাকায়। কারুকার্য করা মাটির পাত্রে পেট্রোম্যাক্সের আলো জ্বলছে। দু'ধারে সারিবদ্ধ পেট্রোম্যাক্স। তার মধ্য দিয়ে শোভাযাত্রা এগিয়ে চলেছে, ঠিক যেন ফুল দিয়ে সাজানো একটা নৌকো। শেষাদ্রির মুখে মৃদু হাসির একটা রেখা

ফুটে উঠেই মিলিয়ে যায়। মনে হয় এ যেন ক্ষণিক ঐশ্বর্যের প্রাচুর্য।

কিংবা একে একদিনের রাজত্বও বলতে পারা যায়। যতক্ষণ না গাঁটছড়া বাঁধা হচ্ছে ততক্ষণই এই রাজত্ব। ধূপ, দীপ ইত্যাদি ষোড়শ উপচার। এখন সে যদি ইচ্ছে করে তো পাহাড়ের ওপর বসে থাকা বাঁদরও তার কাছে ছুটে আসবে। 'ভাই শেষাদ্রি!' 'বাবা শেষু!' 'আরে শেষ ভাই!' ইত্যাদি বিভিন্ন সম্বোধনে শেষাদ্রির সঙ্গে নিজেদের আত্মীয়তা করে তাঁরা সবাই শেষাদ্রিকে বিবাহবাসরে বসিয়ে, গার্হস্থ্য জীবনে প্রবেশ করিয়ে যে যার ডেরায় ফিরে যাবেন।

এটুকু তো বোঝা গেল। কিন্তু তারপরে?

যদি সহচরী সতীসাধ্বী আর ওর মনের মতো হয় তো জীবন স্বর্গ-সুখের মতো। এর উল্টোও তো হতে পারে।

তাই কোনো এক অভিজ্ঞ লোক বিয়ে করাটা লটারী বলেছেন।

শেষাদ্রির বেলায় এ কথাটা খুব খাটে। কেন না বিয়ের আগে নিজের সহচরীকে একটিবার দেখার সুযোগও সে হারিয়েছে। শুধু বাইরের জাঁকজমক দেখে ভেতরের মানুষটাকে বিচার করা মূর্খতা সে শেষাদ্রি জানে। বিশেষ ক'রে সংসারে অভিজ্ঞ তার মা যখন এই সম্বন্ধ ঠিক করেছেন তখন দেখার কোনো মানেই হয় না। তাই সে চট্ করে তার মত জানিয়ে দেয় যে তার মেয়ে দেখার কোনো দরকার নেই, এই বিয়েতে তার সম্পূর্ণ মত আছে।

'তুই তো বেশ বুঝতে শিখেছিস! আমার মতেই যদি সব চলে তা'লে পরে শ্বাশুড়ী-বৌতে আর ঝগড়ার কোনো সম্ভাবনাই থাকবে না। এটাই তো তোর মতলব, কি বল?' পার্বতম্মা সচকিত হয়ে প্রশ্ন করেন।

'দেখতে হবে তো কোন মায়ের বেটা!' হাসতে হাসতে শেষাদ্রি জবাব দেয়।

সানাইয়ের সুরের মধ্যে স্বপ্নের পূর্ণতা দেখে প্রসন্নচিত্তে শেষাদ্রি সাবধানে আস্তে আস্তে ঘোড়া থেকে নেমে দু-চার পা এগুতেই পেছন থেকে হঠাৎ শুনতে পায়, 'ডান পা, ডান পা'। শেষাদ্রি থেমে যায়।

পা নেড়ে চেড়ে দেখে নেয়, দেখে পা তো ঠিকই আছে।

'সে কথা বলছি না! প্রথমে ডান পা দিয়ে এগুতে হয়।' বলতে বলতে একজন বয়স্থ লোক এগিয়ে আসেন।

'আচ্ছা, তাই বলুন। কিন্তু আপনার ডান পা ডান পা শুনে তো মাথায় বজ্রাঘাত হয়েছিলো।' শেষাদ্রি জবাব দেয়।

'বিয়ের শুভলগ্নে এ ধরনের অমঙ্গলের কথা বলতে নেই বাছা। তোমার বলা উচিত যে অমঙ্গলের হাত থেকে আমায় বাঁচিয়ে দিয়েছো কাকা।' শেষাদ্রিকে তার কাকা উপদেশ দেন।

কয়েক মুহূর্ত শেষাদ্রির মনে হয় কাকা ঠিকই বলেছেন। ঠিক সময়ে দীনবন্ধুর মতো এসে কাকা তাকে উপদেশ দিলেন ব'লেই তো কুক্ষণ কেটে গেল। একটা না একটা পা তো তাকে বাড়াতেই হ'তো। বাঁ-পাও তো বাড়াতে পারতো। তা হলে কি হ'তো? এ প্রশ্নের সোজা কোনো জবাব নেই। বেশি চিন্তা করলে, একটা শঙ্কার সমাধানের বদলে সহস্র শঙ্কা মনে জাগবে।

আচার-বিচারের অন্ধ অনুকরণে শেষাদ্রির বিশ্বাস নেই। সকালে ঘুম ভাঙার পর থেকে রাতে শুতে যাওয়া অবধি এই সব অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কারের বাধা পদে পদে মানুষকে বিব্রত করে, দেশ থেকে এই সব বাধা দূর করার স্বপ্ন দেখে শেষাদ্রি। সুযোগ পেলেই বড় বড় সভায় এই বিষয়ে সে বক্তৃতা দিতো। কথায় বলে, বোলচালে

সাত সমুদ্দুর তেরো নদী পার করা যায়, আসলে ঘরের চৌকাঠও পার হতে পারে না। কথাটা কিন্তু একেবারেই মিথ্যে। শেষাদ্রি অনায়াসেই চৌকাঠ পার হয়েছে। চৌকাঠ পার হবার সময় শেষাদ্রি আপনা হতেই কিংবা জেনেশুনে ডান পা দিয়ে শ্বশুরবাড়ীকে পবিত্র করেছে।

সবুজ নারকেল পাতার তাজা মিষ্টি সুগন্ধে-ভরা প্যাণ্ডেল থেকে উঠে শেষাদ্রি ঘরের মধ্যে দিয়ে তার জন্যেই পাতা মাতুরের ওপরে গিয়ে বসলো। কাজে ব্যস্ত থাকায় যে সব মহিলারা এতক্ষণ বর দেখতে পায় নি তাঁরা এবার শেষাদ্রিকে ঘিরে ধরলেন। মাতুরের ওপর শুয়ে যে সব বাচ্ছারা ঘুমিয়ে পড়েছিল বাইরের বাদ্যির আওয়াজ প্যাণ্ডেলের মধ্যে পৌঁছোতেই তারা·সব উঠে বাজনার সুরের সঙ্গে তাল মিলিয়ে গুণগুণ করতে থাকে। শেষাদ্রি যেখানে বসেছিলো সেখানে হাওয়ার লেশমাত্র নেই। অপরিচিতদের মধ্যে বসে সবায়ের দৃষ্টি তার ওপর লক্ষ্য করে শেষাদ্রি প্রায় হাঁফিয়ে ওঠে।

সময় কেটে যায়। শেষাদ্রি বুঝতে পারে না আর কতক্ষণ তাকে এইভাবে স্থির হয়ে এই জায়গায় ব'সে থাকতে হবে। যতই সে নির্লিপ্ত থাকার চেষ্টা করুক না কেন, বিয়ের লগ্ন যতই এগিয়ে আসতে থাকে ততই তার মনে হয় সে যেন কাঁটার আসনে বসে আছে। যতক্ষণ না কনেকে তার সামনে আনা হচ্ছে ততক্ষণ বোধ হয় ওর এই অবস্থাই থাকবে। কিন্তু তাড়াহুড়ো করে লাভ কি? আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকলাপ হ'য়ে যাবার পরই দেবীর আবির্ভাব হবে।

শেষাদ্রি ঘড়ি দেখে— দশটা বাজে। সাড়ে দশটায় নিমন্ত্রিতেরা খেতে বসলো। শেষ ব্যাচের লোকেদের খাওয়া শেষ হ'তে এগারোটা হ'লো।

খাওয়ার পর শেষাদ্রি একটু বিশ্রামও করতে পারলো না। তাকে উব্‌টানের (অনেকটা গায়ে হলুদের মতো অনুষ্ঠান) জন্যে নিয়ে গেলো।

গালে আর হাতে চন্দন মাখিয়ে সারা গায়ে গোলাপ জল ছিটিয়ে দিলো। মাঝরাতে ঠাণ্ডা হাওয়ার মধ্যে উব্‌টানের এই অনুষ্ঠান শেষাদ্রির ভালো লাগে না। তবুও সে ঠোঁটের কোণে হাসিটুকু টেনে রেখে নিয়মমাফিক বরের ভূমিকায় সুষ্ঠুভাবে অভিনয় ক'রে গেলো।

উব্‌টানের ক্রিয়াকলাপও শেষ হ'লো। পীতাম্বর পরে কোমরে চাদর জড়িয়ে পণ্ডিতজী জলচৌকির ওপর ঘট স্থাপনা করলেন আর স্বস্ত্যয়ন পাঠ শুরু করে দিলেন। সারা রাত জেগে থেকে শেষাদ্রির চোখ লাল হয়ে যায়। কোনোরকমে বিয়ের পিঁড়িতে গিয়ে ব'সে পড়ে। যে সব বাচ্চারা হৈ চৈ করছিলো তারা সব শুয়ে পড়েছে, প্যাণ্ডেল তাই নিস্তব্ধ। প্রতীক্ষার শেষ সীমানায় পৌঁচেছে শেষাদ্রি। এখন যেন প্রতিটি মুহূর্ত তার কাছে এক একটা যুগ। যেন তার সহ্যশক্তির পরীক্ষা চলছে।

শেষাদ্রি মাথা নিচু করে বসেছিলো। প্যাণ্ডেলের মধ্যে থেকে একদিকে কিছু লোক সরে গিয়ে অন্যদের আসার পথ করে দেবার একটা মৃদু গুঞ্জন শেষাদ্রির কানে আসে। হঠাৎ মাথা তুলে সে তাকায়। একজন এয়োস্ত্রী পথ দেখাতে দেখাতে এগিয়ে আসছিলেন ; একজন কুমারীকে ধরে কনে এক পা এক পা করে বিয়ের জায়গার দিকে এগিয়ে আসে।

এক··· দুই··· তিন··· পলকহীন দৃষ্টিতে শেষাদ্রি তাকিয়ে থাকে। কনের বেশ মানানসই দোহারা চেহারা। চোখ ধাঁধানো রেশমী

শাড়ীতে তাকে যেন শোভাযাত্রার কোনো দেবীমূর্তি মনে হচ্ছিলো। গায়ের রঙ ধব্‌ধবে সাদা নয় গোলাপের পাপড়ির মতো একটু সাদা ও হলদে মেশানো, দুয়ে মিলে যে রঙ হয়, তাই। কাজলের রেখার মধ্যে আধফোটা কুঁড়ির মতো চোখ। চোখমুখ দেখে মনে হয় এতই সরল যে পৃথিবীটাকে এখনও দেখে নি। শেষাদ্রি অবাক হয়— সাংসারিক বুদ্ধিতে চৌকস তার মা এই মেয়ের মধ্যে কি যেন একটা দেখেছিলো যাতে ঘরের বৌ করবে বলে ঠিক করেছিলো।

শেষাদ্রির নিজের ওপর একটু রাগই হয়। মেয়েটিকে আগে দেখলে সে এ বিয়েতে রাজী হ'তো না। রূপ এ মেয়ের কম নয়। এ সৌন্দর্য কাঁচের আলমারিতে সাজিয়ে রেখে উপভোগ করার মতো, তাকে বাস্তবে টেনে আনতে শেষাদ্রির মন চায় না: পুতুলের বিয়েতে যে মেয়ে লজ্জা পায় সেই লজ্জাবতীকে যুদ্ধক্ষেত্রে টেনে আনতে কি মন চায়? এই স্নিগ্ধ লাবণ্যময়ী ঘরের কাজেকর্মে জড়িয়ে পড়ুক, এটা শেষাদ্রি চায় না। মার মতো সেও যদি এই মেয়েকে বিয়ে করার কথা ভাবতো, এত তাড়াতাড়ি করতো না। মেয়েটিকে বলতো, আরো চার বছর অপেক্ষা করো আর এই ক'বছর বেশ মন দিয়ে সাংসারিক জীবনটা কি তা দেখে নাও।

পাতার মধ্যে ফুলকে যেমন দেখতে লাগে, সমস্ত লোকের মধ্যে কনেকেও ঠিক তেমনি লাগছিলো। কনের সুন্দর মুখখানি দেখার আগ্রহে শেষাদ্রি বার বার আড়চোখে কনের দিকে তাকায়। মনে মনে হাসে শেষাদ্রি— বড়রা কতই তো কথা বলে। বলে, দেহের সৌন্দর্যের চেয়ে অন্তরের সৌন্দর্য অনেক বেশি মূল্যবান। কিন্তু চোখের সামনে যে রূপকে দেখা যায় তাকে উপেক্ষা করা

মানুষের সাধ্যি নেই। হাসা, গাওয়া, কথা বলা, লজ্জা পাওয়া, চলন বলন, কখনও কখনও একটু রাগ দেখানো— রূপের হাজারো অঙ্গ। এই রঙ-বেরঙের সুতোয় বাঁধা দোলনায় দোলাটাই মানুষের রূপের আস্বাদ।

কিন্তু সব সুন্দর বস্তুই তো কমনীয় নয়। সুন্দর দেখতে কিন্তু খাবার সময় কাজে আসে না এমন বেকার দাঁতও তো কত আছে। এমন অনেক ফুল আছে যা দেখতে হয়তো খুবই সুন্দর, কিন্তু শুঁকলেই আমরা নাক সিটকাই। শতদলের সঙ্গে চামেলীর সৌন্দর্যের তুলনা? কিন্তু চামেলী যে সুগন্ধে ভরা। এত রঙচঙে পলাশ ফুল কেই বা মাথায় গোঁজে ; পুজোতেও কাজে লাগে না। মেয়েদের খোঁপায় আর নারায়ণের পায়ে মল্লিকাই শোভা পায়। তাই বোধহয় লোকে বলে রূপের চেয়ে গুণই বড়।

এই চিন্তায় ছেদ পড়ল। শেষাদ্রি এখন অন্য কথা ভাবে। বর সেজে বেরুবার সময় ওর মায়ের অশ্রুমাখা মুখখানা শেষাদ্রির হঠাৎ মনে পড়ে যায়। ছেলের বিয়েতে মার তো খুশীই হওয়া উচিত।. গানেব বেসুরো পর্দার মতো এ অশ্রু কেন? হতে পারে যে ছেলের বিয়ের পর মাকে অনেক দায়িত্বই বৌকে ছেড়ে দিতে হয়। এই দায়িত্ব বৌ কতদূর সুষ্ঠুভাবে পালন করতে পারবে তা ভবিষ্যতই বলতে পারবে। এ ব্যাপারে একটা প্রবাদ আছে যে স্বামী বাড়ী ফিরলে বৌ তার পিঠ দেখে আর মা তার পেট দেখে। বৌয়ের নজর সব সময় স্বামীর রোজগারের দিকে আর মা সবসময় লক্ষ্য করেন ছেলের সুখসুবিধের দিকে। মা চায় ছেলে তার সব ব্যাপারেই খুশী থাকুক। স্ত্রী ভাবে স্বামীর কাছ থেকে সে কতটা সুখ পাচ্ছে। ভর্তৃহরি সহধর্মিণীর গুণের বর্ণনা করতে গিয়ে

বলেছেন, 'কার্যেষু দাসী, করণেষু মন্ত্রী।' এই সব কথা ভাবলে মনে হয় দাম্পত্য জীবনে সুখ ও শান্তি ঈশ্বরের কৃপা ছাড়া সম্ভব নয়।

শেষাদ্রি এই সব চিন্তায় বিভোর ছিলো। পণ্ডিতজী বিয়ের সব ক্রিয়া-কাণ্ড শেষ করে বাজনাওয়ালাদের বাজনাবাদ্যি বাজাতে বললেন।

অসঙ্গত বাক্যালাপ, অপ্রাসঙ্গিক পরিহাস আর অযাচিত আদর-আপ্যায়নে শেষাদ্রি ক্লান্ত হ'য়ে উঠলো।

বিকেলে একটু খোলামেলা জায়গায় ঘুরে আসার জন্যে শেষাদ্রি গাঁ থেকে দূরে চলে গেলো। চেঁচামেচি হৈ-হুল্লোড়ের মধ্যে বড়ই অতিষ্ঠ হয়ে পড়ছিলো সে। ত্যাগরাজ বলেছিলেন শান্তি না হলে সুখ পাওয়া যায় না। সঙ্গীতের মধ্যে তিনি শান্তি খুঁজে পেয়েছিলেন। শেষাদ্রি হয়তো নির্জনে শান্তি পাবে। পথে যেতে যেতে সে আবার চিন্তার মধ্যে ডুবে যায়। জানি না কেন এই জগতে সকল সুখের মধ্যে দুঃখের একটা রেশ থাকে। সংসারে সবচেয়ে আনন্দের ঘটনা বিবাহ। সৃষ্টির আদি থেকে মানব-সভ্যতার ক্রমবিকাশের শ্রেষ্ঠ সোপান বিবাহ। তিন মাস আগে ওর বিয়ের ঠিক হয়ে গিয়েছিলো। সেদিন থেকেই বর্ষার জলে ভরা দীঘির মতো শেষাদ্রির মন এক অব্যক্ত আনন্দে কানায় কানায় ভরে থাকতো। আগে সে কল্পনায় দেখতো তার স্বপ্নের সুন্দরী তার মানস আকাশে বিদ্যুতের মতো দেখা দিয়েই মিলিয়ে যায়। সেই কল্পনাই আজ বাস্তবে তার অপেক্ষায়। তার হৃদয়বীণায় আজ আনন্দের রাগিনী বাজছে আর তাতে সে আত্মবিহ্বল হয়ে পড়েছে। এই আত্মবিহ্বল অবস্থায় মনে নানান চিন্তা জাগে— নিজের জীবনসঙ্গিনী এই মেয়েটি কেমন? কেমন লাগবে তাকে? মা বলে সে মুক্তোর মতো, মুগার মতো, প্রদীপের মতো উজ্জ্বল। এই বর্ণনায় চোখের সামনে

কোন রূপ ধরা দেয় না বটে কিন্তু উৎসবের জন্যে তৈরী খাদ্য-দ্রব্যের মতো জিভে জল আসে।

আসলে অপেক্ষা করার মধ্যেই সুখ আর দুঃখ দুধে জলের মতো মিশে আছে। মিলনের কল্পনাতেই সুখ আর এই মিলনের দেরীতেই দুঃখ।

কোনোমতে তিনটে মাস কাটলো।

তার গ্রহের ফের এখনও কাটে নি।

এখন এমন হয়েছে স্ত্রীর হাসিতে যে মুক্তো ঝরে পড়ে তা সে কুড়োতে পারে না। ঠোঁট কাঁপলে তার থেকে আর মধুর আস্বাদন পায় না। সেই শুভদিনের জন্যে এখন তাকে চারদিন অপেক্ষা করতে হবে, কেন না বড়দের আদেশ।

নদীর ধারে বসে শেষাদ্রি সন্ধ্যেবেলার সৌন্দর্য দেখতে থাকে। আকাশে মেঘ, বাতাসে পাখী আর জলে মাছ সব ছুটছে জোড়ে জোড়ে। শেষাদ্রি চোখ বন্ধ করে। নদীর ধারে গাছের ঘন শাখায় বসে এক কোকিল আমের কচি কচি পাতা খেতে ব্যস্ত নিজের নবীন সাথীকে গভীর সুরে ডাকছিলো। শেষাদ্রি কান চাপা দেয়।

চোখ খুলতেই শেষাদ্রি দূরে পাহাড়ের গায়ে ভাসমান মেঘগুলো দেখতে পায়। জ্যোৎস্নার আলোয় ঝলমল করছে তারা।

ফেরার পথে গ্রামেতে সে পথ হারিয়ে ফেলে। চাঁদের আলোয় খেতের নিশানা মিলিয়ে মিলিয়ে যখন সে বাড়ী ফিরলো তখন রাত নটা বেজে গেছে। বরযাত্রীরা সব খাওয়া-দাওয়া সেরে যে যার ফিরে গেছে। বেলা পাঁচটার পর বরের দেখা না পেয়ে কনেপক্ষ দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে সারা গাঁ তন্ন তন্ন করে খুঁজে বেড়াচ্ছিলো। বরের দেখা পেয়ে তাদের যেন ধড়ে প্রাণ এলো। কন্যাপক্ষের লোকেরা ভাবে, বোধহয় তাদের আদরআপ্যায়নে কোনো ত্রুটি

হয়েছে যার জন্যে বর রাগ করে এতক্ষণ অন্য কোথাও লুকিয়েছিলো। তাই শেষাদ্রিকে পেয়ে তারা আদর-আপ্যায়নের মাত্রা দ্বিগুণ বাড়িয়ে দিলো। তাদের এই আদর-আপ্যায়নে শেষাদ্রি খুব বিব্রত বোধ করছিলো। রাত্রিবেলা ঠিকমত খেতে পারলো না, একটু খেয়ে উঠে পড়লো। জামাই যে খুব রেগে গেছে শেষাদ্রির আহার দেখে এই ধারণাটা কন্যাপক্ষের বদ্ধমূল হ'লো।

'শোবার ব্যবস্থা কোথায় করবো?' শেষাদ্রিকে তার শালা জিজ্ঞেস করে।

'যে কোনো জায়গায় হ'লেই হবে। কিন্তু কয়েকটা শর্ত আছে। কাছে পিঠে কেউ বক বক করলে আমার ঘুম আসে না। পিঁপড়ের চলার শব্দেও আমার ঘুম ভেঙে যায়। হাওয়া থাকা চাই জায়গাটাতে। আমার মনে হয় দালানটাই ভালো হবে।' শেষাদ্রি বলে।

'আমাদের এখানে বেশ ঠাণ্ডা পড়ে। আপনার বোধহয় সহ্য হবে না। আর দ্বিতীয়ত…'

শালাকে মাঝ পথে থামিয়ে শেষাদ্রি একটু রেগে উঠে বলে, 'সে সব ঠিক আছে ভাই, তুমি ও সব নিয়ে মিছিমিছি চিন্তা কোরো না। আমি ঠিক শোব'খন।'

গত দুদিন সে শুতে পারে নি। তাই ভেবেছিলো শুলেই ঘুমিয়ে পড়বে কিন্তু তার সেই আশা পূর্ণ হ'লো না। শালা ঠিকই বলেছিল, ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে, আর সেই সঙ্গে মশার উৎপাতও। শেষাদ্রি চাদরের খোঁজে আশেপাশে তাকাল, বালিশটাও তুলে দেখলো, কিন্তু কোথায়ও চাদর নেই।

এবার শেষাদ্রির সত্যিই রাগ হয়।

চাদর মুড়ি দিয়ে শোয়া তার অভ্যেস। তাই ঘুম আসে না।

সেদিন বোধহয় ঘুম ওর কপালে লেখা ছিলো না। তা না হলে এতো আদর-আপ্যায়ন যারা করছে তারা চাদর রাখতে ভুলে যাবে কেন ?

গামছাটা খুলে গায়ে জড়াবার চেষ্টা করল। কিন্তু পা পর্যন্ত ঢাকা পড়লো না। মাথার দিকে টানলে পা ঢাকা পড়ে না আর পায়ের দিকে টানলে মাথার থেকে খসে পড়ে।

শেষে নিরুপায় হয়ে হাত-পা গুটিয়ে খাটে কুঁকড়ে শুয়ে রইলো, যেমন থাকে মায়ের পেটে বাচ্চা। সময় আস্তে আস্তে কেটে যায়।

শেষাদ্রির চোখ আস্তে আস্তে বুজে আসে। কাঁচা ঘুমে ও হঠাৎ চমকে ওঠে। মনে হয় নরম কিছু একটা জিনিস চলে বেড়াচ্ছে। শেষাদ্রি চোখ খুলে দেখে তার গামছার পর্দার ওপর দিকে একটা ছায়ামূর্তি দাঁড়িয়ে। মুখের আবরণ সরাতে যেই হাতটা তুললো, অমনি হাতের শালটা যেখানে ছিলো সেইখানেই ফেলে দিয়ে ছায়া মূর্তি পালালো। শেষাদ্রি চট্ করে হাত বাড়িয়ে তাকে নিজের কাছে টেনে আনবার চেষ্টা করলো।

কিন্তু ততক্ষণে সে হাত ফসকে বেরিয়ে গেছে। শুধু তার বিনুনিটা তখনও শেষাদ্রির হাতে সেটাও এক-আধ মুহূর্তের ধস্তা-ধস্তিতে হাত ফসকে গেলো। বিনুনির চারটে সুস্নিগ্ধ ফুল তার হাতে রয়ে গেলো।

হাতের মুঠোর মধ্যে সেই ফোটা ফুলগুলো নিয়ে শেষাদ্রি দেখতে থাকে। এ যেন ফুল নয়, আনন্দময় নতুন জীবনের চিহ্ন, পবিত্র প্রেমের আলেখ্য। মন দিয়ে মন পাবে বলে যে অর্ধাঙ্গিনীর জন্যে তপস্যা করেছিলো, তাতেই পেয়েছে ঈশ্বরের আশীর্বাদ।

ফুলের মিষ্টি গন্ধে নিজেকে হারিয়ে ফেলে শালের হালকা উষ্ণতার স্পর্শে শেষাদ্রি ঘুমিয়ে পড়ে।

ঘুমোচ্ছি

প্রায় একঘণ্টা হ'লো ঘুমের ওষুধ খেয়েছি। কিন্তু কোনো কাজ হয়েছে বলে মনে হচ্ছে না। বারোটা অবধি বিছানায় এপাশ-ওপাশ করলাম, শেষে নিরুপায় হয়ে ওষুধটা খেলাম। অন্ততঃ ঘণ্টা দু-তিন না ঘুমোলে বদহজম হবে। হজম না হ'লে সকালে শরীরটা ম্যাজম্যাজ করবে, আবার ওষুধ খেতে হবে। তাই ঘুমের ওষুধ এখনই খেয়ে নিলাম।

বাড়ীতে কেউ ছিলো না। তাই ভাবলাম একা খুব খানিকক্ষণ ঘুমোবো। দুপুরবেলা, এখনও দু'চোখের পাতা এক করতে পারি নি ; পোস্টম্যানের গলা ফাটিয়ে চিৎকার, বুকের ভেতরটা ধড়াস্ করে উঠলো। চিঠি খুলে দেখি মহিলা-মহলের চাঁদার রসিদ। বাজে রসিদটা ওয়েস্ট-পেপার বাক্সেটে ফেলে দিয়ে আবার শুয়ে পড়লাম। বুকের ভেতরটা এখনও ধড়ফড় করছে, জল তেষ্টা পাচ্ছে, কিন্তু একটু জল দেবে. হাতের কাছে এমন লোক নেই। খাটের এক পাশে কুঁড়েমি করে শুয়ে থাকি। একটু বাদে বুকের ধড়-ফড়ানিটা কমলো। পাশের টেবিল থেকে কাগজটা টেনে নিয়ে পড়তে সুরু করলাম। এ্যাপোলো এগারো পৃথিবীতে নিরাপদে ফিরে আসার খবর প'ড়ে মনটা একটু শান্ত হয়। যেদিন চন্দ্রমণ্ডলের দিকে এর যাত্রা সুরু হযেছিলো সেদিন থেকেই নানা চিন্তা মনে ঘুরপাক খাচ্ছিলো ; ওরা পৃথিবীর বাইরের অরবিটে পৌঁচেছে কিনা,

চন্দ্রের চারিদিকে পরিক্রমা সুরু হয়েছে কিনা, এল. এম.-এর সব কলকব্জা ঠিক আছে কিনা, এল. এম. চাঁদে নেমেছে কিনা, এই ধরনের নানান চিন্তা সারাক্ষণ মনে ভীড় করে থাকতো। সকালে খবরের কাগজের প্রত্যাশা আর বিকেলে রেডিওর খবরের প্রতীক্ষা, সারারাত সেই একই চিন্তা। কুড়ি তারিখে ঘুম আসবে না ব'লে প্রতিজ্ঞা করেছিলো। এল. এম. চাঁদ ছেড়ে এসে কলম্বিয়ার সঙ্গে জুড়েছে কি-না, এই সব চিন্তাতেই মন তখন বিভ্রান্ত। আব থাকতে না পেরে মাঝরাতেই খবরের কাগজের অফিসে ফোন করে বসলাম। এই মাত্তর এল. এম.কে কলম্বিয়ার সঙ্গে জোড়া হয়েছে জানতে পাড়লাম। খবরটা জেনে তবে মনটা শান্ত হ'লো।

আবার চিন্তায় ডুবে গেলাম। পৃথিবাব বুকে ফিবে আসার মতো ক্ষমতা আছে কিনা ; এই ভাবনা মনকে পীড়া দিতে থাকে। আসলে এ সব চিন্তার কি দরকার ? এ সবের সঙ্গে আমার সম্বন্ধই বা কি ? মনকে অনেকভাবে বোঝাবার চেষ্টা করি। কিন্তু ত্নিয়ার সব সমস্যাই যেন আমার নিজের সমস্যা। তাই নিজের চোখে ঘুম নেই। এ্যাপোলোর সমস্যা মিটতে না মিটতেই আবার রাষ্ট্রপতির সমস্যা। সারারাত ইন্দিরা গান্ধী আর নিজলিঙ্গপ্পার কথা ভাবি।

সারাদিন ছেলেটার চিঠির প্রত্যাশায় কেটে যায়। রান্নাঘরে কাজ করতে করতে কিংবা আরাম কেদারায় বসে ওদের কথাই চিন্তা করছি। ওরা তো নিজের সংসার নিয়েই মশ্‌গুল। বাপ-মার কথা ভাববার সময় কোথায় ? মাঝে মাঝে ভাবি ছেলের কাছে গিয়েই থাকি, কিন্তু সেটা বোধহয় উনি পছন্দ করেন না। ওদের স্বাধীন সংসারে আমাদের নাক গলানো ঠিক হবে না। ওদের জীবন-ধারা আলাদা, চিন্তাধারা আলাদা। ওদের সঙ্গে

আমাদের মতের মিল হবে না! আমাদের এখানে থাকাই ভালো—উনি এক লম্বাচওড়া লেকচার দিলেন। ওঁর নিজের কোনো চিন্তা নেই। রিটায়ার করেছেন। বাড়ীভাড়ার টাকা পা'ন। ছেলেও মধ্যে মধ্যে টাকা পাঠায়। ইচ্ছে হলেই লিখতে বসেন। পত্র-পত্রিকার জন্যে প্রবন্ধ কিংবা সভা-সমিতির জন্যে কোনো ভাষণ। দিনের বেলা হয় কারুর সঙ্গে দেখা করতে যান, নয়তো ঘরে আপন মনে বসে কিছু লেখেন। কিন্তু হয়রানি তো আমারই হয়। না পারি রান্না-ঘরের কাজ, না পারি চুপচাপ বসে থাকতে। তাই আজেবাজে চিন্তায় সারাক্ষণ জ্বলতে থাকি।

আমি যখন একটু আরামে ঘুমোতে পারতাম, তখন কেউ আমাকে ঘুমোতে দেয় নি। একটা দিনের জন্যেও নিশ্চিন্তে ঘুমোতে পারি নি। খুব ছোটবেলার কথা মনে নেই। দুনিয়াকে যেদিন থেকে চিনতে শিখেছি সেদিন থেকে শুধু দেখেই আসছি। তখন ক্লাশ ওয়ানে পড়তাম, গাঢ় ঘুম থেকে উঠিয়ে মা বলতেন, 'ওঠ, ওঠ-না, স্কুল যেতে হবে যে। তাড়াতাড়ি তৈরী হয়ে নে।' মা ধার্মিক প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। রান্নাঘরে ঢোকার আগেই আমার নাওয়া, খাওয়া, সাজগোজ সব সেরে নিতে চাইতেন। ভোর হবার আগেই আমাকে তুলে দিতেন। গরমকালে রাত্তিরে তাড়াতাড়ি ঘুম আসতো না, সকালবেলা তাড়াতাড়ি ঘুম ভাঙতেও চাইতো না। কিসের যে এতো তাড়া বুঝতাম না, ভোরবেলা মুখে জলের ছিটে দিয়ে মা আমাকে উঠিয়ে দিতেন। রবিবারে মাথা ঘসে ভালো করে স্নান করতে হ'তো। তাই সেদিনও আরাম করে বেশিক্ষণ শোবার জো ছিলো না। গরমের ছুটির আগে সকালবেলায় স্কুলে যেতাম, ঘুম জড়ানো চোখে স্কুলে গিয়ে বসতাম। পরীক্ষার সময় বই হাতে নিতে না

নিতেই ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসতো। যাতে বইখাতা তুলে দিয়ে ঘুমিয়ে না পড়ি তাই বাবা পাশে বসে পড়া দেখিয়ে দিতেন। সারাক্ষণ হাই উঠতো। জোর করে হাই চেপে রেখে পড়া করতাম। ভোর হলেই, কখনও বা তার আগেই আমাকে পড়া তৈরী করার জন্যে উঠিয়ে দেওয়া হ'তো। গরমের ছুটিতে বেশ আরাম ক'রে ঘুমোবো এই ভেবে পরীক্ষার দিন কটা কোনোরকমে কাটিয়ে দিতাম। জানি না কি হ'তো আর কারই বা নজর পড়তো। ছুটির সময় হাজার চেষ্টা করলেও ঘুম আসতো না। পরীক্ষার সময় বই হাতে করলেই ঘুমে ঢুলতাম, অথচ ছুটির সময় পত্রপত্রিকা ও উপন্যাস পড়তে পড়তে সময় যে কিভাবে কেটে যেতো তা বুঝতে পারতাম না। মা তো রোজই বকতেন, 'এখন শুয়ে পড়ো মা। এতো রাত অবধি কি এতো পড়া?' কলেজে লাস্ট ইয়ারে প্রতিজ্ঞা করলাম যে পরীক্ষার নাম আর কোনোদিন মুখে আনবো না। রোজ আরাম করে যতক্ষণ ইচ্ছে ঘুমোবো। বাড়ীতে দাদা-বৌদিকে দেখতাম। ন'টা বাজতে না বাজতেই দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়তো। সেই সময় অপরিচিত ওদের ঐ আনন্দের কল্পনাতেই মনে এক আলোড়ন উঠতো। মনে মনে স্থির করলাম, আমিও ঐ বয়সে বিয়ে করে রোজ আরাম করে ঘুমোবো। ঐরকম আনন্দে জীবনটা কাটিয়ে দেবো। পরীক্ষার ভয় থাকবে না, ঘুমের কোনো ব্যাঘাত হবে না।

বিয়ে হ'লো, কিন্তু যেরকম ভেবেছিলাম, জীবনটা সেরকম নয় দেখলাম। ভোর হতে না হতে উঠে পড়তে হ'তো। অর্ধেক রাত অবধি প্রেমের জগতে বিচরণ ক'রে ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়তাম। ভোর হতে না হতেই দুধওয়ালার ডাক, মনে হ'তো যেন যমরাজের ডাক। চোখে ঘুম নিয়ে উঠতাম, স্নান সেরে কফি তৈরী করতে

হ'তো। ঝির আসা-যাওয়া, রান্নাবান্না সারা, ওঁকে অফিসে পাঠানো, তারপর ঘরের বাকী কাজ ক'রে যখন আরামকেদারায় বসতাম তখন এগারোটা বেজে যেতো। সকালে খবরের কাগজটা দেখার সময় পেতাম না তাই এখন কাগজটা নিয়ে বসতাম। অমনি চোখ বুজে আসতো। ভালো করে চোখের পাতা দুটো এক করার জো ছিলো না, অমনি পোস্টম্যানের ডাক, সব্জিওল.ব হাঁক। তার ওপর আবার পাশের বাড়ীর বাচ্চাগুলোর দুষ্টুমি করে বাড়ীর ঘন্টি বাজানো। কেউ এসেছে ভেবে দরজা খুলে দিতাম, কাউকেই দেখতে পেতাম না। দূর থেকে বাচ্চাদের খিল খিল হাসির শব্দ শুনতে পেতাম।

দুপুরবেলা উনি খেতে আসতেন। ওঁকে রওনা করে দিয়ে কোনো বই বা একটা উপন্যাস নিয়ে বসতাম, অমনি পালিয়ে-যাওয়া ঘুমে চোখ জুড়ে আসতো। শুতে না শুতেই ঝিয়ের মোটা গলায় 'মা' ডাক। আমি একটু ঘুমোই, সেটা যেন ওর মোটেই পছন্দ নয়। বিকেলবেলা আবার জলখাবারের ব্যবস্থা করা, তারপর রান্নাবান্না তো আছেই। রাতে আবার সেই প্রণয়-লীলা, অর্ধেক ঘুম। আমাদের প্রেমে যখন ছেদ পড়তো, তখন দেখি বিট্টু উঠে পড়েছে। সারাটা দিন বিট্টু আরাম করে ঘুমোতো, বিকেলে আমাদের সঙ্গে খেলা ক'রে সন্ধ্যেবেলা দুধ খেয়েই ঘুমিয়ে পড়তো। সকালে মোরগ ডাকার আগেই ওর ঘুম ভেঙে যেতো। 'উঁ, উঁ' শব্দ করে মনের আনন্দে খেলা সুরু বরে দিতো। ওর সঙ্গে আমি খেলা না করলে চিৎকার জুড়ে দিতো। তাই ভোর চারটে থেকে আলো জ্বালিয়ে ঘুম-পাড়ানির গান শুনিয়ে ভোলাতে হ'তো। সকালে ওকে স্নান করিয়ে, দুধ খাইয়ে, স্নো-পাউডার মাখিয়ে দোলনায় শুইয়ে দিতাম। দশটা সাড়ে-দশটা অবধি ঘুমোতো। ঘরের কাজকর্ম সেরে একটু আরাম করে

বসবো ভাবছি অমনি ও উঠে পড়তো। আমি ওর সঙ্গে একটু খেলা করবো ভাবতাম, ওকে একটু আদর করবো মনে করতাম কিন্তু ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসতো। ওর পাশেই একটু গড়িয়ে নেবার চেষ্টা করতাম কিন্তু ও শাড়ীর আচল ধরে টানতো; চুলগুলো মুঠোয় নিয়ে টানতো, নিজের ছোট ছোট পা দিয়ে আমার পেটে গুঁতো মারতো। আমার ঘুম ভাঙাবার জন্যে যা করার দরকার সব কিছুই বিট্টু করতো। ও একটু বড় হ'লো। সকালে ওকে তুলে স্কুলে পাঠাতে হ'তো। আমাকে তাই ভোরবেলাই উঠতে হ'তো। এ সময় আমি আবার অন্তঃসত্ত্বা। বাড়ীতে কাজের চাপ দিনের পর দিন বেড়ে যায়। ঘুমোবার সময়ই পেতাম না।

ছেলেপিলে বড় হতে লাগলো। ওদের ভবিষ্যতের ভাবনা, ওদের চাল-চলন, আচার-ব্যবহার— সব কিছুই আমায় খেয়াল রাখতে হ'তো। ছোটবেলায় পরীক্ষার পড়া তৈরী করার চেয়েও কঠিন কাজ মনে হ'তো। সবসময় ওদের জন্যে চিন্তা— কলেজ থেকে ওদের আসতে দেরী হলে দুশ্চিন্তা, শরীর খারাপ হলে দুর্ভাবনা। ছেলে ফাস্ট ডিভিশনে পাশ করুক, মেয়ের ভালো ঘরে বিয়ে হোক, ছেলের একটা ভালো চাকরী হোক, মেয়ের বিয়ের টাকা কোথেকে আসবে, মেয়ে শ্বশুরবাড়ী গিয়ে সংসার ঠিকমত করতে পারবে কিনা— এই ধরনের একটা না একটা চিন্তা সব সময়েই লেগে থাকতো। বিয়ের পর ছেলেও একটু পাল্টে গেছে। সে আমার কাছ থেকে অনেক দূরে চলে গেছে ভেবে মানসিক দুশ্চিন্তা বাড়ে। বৌমার এখনও ছেলেপুলে হয় নি, সেও আর এক চিন্তা। আমি যদি অসুস্থ হয়ে পড়ি তো আমায় কে দেখবে? এতো বয়সেও আমার সুখদুঃখের কথা উনি চিন্তা করেন না। আমার এতো রকমের চিন্তাভাবনা থাকলে ঘুম কি করে আসবে?

ছেলেমেয়েরা সব বড় হ'য়ে যে যার সংসার করছে। ছেলেপুলে কাছে থাকুক বা না থাকুক, যে যার নিজের দায়িত্ব নিয়ে আছে। এখানে তো মাত্র আমরা দুটো প্রাণী। উনি প্রায়ই বলেন, 'এখন আর আমাদের কোনো দায়িত্ব নেই, সময়মত খাওয়া-দাওয়া করো আর আরাম করে ঘুমোও। তা না হলে রাম-নাম করে দিন কাটিয়ে দাও।' কতক্ষণ আর রাম-নাম করবো? চেঁচিয়ে রাম-নাম করার উপায় নেই। লোকে পাগল বলবে। মনে মনে রাম-নাম করলে আমার ডাক রামের কানে পৌঁছোবে কিনা সন্দেহ। আমার ডাক তাঁর কানেই যদি না পৌঁছোয় তো এতো কষ্ট করার দরকার কি? এ কাজে আমার ঘুমোবার যে কোনো সুবিধে হবে ব'লে তো মনে হয় না, অথচ আমার ঘুমেরই সবচেয়ে বেশি দরকার। রাম-নাম করতে করতে আমার চোখ ঠিকরে যেতো, কিন্তু দু'চোখের পাতা এক হ'তো না।

সময় কাটাবার জন্যে খবরের কাগজে ছাপা খবর নিয়েই চিন্তা করতে থাকি। আবার সেই এ্যাপোলো এগারো, রাষ্ট্রপতি, তেলেঙ্গনা ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু ঘুম আসে না। কখনও কখনও ভাবি ছেলেপুলেরা বড় হয়ে গেছে, যে যার সংসার করছে, এবার আমি নিশ্চিন্ত। কিন্তু মায়ার বন্ধন কাটতে চায় না। বার বার ওদের কথাই মনে পড়ে, ওদের ভাবি।

কিন্তু ঘুম এলো না।

একটি দিনও যে প্রাণভরে আরাম করে ঘুমিয়েছি তা মনে পড়ে না। জীবনভোর ঘুমের তপস্যা করেই কাটলো। জীবনে একটা দিন আরাম করে ঘুমোবার মনোবাঞ্ছা কি ভগবান পূরণ করতে পারেন না? 'আমার ঘুম ভাঙাবেন না' এ ধরনের একটা সাইন-

বোর্ড লাগিয়ে ঘুমোবার চেষ্টা করলেও কখনও ফোন বেজে উঠবে, কিংবা পাশের বাড়ীর ছেলেটি খবরের কাগজটা নিতে আসবে, নয়তো সব্জিওলা কিংবা খবরের কাগজওলা আসবে, রাতে পাশের বাড়ীর ছোট ছেলেটির কান্না বা রাস্তায় কুকুরদের চিৎকার, ঘুমের বারোটা বেজে যাবে।

আর ছ'ঘণ্টা পরে ভোর হবে ; মোরগ ডাকবে। অন্তত ছুটো ঘণ্টা যদি চোখের পাতা এক করতে না পারি তো সকালে উঠে কাজকর্ম করবো কি করে। একদিন যদি শরীর খারাপ হয় তো বাড়ীর সব ওলোট-পালোট হয়ে যাবে। আর একটা গুলি খেয়ে নেয়াই ভালো। আজকের এই সব এলোমেলো চিন্তা আমাকে এতো সজাগ করে দিয়েছে যে ছ'টো গুলির কম ঘুম আসাই মুশকিল।

খাট থেকে উঠে আলমারির কাছে যাই। ঘুমের ওষুধের শিশি আর জলের গেলাসটা নিয়ে ফিরে এলাম। বিছানায় বসে শিশি থেকে একটা গুলি বার করার চেষ্টা করি। হাতটা কেঁপে যায়, সবকটা গুলিই আমার বাঁ হাতের চেটোয়। এগুলো ঘুমের গুলি— এর ভেতরেই তো ঘুম লুকিয়ে আছে। আর এই ঘুমই আমার চাই। একবার বেঁহুশ হয়ে ঘুমোবার বাসনা, মুরগীর মতো আধো বোজা চোখে আধো ঘুমে আমার মন ভরবে না। মানুষের মতো ঘুমোতে চাই। জন্মে থেকে আজ অবধি আরাম করে ঘুমোতে পারি নি। আজ যদি সেটা পেয়ে যাই···

ভেবেই আমার মন আনন্দে ভরে যায়। এই সংসারে ঘুমের চেয়ে বেশি আরাম আর কিছুতে নেই। আজ অবধি সেই আরাম আমি একদিনের জন্যেও পাই নি। অন্তত একটিবার প্রাণ ভরে ঘুমিয়ে নিতে চাই।

একটা কথা মনে পড়লো। উঠে পাশের টেবিল থেকে কাগজটা তুলে নিলাম। কোলে একটা বইয়ের ওপর কাগজটা রেখে কাঁপা হাতে লিখলাম :

'ওগো, ভয় পেয়ো না। আমি ঘুমোচ্ছি, আর কিছু নয়। তুমি ভেবো না, আমি আত্মহত্যা করেছি। আমি শুধু ঘুমোবার জন্যেই ঘুমোচ্ছি।'

খালি বোতল

বাইরের গেটে পৌঁছোনোর জন্যে কে. জি. হাসপাতালের বারান্দা দিয়ে সে এগিয়ে যায়। তার মুখের অবস্থা পুরোনো ব্রাউন পেপারের মত। গায়ে হালকা নীল রঙের জামা মনে হয় ওর নয়। প্যান্টটা পাজামার মত ঢিলে, হাঁটুর কাছটা বিশ্রীভাবে গোল হয়ে গেছে, পেছনটা কুঁচকে আছে। বয়স ওর পঁচিশ। এই পোষাকে ওকে ঠিক চল্লিশ বছরের বুড়োর মত দেখাচ্ছে।

উদাস মনে ধীরে ধীরে সে বেরিয়ে আসে। হাসপাতালে তার মা অসুস্থ। কি যে রোগ, সেও জানে না, মাও জানে না।

হাসপাতালের বাইরে এসে গেটের কাছে দাঁড়ালো। পেছনে হাসপাতালকে প্রাণহীন রোগীর মত নিষ্প্রভ দেখাচ্ছে।

ডান হাত দিয়ে পকেট হাতড়ায়। একটা দশ পয়সা আর একটা পাঁচ পয়সা হাতে ঠেকে। নোংরা কাদায় ব্যাঙাচি যেভাবে লুকিয়ে থাকে, পকেটের এক কোণে দশ পয়সা আর পাঁচ পয়সা ঠিক সেইভাবে লুকিয়ে ছিলো।

পনেরো পয়সার সে মালিক। বিশাখাপট্টনমে সব জিনিষের দাম আকাশ-ছোঁয়া। কিন্তু তার দাম মাত্র পনেরো পয়সা। এই পনেরো পয়সা দিয়ে তাকে একটা খালি বোতল কিনতে হবে। বাঁ দিকের বুকটা চুলকোতে চুলকোতে নার্স বলে, 'বোতল আনো নি ? বোতল নিয়ে এসো, ওষুধ দিয়ে দেবো।' 'যদি আপনার কাছে

থাকে…' একটু হেসে বলার চেষ্টা করতেই ঝাঁঝিয়ে উঠলো, 'আমাকে কি বোতল বিক্রি করতে দেখছো ?'

আরে টিউব-প্যাণ্টপরা ডাক্তারের বেটা ! তুমি তো পায়ে পা দিয়ে দেখতে দেখতে ডাক্তার হয়ে গেলে। তোমার কাছে পয়সা আছে, আমার কাছে নেই। তুমি সব সুখ-সুবিধে পেয়েছো, আমি পাই নি, আমি পেয়েছি শুধু ব্যথা ! আমি গরীব। জ্ঞান হওয়া অবধি আমি গরীব। আমার বাবা গরীব, ঠাকুর্দাও নিশ্চয় গরীব ছিলেন, তার ঠাকুর্দাও।

আরে গাড়ীতে কুকুর নিয়ে যাচ্ছিস তুই আধুনিকা ! তোর কুকুর গাড়ী থেকে মুখ বাড়িয়ে সবাইকে কেমন মেজাজে দেখছে ! যা যা ! ভাগ, তোর কুকুরকে রাস্তার কুকুররা কুকুরই মনে করে না।

যা ছুঁড়ি যা !

গিয়ে ঐ লীলা থিয়েটারে ইংরিজি ছবি দেখ।

মা ভবানী ! তুমি আবার কে ? কোন পাড়ায় থাকা হয় ? কোন্ নোংরা বস্তীর কোন্ চালাঘরে ? কাঁটা গাছের ঝোপের মতো তোমার চুলে এতো জট-পাকানো কেন ? ধোঁয়ায় ভরা চোখগুলো তোমার কি দেখছে ? মা তোমার কি কষ্ট ? তুমি নিজের কথা বলো। তোমার বাবা-মা নেই ? স্বামী নেই ? ছেলেপুলের চিন্তা আছে না নেই ? এইভাবে যেও না। আধ-ভরা কলসীর মতো যেও না। বেসুরো গানের মতো করে কেঁদো না।

আরে শূয়ারী ! হাসপাতালে চক্কর দিয়ে আসছো ? কোন্ কোন্ কোণে টহল দিয়ে এলে ? কোথাকার কুঁড়ো খেয়ে এলে ? ওই সব কুঁড়োদের গল্প শোনাও না। বদহজম কার হয়েছে ? কলেরা কার হয়েছে ? কার কার পেট ছেড়েছে ?

বল্ শূয়োরের বেটী! বল্ না!

তোমার গল্প কোনো পত্রিকা ছাপবে না?

আরে শূয়োরের বাচ্চা, কলেজ গার্ল! মেরো না। শিরাগুলো ছিঁড়ো না! গতকাল পরশু তোমার মত এক ছুঁড়ি লক্ষ্মী টকীজের কাছে একটা টাকা নিয়ে তোবড়ানো গাল নিয়ে ঘাড় বেঁকিয়ে বলছিলো—রোগ নেই এমন বেশ্যার কথা সব রিকসাওয়ালারাই জানে।

ছিঃ কাঁচা খান্‌কী! রোগের ডিপো। ওইদিন কমপাউণ্ডার বলছিলো, 'ইনজেকসন লাগাবার সময় চেঁচাও, সেদিন এসব আক্কেল গেছিলো কোথায়!' 'রোগের গলিতে ঘুরে বেড়াচ্ছো যে সব পুরুষরা! কি করবো, এই লেনদেনে রোগ নিতেই হয়।'

হাসপাতালের দরজার কাছেই সে দাঁড়িয়ে আছে। গেটের কাছেই কুষ্ঠরোগীর গায়ের চামড়ার মত একটা টেবিলে রঙ-বেরঙের খালি বোতল ঠিক বন্দীদের মত সাজানো, বিক্রীর জন্যে। এই টেবিলের কাছেই তেলেভাজা, বাসী ইড্‌লী, শুকনো মুসুম্বি। চারিদিকে মাছি ভন্‌ভন্ করছে।

এই টেবিলের পেছনেই হাসপাতালের দেয়ালের গা বেয়ে গন্ধ-নালা। রাস্তা থেকে একফুট নীচে নালায় কালো কালির মত নোংরা জল, চারিদিকে জঞ্জাল আর দুর্গন্ধ। গন্ধনালার কাছে সাত আট বছরের দু'টো মেয়ে আর একটা দশ বছরের ছেলে নিশ্চিন্তে বসে পায়খানা করছে। কার পেচ্ছাব কতদূরে লম্বা হয়ে বয়ে যাচ্ছে তাই নিয়ে নিজেদের মধ্যে তর্কাতর্কি করছে। তার একটু দূরে একটা বুড়ো কুকুর আর চারটে শূয়োরের বা৺। জঞ্জাল আর গু ঘেঁটে খাচ্ছে।

হাসপাতালের গেটের ঠিক উল্টোদিকে রাস্তার ওপারে হোটেল, বেকারী, দোকান, রাস্তায় দাঁড় করানো মোটর, সাইকেল, স্কুটার, সিটি বাস। পথচারী চলাফেরা করছে, কিছু লোক নির্ভয়ে পা ফেলছে, আর কিছু লোক ভয়ে ভয়ে এক পা এক পা করে এগুচ্ছে।

খালি বোতলগুলো চোখে পড়ার আগেই এসব নজরে পড়লো।

'পথেঘাটে জঞ্জাল ফেলো না, জঞ্জালই অসুখের মুল।' কথাগুলো কে বলেছিলো? গান্ধী বলেছিলো? না নেহেরু? না ইন্দিরা গান্ধী? নেহেরু? কে বলেছিলো?

জঞ্জালের ওপর দিয়ে পথ তৈরী কোরো না। পথই রোগের কারণ।

আর তা না হলে রাস্তাতেই যত রোগ।

হয় রাস্তায় নোংরা ফেলো, না হয় নোংরার ওপর দিয়েই রাস্তা তৈরী করো।

বল ভাই বল, বল না!

'বাবু, বোতল চাই? আসুন বাবু আসুন। মাত্তর ছ'আনা।'

গেটের বাঁ দিকে একটি মেয়ে। এলোগায়ে শাড়ীপরা ত্রিশ বছরের কাছাকাছি বয়স হবে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পথচারীদের আদর করে ডাক দেয়।

আর ও—

দু'বছরও হয় নি বিধবা হয়েছে। আঁচলের আড়ালে ওর নিটোল দুটো স্তন—সুন্দর ও সুঠাম উরুগুলোও···

চোখ বুলিয়ে আদর করে স্নান করাতে করাতে যেন ঐ ছুঁড়ির দিকে এগিয়ে যায়।

'পেন্নাম!' সকাল থেকে বসে আছি, কেউ সওদা নিতে আসে নি।

ছ' আনা বললে অন্ততঃ চার আনায় কোনো না কোনো বোতল এই বাবু কিনে নেবে। চার আনা দিয়ে ছোট বোনকে কফি কিনে দেবো। বেশ্যার ছেলে ঐ রঙ্গনাথ সারারাত বুক কুরে কুরে খেয়ে কুকুরের মত চেটে চেটে মাত্তর দু'টাকা দিয়ে গেলো। তারপর আধঘণ্টা পরে ফিরে এসে বললো, 'গৌরী! পুলিশ এসেছে। দু'টাকা দিয়ে দে, পরে দেখা যাবে।' ব্যস্, পয়সা নিয়ে কেটে পড়লো। ভেবেছিলাম দু'টাকা দিয়ে বোনের জন্যে একটা ব্লাউজ আর রিবন কিনবো। ওকেও দেখতে কি রকম সুন্দর। ও বড় হয়ে পড়াশোনা শিখে··· ছিঃ ছিঃ··· এটা কি কোনো জীবন··· রানীর মত জীবনযাপন করবে। ফিল্মস্টারকে বিয়ে করে যমুনার মতো থাকবে। ওর তো মাত্তর এগারো বছর বয়েস। মাঝে মাঝে জিজ্ঞেস করে, 'রঙ্গনাথনের মতো লোকেরা রাত্তিরে কেন তোমার কাছে আসে দিদি?' ও কি করে বুঝবে যে আমি ওরই জন্যে, দুনিয়ার যত কুকুর আর শূয়োরদের হাত থেকে ওকে বাঁচানোর জন্যে অহর্নিশি এই মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করছি। মদের দোকান খোলার জন্যেও পয়সার দরকার। দোকান চালাতে বুদ্ধিও চাই, পুলিশরা তো কুকুরদের মত বসে আছে। ঝঞ্ঝাট এড়াতে হ'লেও পয়সার দরকার। ওই নরকের জ্বালার চেয়ে এই দেহ বেচে বেচে থাকা বরঞ্চ আরামের। ··· কাউকে না কাউকে পাওয়া যাবেই··· মওকা পেলে কোনো বড়লোককে ফাঁসাতে পারা যাবে। শরীর ভেঙ্গে গেলে কিন্তু আর কেউই কাছে আসবে না।

'আসুন বাবু, আসুন। এই বোতলে হবে? না এর চেয়েও বড়? এসে দেখে যান না।'

'ছ'আনা··· এই খালি বোতল··· আরে··· বিনা ব্লাউজপরা···

ছ'আনার এটা! দেখতে ভালো বলে তোমার কাছে এসেছি, তাই ছ'আনা চাইছো! আমার কাছে পনেরো পয়সা আছে,··· আমি পনেরো পয়সার বাদশা ···পনেরো···'

'পনেরো পয়সায় দেবে? এত বড় চাই না,. এর চেয়ে ছোট হলেও চলবে।'

'চার আনায় হবে বাবু! তার চেয়ে এক পয়সাও কম নয়।'

'বাবু, এদিকে আসুন, আমার কাছে আছে, দু'আনায় হবে, বড় বোতলই হবে।' গেটের ডানদিকে আর একটি মেয়ের ডাক, ছেঁড়া পুরোনো শাড়ী, এলোগায়ে, কালো, রোগা মেয়েমানুষ—

দু'আনা, আমার দু'আনা চাই, সকাল থেকে চা খেতে পাইনি। ঘরে মাত্তর বারো আনা পয়সা ছিলো, সেটাও ও রাতে নিয়ে গেলো। এখনও পর্যন্ত ফেরেনি, জানি না কোথায় গেছে। হয়ত নেশা করে কোথাও পড়ে আছে, মরে পড়ে থাকলেও কোনো খবর পাবো না। ছেলেমেয়ে দুটো কোনো বাসস্ট্যাণ্ডে হয়ত ভিক্ষে করে খাচ্ছে। মেয়েটা গান গায় আর ছেলেটা ঢপ বাজায়। এখন ওদের খেলা করে বেড়ানোর সময়, কিন্তু ভিক্ষে করে বেঁচে আছে, বাবু! এই ছোটো বাচ্চাটা কাঁকর-পাথরের ওপর শুয়ে আছে। ওর দিকে তাকিয়ে দেখুন, ও যেন:আকাশের দিকে তাকিয়ে হাত-পা ছুঁড়ে কিছু চাইছে। আকাশ মাথায় ভেঙ্গে পড়েছে, ও ছটফট করছে। বাবু, এই বাচ্চাকে দুধ খাওয়ানোর মত দুধ আমার কাছে নেই। বুকের দুধ একেবারে শুকিয়ে গেছে, উজাড় হয়ে গেছে; রবারের মত ও চুষে নেয়। এই বুকে আর কি আছে—মার ব্যথা ছাড়া! ··· একটা দু'আনিই আমার যথেষ্ট,—শুধু চা খাওয়ার জন্যে··· ওতে খানিকটা সাহায্য হবে··· বাবু, বেঁচে থাকা বড্ড কষ্টের। বাড়ীতে

কাজ করতে চাই কিন্তু কেউই আমায় রাখতে চায় না। অনেকদিন আগেই আমার বুদ্ধিতে ঘুণ ধরেছে··· প্রাণ তো সবায়ের কাছেই প্রিয়, বাবু। বাঁচার তাগিদে মানুষ সব কিছু করে। ওদিকে পৈডীকে দেখুন, দেহ বেচে খায়। কিন্তু আমার তাও নেই বলে বোতল বিক্রি করছি। ওই যে আছে···? আমার স্বামী··· মদ খায়, মারধোর করে, রিকসা ঠেলে কত পায় ও-ই জানে আর ঈশ্বরই জানেন, ঐ মদের দোকানওয়ালা জানতে পারে। আর বাচ্চারা, বাবু, ক্ষিদেয় ছট্‌ফট্‌ করছে।

নূকালম্মা এই সব চিন্তায় বিভোর।

ছ'আনা বলছে। বাকী তিন পয়সা বাঁচিয়ে আর কি হবে। পনেরো পয়সা দিয়েই কিনে নেবো।

'আচ্ছা, বোতল দেখাও', বলতে বলতে সে গেটের বাঁ দিকে এগিয়ে যায়।

'এটাই বাবু, এটাই।'

বাবু পনেরো পয়সা দিয়ে কিনে নিয়েছেন। তিন পয়সা ফালতু দিয়েছেন।

ওষুধ আনার জন্যে হাতে খালি বোতল আর গায়ে ময়লা কাপড়, এই-ই আমি।

বুঝতে পারছি না; মা মুসুম্বী আনতে বলবে না আঙ্গুর আনতে বলবে।

না, না, মা বলবে না। মা জানে এসব কেনার মত পয়সা আমার কাছে নেই। তাই মা এসব জিনিস কিছুই চাইবে না, এ না হলে যদি মরতেও হয় তাতেও মা রাজী।

মা, তুই মরেই যা।

ঐশ্বর্যশালী এই ভারতে মরে স্বর্গে কিংবা নরকে গিয়ে মুক্তকণ্ঠে গাও—

যাই চলে যাই যে কোনো দেশে,
মায়ের মান বাড়াতে।
গাও মা গাও।

হাসপাতালের কমপাউণ্ডারটাকে দেখে মনে হচ্ছিলো একটা রাক্ষসের মুখ। নার্স, রুগী, ডাক্তার সব যেন পোকার মত মনে হয়।

ওর পেছনে—গেটের পাশে—

পৈডী : নূকালম্মা, তুই ও কি করলি খানকি কোথাকার! আমার বোতলটা বিকলো না, তুই খুব বেচাকেনা শিখেছিস! দু'আনায় বেচে দিলি, মা অন্নপূর্ণা হয়েছিস। ওতো আমার কাছেই আসছিলো, দু'আনার লোভ দেখিয়ে বোতল বেচলি। বেহায়া কোথাকার।

নূকালম্মা : কি বাজে বকবক করছিস পৈডী। ফের যদি বলেছিস তো থাবড়ে গাল সোজা করে দেবো, দাঁতের পাটি উপড়ে নেবো… তুই তো দাম কম করে দিতে পারতিস, তাহলে তো বিক্রি হয়ে যেতো। আমাকে খান্‌কি বলছিস, লোকে তো তোকেই খান্‌কি বলে।

পৈডী : কি বললি? আমি বেশ্যা? তুই বেশ্যা, তোর মা বেশ্যা, তার মাও বেশ্যা, আর তোর মেয়েও পরে বেশ্যা হবে।

(পৈডী রাগে সাপের মত ফোঁস করে ওঠে; নূকালম্মার দিকে এগিয়ে যায়। গালে এক চড় কসায়।)

নূকালম্মা : আরে ডাইনী! শাড়ী টানছিস কেন? ছেড়ে দে বলছি, ছেড়ে দে, আরে করছিস কি, পৈডী! পৈডী! লজ্জার মাথা খেয়েছিস। শাড়ী… শাড়ী খুলিস না, হায় রে সর্বনাশ! বাবুরা

সব চুপচাপ দাঁড়িয়ে দেখছে। দেখো বাবুরা! আমার শাড়ী খুলছে, শাড়ী খুলছে··· শাড়ী।

(নূকালম্মা মাটিতে পড়ে গিয়ে দু'হাতে শাড়ীটাকে প্রাণপণে জাপটে ধরে সবাইকে মিনতি করতে থাকে।)

বাবুরা! বাবুরা!

(এবার সে শাড়ীটাকে ছেড়ে দিয়ে দু'হাতে ভর দিয়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করে। পৈডী তাকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়ে আবার শাড়ীটা টানতে থাকে··· সড় সড় সড়···) বাবুরা··· শা··· শাড়ী··· আরে ডাইনী! কি নীচ কাজ করলি, পৈডী, একি,··· একি···। বাবুরা, ও আমার শাড়ী নালায় ফেলছে। পৈডী তোর পায়ে পড়ি।

(হায়, হায়, শাড়ীটা গন্ধনালায় ফেলে দিলো।)

এখন আমার গায়ে শাড়ী নেই। হায়, হায়, এতো লোক— পুরুষরাও আছে, মেয়েরাও আছে— সবাই আমার নগ্ন দেহটা দেখছে।)

দেখ মাগী দেখ, এবার তোর আমি কি করি।

(নূকালম্মা পৈডীর হাতটা দাঁত দিয়ে কামড়ে খানিকটা মাংস তুলে নিলো।)

পৈডী : আরে শয়তানী, কি রকমভাবে কামড়েছিস দেখ।

নূকালম্মা : তুই আমার শাড়ী কেড়ে নিলি কেন ?

(নূকালম্মা বাঁ হাত দিয়ে পৈডীর ঝুঁটি ধরে ডান হাতটা ওর পেটের মধ্যে ঢুকিয়ে একটু ঝুঁকে শাড়ীটা উঁচু করে নিয়ে টানতে লাগলো। যখন দেখলো শাড়ীটা পুরো খুললো না তখন ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে আঁচলটা ধরে টানতে আরম্ভ করলো। আর দুটো হাত দাঁত

দিয়ে সজোরে কামড়াতে কামড়াতে শাড়ীটা পুরো টেনে খুলে ফেললো— ঠিক যেমন— কাঠি দিয়ে ননী বার করে।)

'এখন কেমন লাগছে বল দেখি?'

পৈডী : বাপরে, ঠিক ক্ষ্যাপা কুকুরের মত কামড়েছে, কি ভীষণ রক্ত পড়ছে।

পৈডীর শাড়ীটাও নূকালম্মা গন্ধনালাতে ফেলে দিলো; কিন্তু শাড়ীটা গন্ধনালায় না পড়ে শূয়োরের গায়ের ওপরে পড়লো।

পৈডী সেই নগ্ন অবস্থায় নূকালম্মার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো।

দু'জনেতে ঝাপটা-ঝাপটি করতে লাগলো। ধাক্কাধাক্কিও হ'লো। একবার ওঠে আবার পড়ে। একে অন্যের ওপরে চড়ে··· গড়াতে থাকে।

নূকালম্মা হঠাৎ উঠে পড়ে। হাত ছাড়িয়ে তাড়াতাড়ি ছুটে পালায়।

পৈডীর শাড়ী নালায় পড়ে নি। কাকের মুখে করে সাবানে টুকরো নিয়ে উড়ে যাওয়ার মত পৈডীর শাড়ীটা জাপটে ধরলো।

'মর এখুনি, পৈডী! এখুনি মর! আমার শাড়ী নালায় ফেলে দিয়েছিস। এবার দেখ তোর শাড়ী নিয়ে যাচ্ছি। ন্যাংটা হয়ে মর এইখানে! বেশ্যামাগী কোথাকার!'

নূকালম্মা দৌড়তে থাকে; দু'পায়ের মাঝখানে শাড়ীটাকে চেপে ধরে দৌড়তে থাকে।

সমস্ত ব্যাপারটা পাঁচ মিনিটের মধ্যে ঘটে গেলো।

পৈডী মেঝেতে পড়ে ছিলো, উঠে বসলো। ওর শাড়ী নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছিলো নূকালম্মা, তাকে ধরার চেষ্টা করে। কিন্তু নূকালম্মা তীরের মত উধাও হয়ে গেলো।

ওর অবস্থায়—

ওইভাবে ওইখানে নগ্ন অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকা পৈডীর পক্ষে অসম্ভব। চোখ থেকে জল গড়িয়ে এলো। এইভাবে মাটিতে পড়ে থাকলে ভালো হ'তো; উঠে মস্ত ভুল মনে হ'লো। ওইভাবে মাটিতে যদি সে উপুড় হয়ে শুয়ে থাকতো তো ভালোই হ'তো। দু'হাত দিয়ে বুকটা ঢেকে নেয়, যেমনভাবে মুরগী তার বাচ্চাকে ডানা দিয়ে ঢেকে নেয়। তারপর হাত দু'টো বুকের কাছ থেকে সরিয়ে নিয়ে উরুতে, পরে দুই উরুর মাঝখানে রেখে দেয়। বুকটাকে হাওয়ার সঙ্গে বোঝাপড়া করার জন্যে ছেড়ে দেয়। তারপর এক হাত দিয়ে বুক আর অন্য হাত দিয়ে উরু ঢাকার চেষ্টা করে, এদিক ওদিক দেখতে থাকে। দেখে···

চারিদিকে শুধু পুরুষ আর পুরুষ— যেদিকে তাকায় সেদিকেই পুরুষমানুষ।

শুধু পুরুষের মাথা, শুধু মাথা।

মাথার সমুদ্দুর, শুধু মাথার সমুদ্দুর।

চোখে-মুখে শুধু লালসার চিহ্ন—

দৃষ্টিতে শুধু উন্মত্ত কামনা।

নূকালম্মার শাড়ী নালার লজ্জা নিবারণ করে তার ওপর ছেয়ে আছে, যেন হাসছে, নোংরা, ময়লা আর কালো হাসি— শাড়ীটা নিতে হলে নালায় বেশ খানিকটা নামতে হবে, প্রায় কোমর জল অবধি··· ওকে অনেক জোড়া চোখ দেখছে— কেউ দয়া দেখানোর জন্যে। কেউবা প্রেম নিবেদন করার আগ্রহ নিয়ে, কেউ কেউ ওর মধ্যে আগুন জ্বালানোর উন্মত্ততা নিয়ে, কেউ বা আবার ওর পায়ে পড়ার জন্যে, ওকে কিনে নেবার জন্যে। কেউ বা আবার তাকে

দোষ দেবার জন্যে, গায়ে হাত বুলিয়ে দেখার জন্যে, চুমু খাবার জন্যে। এতগুলো চোখ— কত রকমের চোখ, না জানি আরো কত রকমের চাহনি। আমার—

মেয়েকে—

চমক আছে যার, চমক লাগায় যে— তাকে দেখবে। ঝগড়ায় মেতে গিয়ে ভুলেই গেছিলাম যে আমি মেয়ে। এই আক্কেলটা তখন ছিলো না— এর চেয়ে এরা যদি আমার নগ্নদেহ বেত দিয়ে চাব্‌কাতো··· হায় রে! হায়! বাপরে! বাপ! আমি মেয়ে, আমার গায়ে শাড়ী নেই, বর্ষার সময় গরুর মত এই রাস্তায় দাঁড়িয়ে। এতগুলো চোখ, সবাই আমাকে দেখছে। নানান মন নিয়ে দেখছে। হায় ভগবান! তুই মরেছিস না শ্মশানে ঘুরে বেড়াচ্ছিস। আকাশ ফুঁড়ে তুই এসে এখন আমার লজ্জা ঢাক, তোর দয়া পেতে হলে কি পাণ্ডবদের স্ত্রী হতে হবে? আমার বুক তুই ছেয়ে দে, এরা সব পুরুষ, আমার বুক দেখে এরা না জানি কত কি বলাবলি করছে। না জানি কত চোখ নাভির নীচে উরুর মাঝখানে আটকে গেছে, যেমন কাদায় লোকের পা আটকে যায়। আরে ছোঁড়া, তোর বোন যদি এমনি উলঙ্গ হয়ে যায় তো তুই কি এইভাবে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবি? তোর মার যদি এই রকম হয় তখন কি তুই হাঁ করে দাঁড়িয়ে দেখবি? ও মাগো এতো পুরুষের মাঝে তুমি এমনি করে দাঁড়িয়ে থাকতে পারো? শুধু একটা সিকির জন্যে আমি আর একটা দু'আনার জন্যে নূকালম্মা— আমরা নিজেদের শাড়ী খোয়ালাম। বাবু, আমরা ভুলে গিয়েছিলাম যে আমরা মেয়ে। সুন্দর চটকদার কাপড়-পরা বাবুরা, সুন্দর সুন্দর জুতো-পরা বাবুরা! আপনাদের বউরা রেশম নাইলনের শাড়ীতে দেহকে লুকিয়ে রাখে,

দু'-আনা চার-আনা ফেলে দেয়, হারিয়ে ফেলে, হেসে উড়িয়ে দেয়। বাবু, মা! আরে আরে এ তো পুলিশের লোক দাঁড়িয়ে আছে। পয়সার কাঙাল জেনে আমাদের এই অবস্থা দেখে ওরা পুলের কাছে দাঁড়িয়ে বিড়ি খাচ্ছে। খারাপ কাজে বাধা দিয়ে ভালো কাজ করা তোমাদের কর্তব্য নয়? ঠিকমত বিচার করাটা তোমাদের কাজ না? এ সব দেখেশুনেও তোমরা কি করে চুপচাপ বসে আছো? বাবুরা! আমি যদিও বেশ্যা, দেহ বেচে খাই, ভাড়ার সাইকেল আর কি, অন্ধকারের আড়ালে লাজলজ্জা ছেড়ে শাড়ী যে ছেড়ে দেয় সেই বেশ্যা আমি, সব অসুখের পোকার গর্ত নিজের মধ্যে লুকিয়ে রাখি সেই মেয়েমানুষ আমি!

তবুও আমি মেয়ে।

বাবুরা! আমি মেয়ে।

আপনারা সবাই আমার দেহটা পুরোপুরি দেখেছেন। নেশা ভরা চোখ দিয়ে আপনারা আমার লাজ-ইজ্জত সব পান করেছেন। আর আমার বেঁচে থাকার কি মানে? হ্যাঁ, বেঁচে কি লাভ?

পৈডী এইসব কথা যেন চেঁচিয়ে বলতে চায়। মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়ুক, নীচে পৃথিবী দু'ভাগ হয়ে যাক, সে চীৎকার করতে চায়, কিন্তু লাজ-লজ্জা তার গলাকে চেপে ধরে, যেমন বোতলের মুখে ঢাকনি চেপে থাকে। পৈডী চীৎকার করতে পারে না। কিন্তু—

হাসপাতালের পাশের ঢালু রাস্তা দিয়ে সিটি বাস আসছিলো—

নদীর তীরে অনেক ছট্‌ফট্ ধড়ফড় করার পর মাছ যেমন জলের ভেতর হঠাৎ লাফিয়ে পড়ে—

পৈডী বাসের সামনের চাকা দুটোর মধ্যে লাফিয়ে পড়লো।

ভয়ে সবাই চমকে ওঠে। পথের দুধারে হা হা রব এমনভাবে ছড়িয়ে পড়লো যেন তুফান উঠেছে—

জলেভরা গেলাস ভেঙ্গে গেলে জলটা যেমনভাবে ছড়িয়ে পড়ে, ঠিক সেইভাবে পৈডীর শরীরের তাজা রক্ত রাস্তায় ছড়িয়ে পড়ে অকারণে অপ্রয়োজনে।

এই রক্ত ধরিত্রীকে কি করুণ গল্প শোনালো? মাথা থেকে বেরিয়ে আসা ঘিলু মাটিতে লুটিয়ে পড়ে কি ভাবলো? কনুই ভেঙ্গে বেরিয়ে আসা হাড়টা বাসের সামনের চাকাকে কোন দিক নির্ণয় করলো? ঐ অপলক-নেত্র কাদের মৃত্যুশাপ দিলো—শান্ত হাওয়া এর উত্তর জানে। সূক্ষ্ম ধুলো, সবুজ বৃক্ষেরও জানা উচিত। গরম রৌদ্রের, অনেক দূরে গর্জে-ওঠা সাগরের আর পৈডীর ওপর ঢাকা আকাশরূপী সমাধির এর উত্তর জানা উচিত। কিন্তু এর উত্তর এরা নাও জানতে পারে।

এক লাখ

একটা বাজে—

বাইরে রোদ্দুর পীড়াদায়ক হয়ে উঠেছে আর যে অফিসে চক্রপাণি কাজ করছে তার ভেতর গরম কষ্টকর হয়ে উঠছে।

চক্রপাণির পেটে আধঘণ্টা ধরে ছুঁচো ডন দিচ্ছে। এখন সব অফিসেই লাঞ্চের সময়—

ছোট বড় হরেক রকম সাইজের টিফিনের বাক্স, প্যাকেট এবং রঙ-বেরঙের ফ্লাস্কোতে ভরে খাবার-দাবার বাড়ী থেকে এসেছে। যে যার নিজের জলখাবার খুলে তাড়াতাড়ি খেতে বসেছে। মাঝে মধ্যে বাইরের রোদ্দুরের কথা মনে পড়ে গেলেই ক্লান্তি আসে, গরম একটা নিঃশ্বাস বেরিয়ে আসে। চক্রপাণির চাকরি হ'লো কুড়ি বছর, বয়স এখন চুয়াল্লিশের কাছাকাছি। টিফিন খাওয়ার বহর দেখে চক্রপাণি নিজের জায়গায় দু-তিন মিনিটের বেশি আর বসতে পারলো না।

'বসে থাকলে কাজ চলবে না। বাইরে গিয়ে পেটে কিছু না দিলে আর চলছে না।' এই বলে সে উঠে পড়লো। অফিসের গরম আবহাওয়া থেকে বেরিয়ে চক্রপাণি বাইরের রোদ্দুরে এলো।

রাস্তার ঐ পাশে অনেকগুলো কাফে। তার পাশে 'নাগয়্য়া এণ্ড সন্স'-এর পানের দোকান।

রোদ্দুরে তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে চক্রপাণি ওপারের ফুটপাতে এলো।

কফি হাউস— একেবারে নতুন ধরনের দেয়াল কাঁচের, দরজার ওপরে ভালো ভালো মুখরোচক জিনিসের লিস্ট একটা বোর্ডে টাঙানো।

নাগয়্য়া এণ্ড সন্স-এর পানের দোকানে একটা টবেতে 'কোল্ড-ড্রিঙ্কস্' রাখা আছে। জলটা গরম হয়ে গেছে, যাদের পকেট ড্রিঙ্কস্ খাবার মতো যথেষ্ট গরম, ওটা গরম জা॰া সত্ত্বেও তারাই খাচ্ছে।

বাইরে রোদ্দুরও যত প্রখর, চক্রপাণির খিদের অনুভূতিও তত প্রবল।

কালো বোর্ডের ওপর সাদা হরফে মুখরোচক খাবারের লিস্ট, কংক্রিট-করা রাস্তার ওপর রোদ্দুরের মতো ঝকমক করছে।

ইড্‌লি, চার আনা।

সঙ্গে ঝালমশলা দেয় না, সাম্বারের জন্যে দশ পয়সা আবার আলাদা চায়। এই ভাবনায় চক্রপাণি একটু উদাস হয়ে পড়ে।

কফিও চার আনা।

সাদা দোসা— তাও চার আনা।

সিঙ্গল বড়া— পনেরো পয়সা।

চক্রপাণির মনে হয বাকী খাবারের কোনো দরকারই ছিলো না। নাগয়্য়া একভাবে কাজ করে চলেছে, সমানে ঘামছে। নেমতন্ন বাড়িতে যেভাবে পাতা সাজানো হয় সেই ভাবে পানের পাতা সাজিয়ে তাতে রঙীন মশলা ছড়ায়।

'নাগয়্য়াভাই, একটা সিগারেট দেখি', 'একটা পান দিও তো নাগয়্য়াজী', 'পান' 'পান' করে সবাই হৈ-হল্লা লাগিয়ে দিয়েছে। —নাগয়্য়া বেশ শান্ত হয়ে সবার কথা শোনে। সবার কাছ থেকে হিসেব করে পয়সা নেয়।

'মিষ্টি পান দশ পয়সা।'

'সিগ্রেটের পনেরো পয়সা।'

চক্রপাণির আমেরিকান টেরিলীন শার্টের দুটো পকেট আর সাদা ড্রিলের প্যাণ্টের তিনটে। টেরিলীন শার্টের কলার যাতে ঘামে নোংরা হয়ে ছিঁড়ে না যায়, তাই চক্রপাণি ঘাড়ের নীচে একটা রুমাল ব্যবহার করে। রুমালটা ঘামে ভিজে জবজবে হয়ে গেছে।

সবকটা পকেটের পয়সা এক করে চক্রপাণি হিসেব জুড়লো, মাত্তর তিপ্পান্ন পয়সা।

আর একবার ভালো করে দেখলো, তিপ্পান্ন পয়সাই আছে। ইড্‌লি, কফি, পান আর দুটো সিগারেট কত পড়বে তাও হিসেব করলো। হিসেবে ভুলচুক হবার উপায় নেই, এক পয়সাও এদিক-ওদিক হয় না। একাউটেণ্ট চক্রপাণি এবার হিসেব ছেড়ে পয়সা বার করলো।

এমন সময় কাজে ব্যস্ত নাগয়্যা চক্রপাণিকে দেখতে পেয়ে বলে, 'কি বাবুজী, এখনও কফি খাও নি?'

'না, আজ পেটটা তেমন সুবিধের নয়,' চক্রপাণি উত্তর দেয়।

নাগয়্যা এণ্ড সন্স-এর পানের দোকানে চাঁদমালার মতো করে দড়িতে ঝোলানো মেয়েদের অর্ধউলঙ্গ সিনেমার ছবিগুলো পাঁপড়ের মতো শুকনো দেখায়। চক্রপাণি ঐ ছবিগুলোর দিকে করুণভাবে তাকিয়ে থাকতে থাকতে ঠিক করে ফেললে ইড্‌লি সে খাবে না। এক কফি, কফির খুবই দরকার। ওটা ছাড়া কাজও চলবে না। নইলে দুপুরে বসের সঙ্গে কাজে বসলে সব অক্ষরই ভুল লেখা হবে; তিন আর দুই মিলে চার হয়ে যাবে। সিগারেট না হলে চলবে না। স্বয়ং ব্রহ্মা বিষ্ণু এলেও এটা বাদ দেওয়া যাবে না। আর একটা মিঠে পান?

নাগয়্য়া খুব সম্মান করে কথা বলে। পান না নিলে খুব দুঃখ পাবে। ভাববে আমি কঞ্জুস হয়ে পড়েছি। এই সব সাত পাঁচ ভেবে চক্রপাণি সিগারেট আর পান দুই-ই কিনবে ঠিক করলো। ঘাড় থেকে ভিজে রুমালটা বের করে মুখের ঘাম মুছে নিলো।

তিপ্পান্ন পয়সায় খিদে, তেষ্টা আর নেশা সবই মেটাতে হবে, নিজের মানসম্মানও বজায় রাখতে হবে। সিগারেটে শেষ টান মেরে ঠোঁটটা গরম ক'রে সিগারেটটা বাইরে ফেলে দিয়ে চক্রপাণি কফি ক্লাবে ঢুকে পরে।

সব পকেটের পয়সাগুলো এক করলো।

এ ভাবে আর চলে না। কতদিন আর এ ভাবে কাটাবে। একটা কিছু করতেই হবে। ভাবে, চাকরি ছেড়ে প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডের টাকায় তেঁতুল-লঙ্কার একটা দোকান খুলে ফেললে কেমন হয়। চক্রপাণির জানাশোনা চারজন দোসা খাচ্ছিলো। এরা সম্প্রতি অন্য ডিপার্ট-মেণ্টে ক্লার্ক হয়ে এসেছে। চক্রপাণিকে দেখে অর্ধেক খাওয়া দোসা মুখ থেকে বার করে নমস্কার করলো। রঁগয়্য়া খাবার সার্ভ করছিলো। খুব বিনয় করে জিজ্ঞেস করে, 'সাহেব গরম গরম ইড্‌লি নিয়ে আসবো?'

চক্রপাণি একটু ডাঁট দেখিয়ে হেসে ওঠে। রঁগয়্য়ার বয়েস কম খুব, গরীবের ছেলে। পদমর্যাদায় আর প্রতিষ্ঠায় রঁগয়্য়া অনেক নিচু স্তরের, এই ধরনের একটা ইঙ্গিত ছিলো চক্রপাণির হাসিতে। খাবারের প্রতি এ ধরনের লোভ রঁগয়্য়ার মতো ছোট ছেলেদেরই শোভা পায়। এরা সব আনকোরা গ্রাজুয়েট, বিয়েও এদের হয় নি। এ রকম নতুন কেরানীদের পক্ষে এ সব খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু চক্রপাণির মতো পোক্ত ও অভিজ্ঞ লোকের পক্ষে এ সব শুধু

অসম্ভবই নয়, অসম্মানেরও বটে। এটাই ছিলো হাসির আসল ইঙ্গিত।

'না রঁগয়্য়া। আজ বাড়ীতে অনেক খাবার আছে— আজ অনেক কিছু রান্না হয়েছিলো। তুমি গরম গরম স্ট্রং এক কাপ কফি নিয়ে এসো, চিনি একটু কম।'

'অল রাইট,' বলে রঁগয়্য়া চলে যায়। দোকান খোলার জন্যে একটু আগেই চক্রপাণি তেঁতুলের কথা ভাবছিলো। কথাটা মনে পড়তেই চক্রপাণির একটু লজ্জা হয়। একাউন্টেন্টের স্টেটাস নিয়ে কম করে এখনও দশ-পনেরো বছর থাকবে, ইড্লি খাবার লোভে সেটা কি ছেড়ে দেবে? এটাওয়্যার টাইপিস্ট, ছোট ছোট কেরানী থেকে নিয়ে ম্যানেজার রমাকান্ত অবধি সবাই ওকে খুব 'রেসপেক্ট' করেন।

চক্রপাণি মাথা উঁচু করে দেখলো। সামনে প্রোপ্রাইটার 'পকৌডী রাও' নিজের চেয়ারে সেঁটে বসে হলদে আর সবুজ দাঁত বার করে হাসছে। চক্রপাণির মনে হয় সামনে বসে সে যেন তাকেই স্বাগত জানাচ্ছে।

চক্রপাণিও একটু অহমিকার হাসি হেসে তার উত্তর দেয়। পকৌডী রাও ওকে এত খাতির করে কেন? চক্রপাণি মনে মনে ভাবে পকৌডী রাওয়ের সঙ্গে নিজের কখনও তুলনা করবে না। কিন্তু পকৌডী রাওয়ের আসল নাম যে 'কুবেরণ' এ কথাটা দেখি কারুরই মনে থাকে না।

রঁগয়্য়া কফি নিয়ে এলো— সঙ্গে একটা গেলাসে কিছুটা ডিডাক-শানও রাখলো। পকেটে মাত্তর তিপ্পান্ন পয়সা, খিদেয় নাড়ী চনমন করছে, বাড়ীতে চারটে বাচ্চা, এই হ'লো একাউন্টেন্ট চক্রপাণির স্টেটাস।

আজ পকৌড়ী রাওয়ের দশ লাখ টাকার সম্পত্তি। কাঁচের দরজা-ওয়ালা তিন-তিনটে হোটেল। একদিন এই চকে বসে রাস্তার ধারে কুবেরণ লঙ্কার পকোড়া বিক্রী করতো। খুব কম লোকই এই চকে কুবেরণকে নিজের চোখে দেখেছে, কিন্তু সবাই ওর কথা জানে।

ছোট একটা তোলা উনুন, একটা কড়া, এ্যালুমিনিয়ামের বাসনে আটা আর বাটিতে লঙ্কা— পরণে তার লুঙ্গি, গায়ে হাতে-বোনা গেঞ্জি। ঠিক কালী প্রতিমার মতো একঠায় বসে কুবেরণ প্রথম প্রথম রোজ এক সের লঙ্কার পকোড়া তৈরী করে বিক্রী করতো। এই এক মাসে বস্তাখানেক লঙ্কার পকোড়া বিক্রী করে মস্তবড় এক ব্যাবসাদার হয়েছে। ক্রমশ কুবেরণকে সবাই লঙ্কার পকোড়া বলে চিনতো। প্রথম দিনে এক আনায় চারটে, শেষে তিনটের বেশি দিতো না। কেউ যদি বিনা পয়সায় বা ধারে চাইতো তাহলে সোজা 'না' বলে দিতো। এর জন্য লোকেরা বিরক্ত হয়ে ওর নাম দিলো 'পকৌড়ী রাও'।

এই করে কুবেরণ ত্রিবান্দ্রম থেকে এই সহরে এসে পকৌড়ী রাও নাম নিয়ে বেশ জমিয়ে বসলো। আজ সে সত্যিই কুবের। কিন্তু···

চক্রপাণির কফি শেষ, সঙ্গে চিন্তাধারাও। কাল তেঁতুল লঙ্কার দোকান খুললে লোকে কি বলবে? এই প্রশ্ন ওর মনে অনবরত তোলপাড় করতে থাকে। লোকে ওকে 'তেঁতুল চক্রপাণি' বলবে। এখন ওর বাচ্চাদের লোকে ধনম এ্যাণ্ড কোম্পানীর একাউণ্টেণ্টের বাচ্চা বলে। তখন?

চক্রপাণি ওখান থেকে উঠে পড়লো।

নাগয়্যাকে দিয়ে স্পেশাল পান তৈরী করালো। পান খেতে খেতে চক্রপাণি ভাবে বাইরে রোদ্দুর যত বাড়ছে, তেমনি জিনিসের দামও বেড়ে চলেছে।

গা দিয়ে ঘাম ছুটছে। এর ওপর টেরিলীনের সার্ট। উদাসভাবে চক্রপাণি শর্মিলা ঠাকুরের টাঙানো পিন-আপ দেখতে থাকে— আড় চোখে। চক্রপাণির স্টেটাস বড় কিনা তাই।

'আপনাকে আর এই প্রচণ্ড রোদ্দুরে অফিসে যাবার কষ্ট করতে হবে না।' পেছন থেকে একজন বলে ওঠে। চক্রপাণি চমকে উঠলো। পরক্ষণেই ভাবে যে কথাটা ওকে উদ্দেশ্য করে বলে নি। কিন্তু ঐ অয়য়ারাও চক্রপাণিকে উদ্দেশ্য করেই কথাটা বলে।

'নাগয়্য়াজী, একটা মসলা দেওয়া পান লাগাও দেখি। আজ এই ভদ্রলোকের কপাল খুলবে। ঝন-ঝন্ আওয়াজ করে স্বয়ং লক্ষ্মীর আগমন হবে।' অয়য়ারাও বলে। চক্রপাণির দিকে অয়য়ারাও এমন ভাবে তাকায় যেন সে ওর অনেককালের পুরোনো বন্ধু। আগুনে ঝলসানো এই দারুণ রোদ্দুরে, পেটের জ্বালা মেটাতে এক কাপ কফি খেয়ে চক্রপাণিকে ওখানে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে, অয়য়ারাও খুব খুশি হয়ে হাসলো।

'নমস্কার, স্যার। এতো চড়া রোদে পায়ে হেঁটে এতো দামী শার্টটা ঘামে ভেজাবার দরকার কি? একমাস একটু ধৈর্য ধরে থাকুন। তারপর প্লিমেথ গাড়ীতে চড়ে এখানে আসবেন। হর্নের আওয়াজ শুনলেই নাগয়্যা নিজে ভালো পান তৈরী করে আপনার কাছে পৌঁছে দেবে। আপনি গাড়ীতে বসেই পান খেয়ে সোঁ করে চলে যাবেন।' অয়য়ারাও নিজের পকেট থেকে চেক-বুকের মতন একটা বই বার করে কথার তুবড়ি ছুটিয়ে যায়।

স্পীড লিমিট ছাড়িয়ে যাওয়া গাড়ীর মতো অয়য়ারাওয়ের লেকচার খুব মন দিয়ে শুনতে লাগল—

কোথায় যেন ওকে দেখেছে মনে হয়।

গলার স্বরও খুব চেনা চেনা। ভালো করে নাম না জানা অয়য়ারাওকে চক্রপাণি ভালো করে দেখতে থাকে। খুব আশা নিয়ে নাম-না-জানা চক্রপাণিকেও অয়য়ারাও দেখতে লাগলো।

নাগয়্যা পান তৈরী করে চক্রপাণিকে দিতে দিতে বললো, 'অয়য়ারাওয়ের কথায় বিশ্বাস করবেন না। নাম্বার ওয়ান ধড়িবাজ। গত পাঁচ বছর ধরে আমি ওর কাছে কিনছি কিন্তু এখনও পর্যন্ত একবারও লক্ষ্মীর ঝনঝন শব্দ শুনতে পাই নি।'

চক্রপাণির আর বুঝতে বাকী রইলো না।

অয়য়ারাও খুব দামী পোষাক পরে আছে। তারিখ ও দিন জানানোর বড় ঘড়ি ওর হাতে। সব কটা আঙুলে আংটি। সব কটা আঙুলের মধ্যে চেক-বইয়ের মতো লটারীর টিকিটের বই দেখা যায়। এইভাবে অয়য়ারাও এই চকে নিজের আড্ডা গেড়েছে। সারা মাস ধরে লোকেদের লক্ষ্মীর আগমনের ঝনঝন আওয়াজ শুনিয়ে, বাচ্চা থেকে বুড়ো, সবাইকে নিজের মিষ্টি গলার স্বর শুনিয়ে, সুন্দরভাবে কবিতা আওড়িয়ে সবাইকে ভোলায়।

চক্রপাণি ভাবে একটু হেসে ভদ্রভাবে ওর কাছ থেকে ছাড়া পেতে হবে। ওকে বুঝিয়ে দেবে যে সে একটা যে সে লোক নয় যে এই লোভে আটকা পড়বে। অতি সাধারণ যারা তারাই ওর পেছনে জোঁকের মতো লেগে থাকবে।

অয়য়ারাও কিন্তু হাল ছাড়ে না; বরঞ্চ আরো মরিয়া হয়ে ওঠে। পাকাপোক্ত ভোটপ্রার্থীর মতো হেসে অয়য়ারাও বলে,

'এইভাবে সোজাসুজি 'না' বলবেন না স্যার। আপনার মতো লোকেদের ভাগ্যেই লক্ষ্মী নাচছেন। তা না হলে আপনিই বলুন না; এই রোদে আমিই বা আপনার কাছে কেন এলাম? আমার মন

বলছে, মা কনকদুর্গারও সেই ইচ্ছে, এবার আমার হাতে যে টিকিট কিনবে (ঝনঝন আওয়াজ করতে ঐ মহল্লায় অয়য়ারাওর জুড়ি আর কেউ নেই। লোকে বলে ও যখন ঝনঝন আওয়াজ করে তখন সত্যিই পয়সার শব্দ শোনা যায়) সে-ই লাখ টাকা পাবে।'

পেনের ক্যাপটা খুলে পেনের পেছনে লাগাতে লাগাতে অয়য়ারাও বললো, 'বলুন স্যার। আপনি যার নাম বলবেন তার নামেই লিখে দেব— আপনার ওয়াইফ, আপনার সন্স, ডটার্স, ব্রাদার-ইন-ল, বেবীজ— যার ইচ্ছে তার নাম লেখা যেতে পারে।'

'আমার কুকুরের নামও লেখা যেতে পারে?' চক্রপাণি মনে মনে ভাবে, কিন্তু কিছু বললো না। আসল কথা ওর বাড়ীতে সেরকম কোনো পোষা কুকুর নেই— আর না আছে ফালতু পয়সা।

'যেতে দাও।' বলে সে এগিয়ে যেতে চাইছিলো। কিন্তু তা হয় না। বলে 'আচ্ছা বলুন তো। আপনি তো এত জোর গলায় বলছেন যে আমি লাখ টাকা নিশ্চয় পাব। তাতে আপনার কি লাভ? শুধুমাত্তর দশ পয়সা কমিশান?' চক্রপাণি হেসে ফেলে

'ইনসাল্ট।' অয়য়ারাও অট্টহাসি হাসে। বলে, 'স্যার। আপনি দশ লাখ পেলে এই শ্রীমান দশহাজার পাবে।' শ্রীমান বলার সময় সে নিজের বুকের দিকে কলম দিয়ে দেখায়। শিগ্গিরিই এটা নিন, এখন এই নম্বর আপনার। এটা লাকি নাম্বার স্যার, প্রাইজ গ্যারাণ্টিড।' এতো বলার পর সে নাগস্বামীকে জিজ্ঞেস করে, 'শ্রীমানজীর পুরো নামটা কি বলো তো গুরু?'

চক্রপাণি শেষবারের মতো চেষ্টা করে দেখে, 'ঐ লাকি নম্বরটা তুমিই নিয়ে নাও না।'

'নো, নো, স্যার। আমার লাখ টাকার লোভ নেই, দশ হাজারই আমার যথেষ্ট। অয়য়ারাও বড় অদ্ভুতভাবে হেসে ওঠে।

নাগয়্য়া বেশ বুঝতে পারে যে চক্রপাণির আর অয়য়ারাওর হাত থেকে রেহাই পাবার কোনো উপায় নেই।

নাগয়্য়া বললো, 'নিন স্যার। পকৌড়ী রাওর মতো আপনিও কোনো বড় কোম্পানী খুলতে পারবেন।

চক্রপাণির আশা অঙ্কুরিত হয়ে ক্রমশ পল্লবিত হয়ে ওঠে। 'যাদুগরের আমে'র মতোই অল্প সময়েই বড় বটগাছের আকার নেয়।

কিন্তু পকেটে যে পয়সা নেই।

পয়সা থাকলে চারটে ইড্‌লি মনের আনন্দে খাওয়া যেতো।

'আজ থাক, কাল কিনবো। আজ সঙ্গে পয়সা আনি নি।' 'এই বলে এড়িয়ে যায়।

অয়য়ারাও মুখটা কাঁচুমাঁচু করে নেয়। চক্রপাণির কাছ থেকে এ ধরনের কথা সে আশা করেনি, এটাই তার মুখের ভাবে প্রকাশ পায়।

'দেরী করলে হাতের জিনিসটা ফসকে যায়। কাল এই নম্বর, এই সময়, এই মুহূর্ত, এই ভাগ্য··· আবার কি করে পাবেন? নো ইউজ স্যার। আজ এই সন্ধিক্ষণে··· ঝনঝন আওয়াজের মধ্যে··· লক্ষ্মীর করুণা আপনার পেতে হবে··· আপনার গাড়ীতে করে অফিসে যাওয়া উচিত।'

'এবার থামাও তোমার ঐ ঝনঝনানি··· লিখে দাও ওঁর নামে একটা টিকিট··· একটা টাকার জন্যে অত ভাববার কি আছে··· কালকে আমি ওঁর কাছ থেকে নিয়ে নেব··· এই নাও···' বলে উদার-ভাবে নাগয়্য়া একটা টাকা বের করে দিয়ে দেয়। চক্রপাণির জানি না কেন এত কড়া রোদ্দুরেও হাওয়াটা ঠাণ্ডা মনে হ'লো কিছুক্ষণের

জন্যে। হাসতে হাসতে বললো, 'এক টাকায় লাখ। আমার এতো লোভ নেই।'

অয়য়ারাও নাগয়্য়ার হাত থেকে টাকাটা নিয়ে নেয়; চক্রপাণির নামটা জেনে লিখে দিলো। ইষ্টদেবতার নাম না জিজ্ঞেস করেই 'বজরংবলী' লিখে নেয় আর টিকিটটা ছিঁড়ে দিয়ে দেয়।

নাগয়্য়ার হাতে টিকিটটা দিয়ে বললো, 'এই নিন্, আপনি হাতে করে শ্রীমানজীকে দিন। লাক— একলক্ষ পথ খুঁজে আপনি চলে আসবে··· এখন থেকে ভাবো, এটা চক্রপাণির হাতে সুদর্শন চক্র হয়ে থাকবে··· লাকি চান্স। সুবর্ণ সুযোগ। বাঃ রে বাঃ।'

চক্রপাণি হেসে ফেলে।

এমন ভাবে বলে যেন লাখ টাকাই দিয়ে দিচ্ছে।

'আপনি খুবই ভাগ্যবান। দেখবেন এটাই লাখ টাকা হবে। আপনার সমস্যার সমাধানে লাগবে এই এক লাখ। আপনার সুন্দর আশা-আকাঙ্খা সব পূরণ করবে এই কল্পতরু। বাগানে বা কারাগারে যেখানেই থাকুক না কেন— আপনাকে খুঁজে বার করবে যে লক্ষ্মী সে এই লাখ টাকাতেই আছে। আচ্ছা, নাগয়্য়াজী, আপনার কি মত? আপনার নামেও কি একটা টিকিট কাটবো?' অয়য়ারাও সমানে বলে যায়।

'থামুন মশায়। ওঁকে তো লাখ টাকা পাইয়ে দেবার প্রতিজ্ঞা করে ফেলেছেন? আমাকে আবার কোত্থেকে দেবেন? তুমি বড়···,' চটে ওঠে নাগয়্য়া।

চক্রপাণি টিকিট নিয়ে নেয়। সঙ্গে সঙ্গে টাকা দিতে না পারার অক্ষমতা লুকোবার জন্যে একটু হেসে বাইরের প্রচণ্ড রোদ্দুর থেকে অফিসের গরম আবহাওয়ার মধ্যে ঢুকে পড়ে। লটারীর টিকিটটা

সে প্যাণ্টের পকেটে রেখে দিলো। 'হুঁঃ··· সুদর্শন চক্র। ···এক লাখ টাকা। কাগজের এই চিরকুটে? ভরসা কি যে আমিই পাবো?' এইসব ভাবতে ভাবতে সে নিজের চেয়ারে গিয়ে বসে পড়লো। 'অয়য়ারাও খুব বুদ্ধিমান। আর যাই হোক্, আমার চেয়ে ও অনেক ভালো আছে, কত জমকালো···'

চক্রপাণি কাজে মন দেবার চেষ্টা করে। কিন্তু মনটা আজ অশান্ত। পকেট থেকে লটারির টিকিটটা একবার বার করে দেখে-নেবে ভাবছিলো। ক্যাসিয়ার নিজের চেয়ারে বসে আরাম করে নস্যি নিতে নিতে বললো, 'কি সায়েব। আজ বড় খুশি মনে হচ্ছে? কি ব্যাপার?'

চক্রপাণি একটু আশ্চর্য হয়ে যায়। বুঝতে পারে না, তার টিকিট কেনার কথা এরা কি করে জানতে পারলো?

'কই তেমন কিছু হয়নি তো?' চটপট চক্রপাণি বলে ফেলে!

'হেঁচ্চো,' হেঁচে নিয়ে ক্যাসিয়ার ভঙ্গমতি বললো, 'আজ আমার গৃহিণী ঋতুমতী। আমি নিজেই রান্না করে খেয়েছি। লাঞ্চ-টাঞ্চ কিছু আনি নি। বাইরে রোদ্দুর আর ভেতরে ক্ষিদের জ্বালা, দুয়েতে মিলে ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছে।' ভঙ্গমতি নিজের দুঃখের কাহিনী শোনায়।

'খুবই দুঃখের।' সহানুভূতি দেখিয়ে চক্রপাণি বলে। 'আমারও প্রায় একই অবস্থা। আমার স্ত্রী তো বাড়ীতে আছে। কিন্তু শুধু আমি তো খেতে পারি না। উপমা তৈরী করলে চারটে বাচ্চাকেও একটু একটু দিতে হয়, এতোটা কোথেকে হবে?'. মনে মনে চক্রপাণি ভাবে। মুখে শুধু বললো, 'এই পাখাটা একেবারে কোনো কাজের নয়। গরম হাওয়া আসছে। উঃ, কি দুঃসহ গরম।' হঠাৎ সুদর্শন চক্রের কথা মনে পড়লো।

'এক লাখ টাকা। যদি পাই তা হলে কি এরা সত্যি দেবে? কেন দেবে না? ছোটবেলায় তেলওয়ালা সুব্বায়য়ার বিষয়েও আমি এ রকম গল্প শুনেছিলাম। ঐ টাকা দিয়েই ও বর্মা শেল কোম্পানী খুলেছিলো। ...আমি যদি পাই তা হলে সর্বপ্রথম এয়ার কণ্ডিশান ঘর করবো... কিন্তু আমার মতো লোক লাখটাকা... না... পাবে না... কিছুতেই পাবে না...'

'কিন্তু কেন? আমি ওর থেকে কম কি? তা ছাড়া গঞ্জাভায়ের মতো আমি টিকিটের পোকা হয়ে সব জায়গায় ঘুরে বেড়াই না। ঐ তো আমার কাছে এসেছে। যেমন অয়য়ারাও বলেছিলো যে ঝন-ঝন আওয়াজে লক্ষ্মী নিজেই আসে। ছোটবেলায় আমি যেন কোনো বইতে পড়েও ছিলাম যে লক্ষ্মী আসার হলে নারকেলের জলের মতো নিজেই হঠাৎ চলে আসেন।'

'এক লাখ টাকা পেলে কি করা যায়' চক্রপাণির কাছে এটা মোটেই কোনো সমস্যা নয়।

যে গ্যারেজে সে আগে থাকতো সেটা ও বাড়িওয়ালা রামপ্রসাদের মুখে ছুঁড়ে মারবে। আড়াই কামরার পুরোনো কুঠরী... তাতে না আছে কল, না আছে পায়খানা। মাকড়সা, ইঁদুর, আরশোলা... যতসব নোংরা... ঘিন্‌ঘিনে...

সঙ্গে সঙ্গে তিরিশ হাজার টাকার একটা ছোট বাড়ী কিনতে হবে— কি রকম বাড়ী কিনবে চক্রপাণি সঙ্গে সঙ্গে সেটা মনস্থ করতে পারে না।

হালফিল রাজা রাও কুড়ি বছর ধরে আধপেটা খেয়ে একটা বাড়ী তৈরী করেছে। আধপেটা খেয়ে ও যে বাড়ীটা তুলেছে সেটা খুবই সুন্দর। এখন সে বেশ আরামেই দিন কাটাচ্ছে। এ রকমই একটা

বাড়ী কেনা উচিত। চক্রপাণি ঠিক করে ফেলে। হিসেব পরীক্ষা করছিলো, শেষের যোগটা দেখে তাতে টিক মার্ক দেয়। বড় ছেলে অঙ্কে খুব পাকা (যে রকম ও নিজে)। ওকে ইঞ্জিনিয়ারিং-এ ভর্তি করতে হবে। ··· আমার মতো কেরানীগিরি করলে দশ-পনেরো বছর পরে ও একাউন্টেণ্ট হবে। ছেলের ভবিষ্যতের কথাও চক্রপাণি ভাবতে থাকে।

বেচারী সারদা। সামনে এসে মুখপর্যন্ত খোলে না।··· বিয়েতে রেশমের শাড়ী দিয়েছিলাম, ব্যস, তারপর এ জন্মে আর কোনোদিন রেশমের শাড়ী কিনে দিই নি। স্ত্রীর জন্যে মায়া হয়। নাইলনের কাপড় চালু হ'লো, নাইলেক্স, টেরেলিন এলো, টেরিকট ও আরো কত রকমের কাপড়ই না বাজারে এলো। বড় ছেলের আঠারো বছর। শারদা ছেলের চেয়ে ষোলো বছরের বড়। এখনও বোফান এম্ব্রয়ডারি করা শাড়ী পরলে বিজ্ঞাপনের মেয়েদের ছবিগুলোকে হার মানাবে। ওর জন্যে তুটো··· না, না, এত কিপটেমি করা উচিত হবে না। এত টাকা পাচ্ছি, তু'ডজন শাড়ী কিনে ফেলবো। ব্যস।' চক্রপাণি এমনভাবে ভাবতে লাগলো যেন কথার নড়চড় হবে না।

সবাই মনে করে আমি সখ করে টেরিলিন পরি। কেন না এটা বেশ দামী জিনিস। রাত্তিরে ধুয়ে শুকিয়ে নিলে, সকালে ঘামে নোংরা কাপড় পরার বদলে পরিষ্কার ধোয়া কাপড় পরে যেতে সুবিধে হয়। এই জন্যেই ধার করে সে এটা তৈরী করিয়েছিলো। কিন্তু এই কথা কেউই বুঝতে চায় না। চক্রপাণি মাথা তুলে তাকায়। সবাই তার মনের কথা বুঝতে পেরে গেছে এই আশঙ্কাই ওর চাহনির মধ্যে ফুটে ওঠে। একটু দূরে একজন ক্লার্ক বসে ফিল্মফেয়ার পড়ছিলো, সেটা সে তাড়াতাড়ি দেরাজের মধ্যে রেখে দেয়।

চক্রপাণি হেসে ফেলে। মনে মনে ভাবে অয়য়ারাও ঠিকই বলেছিলো। প্লিমর্থ গাড়ীর কথা এখন থাক। যখন বড় ছেলে জন্মালো, তখন থেকেই তার সাইকেলটা অকেজো হয়ে পড়ে আছে। ওটাকে না সারিয়ে বরঞ্চ একটা মোটর সাইকেল বা ল্যাম্বেটা কিনলে কাজ দেবে।

ইতিমধ্যে চাপরাসী গণেশ এসে খবর দিলো, সাহেব ডাকছেন। চক্রপাণি স্কুটার ছেড়ে ম্যানেজিং ডাইরেক্টরের ঘরে গেলো। ঘর থেকে যখন বেরিয়ে এলো তখন সোয়া-তিনটে। যতক্ষণ ম্যানেজারের ঘরে ছিলো ততক্ষণ চক্রপাণির মুখ দিয়ে শুধু তিনটে কথা বেরিয়েছে, 'এস্‌সার, ঠিক আছে সাহেব, নিশ্চয় করবো সাহেব।'

নাগয়্‌য়ার কাছে এক টাকা ধার নিয়ে নিরূপায় হয়ে অয়য়ারাওর কাছ থেকে একলাখ টাকার কেনা লটারীর টিকিটটা পকেটে হাত ঢুকিয়ে চক্রপাণি একবার দেখে নেয়। ওটাকে কিন্তু বাইরে বার করে না। ভাবে, 'আর কিছুদিন পরেই এস্‌সার বুলিটি ছাড়তে পারবে।' তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরে সারদাকে এ খবরটা শোনাতে চাইছিলো। ওর ছেলে পার্থসারথি এবার ম্যানেজিং ডাইরেক্টরের ছেলে হবে। ততদিনে আমেরিকা যাবার সুযোগও পাবে। কেন পাবে না? টাকা হ'লে সবই হয়। দেয়ালে টাঙানো ঘড়ির দিকে তাকায়। হাঁসের মতো আস্তে আস্তে চলছে। সবে তিনটে বেজে পঁয়ত্রিশ। হঠাৎ সন্দেহ জাগে অয়য়ারাওর কাছে কেনা টিকিটটা জাল নয় তো? ক্যাসিয়ার আবার নস্যি নিয়ে হাঁচলো।

নোটগুলো বাণ্ডিলে বেঁধে তাড়াতাড়ি গুণে যাচ্ছে। চক্রপাণি ভাবে; এ থেকে একটা নোট বার করে নাগয়য়াকে এক্ষুণি শোধ করে দিতে পারলে কত ভালো হয়। দারুণ বিপদে পড়েও কারুর কাছে

কোনো জিনিস ধার নেওয়াটা— ও নিজের মতবাদের বিরুদ্ধে মনে করে।

কিন্তু কি করবে। লোভ দেখিয়ে অয়য়ারাও ওকে ফাঁদে ফেলেছে, চক্রপাণি কাজ করার ভান করে। ভাবনা চিন্তা আর সন্দেহ ওর কাজে বাদ সাধে।

যে লাখ টাকায় হাজারো সমস্যার সমাধান করে তা কি ও পাবে? হিসেব পরীক্ষা করে যেখানে টিক-মার্ক বসানোর কথা সেখানে কোয়ারী লাগিয়ে দেয় চক্রপাণি। কেন পাবো না?— পকৌড়ী রাও, ডেবী সুব্বায়য়া, সোমাইয়য়া ময়রা, পাপড়ওয়ালা পাপাইয়া— এরা কি সবাই সোনা নিয়েই জন্মেছে? তা হলে?

লক্ষ্মী তার ওপর এই ভাবেই সদয় হয়ে আসতে পারে। তখন ওর ছেলেরা ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ারদের মতো রোজগার করবে। লোকেরা তখন ওকে দেখে কি বলবে? একাউন্টেন্ট?— না, না, বলবে লক্ষপতি চক্রপাণি— সত্যি কি বলবে? চক্রপাণির সন্দেহ হয়। এখন অবধি কোনো লক্ষপতিকে লক্ষপতি বলে পরিচয় দিতে সে শোনে নি। কুবেরণকে কেউ লক্ষপতি বলে ডাকে না। ওকে পকৌড়ী রাও বলেই ডাকে।

তেলওয়ালা সুব্বয়য়াকে? চক্রপাণির বুকের ধকধকানি বন্ধ হয়ে আসে। হায় ভগবান, কাল আমাকে সবাই কি বলে ডাকবে? 'লটারী লাখ' চক্রপাণি বলে তো ডাকবে না? ল-টা-রী চক্রপাণি?

চক্রপাণি ঘেমে ওঠে।

গত পঁচিশটা বছর আধপেটা খেয়ে, বাচ্চাদের কোনো শখ আহ্লাদ না মিটিয়ে, স্ত্রীর সব শখকে উপেক্ষা করে একনাগাড়ে খেটে চক্রপাণি

একাউন্টেন্টের যে পদ পেয়েছে তা লটারীর জন্যে একবারে নিঃশেষ হয়ে যাবে? না— না···

ওর বংশের যথেষ্ট সুনাম। শ্রীমুখম্— চক্রপাণি সবসময়ে বন্ধু-বান্ধবের কাছে নিজের নামের চেয়ে নিজের বংশের নামটাই বিশেষ করে বলতো। এবার কি সে লটারী চক্রপাণি হয়ে যাবে? না, তা হতে পারে না। হতেই পারে না। চক্রপাণি বিড়বিড় করতে থাকে।

ক্যাসিয়ার বেশ মৌতাতে আর এক টিপ নস্যি নেয়। মাঝে মাঝে আড়চোখে চক্রপাণির দিকে তাকায়।

চক্রপাণি রেগে টং হয়ে যায়। অকারণ এই ক্রোধ। তা চাপার চেষ্টা না করে চক্রপাণি আবেগে বলে ওঠে, 'ক্যাসিয়ার সাহেব, একটু কষ্ট করে এখানে এসে ক্যাসটা মিলিয়ে নেবেন।'

'আজ্ঞে, হ্যাঁ।' বলে ভঙ্গমতি দুবার হেঁচে নিজের জায়গা থেকে উঠলো।

নানান ঝামেলার মধ্যে কোনোমতে চক্রপাণি কাজ করে যাচ্ছে। মনে তার এতটুকুও শান্তি নেই। মনের মধ্যে থেকে থেকে পকৌড়ী রাও, তেলওয়ালা সুব্বয়য়া, মদওয়ালা ব্ওয়য়ার নাম ভেসে ওঠে। নাগয়্য়া আর অয়য়ারাওর ওপর প্রচণ্ড রাগ হয়। চক্রপাণির ভয় হয় যে ও না লটারী পেয়ে যায়। ভুল করেও যেন ওর নাম না ওঠে। এই সব এলোমেলো চিন্তা ওর মনে পাক খেতে থাকে। এক লাখ টাকা ওর কি কাজেই বা লাগবে? মান মর্যাদার দিক দিয়ে এই কটা কাগজের কিই বা এতো দাম? কথাগুলো আর চাপতে না পেরে বলেই ফেলে।

'তিন হাজার নশো চৌযট্টি টাকা— আর চব্বিশ পয়সা— রিটার্ন।'

বলতে বলতে ভঙ্গমতি হঠাৎ চমকে ওঠে। বলে, 'কি বলছেন মশায়! লাখ টাকার চেয়ে বেশি মান-সম্মান আর কিসে হতে পারে?'

'আপনার কথা বলছি না। লেট্স্ প্রসীড।' চক্রপাণি পাকা একাউন্টেন্টের চালে বললো।

পাঁচটা পর্যন্ত কাজ করে চক্রপাণি ক্লান্ত হয়ে পড়ে। খাতাপত্র দেরাজে রেখে পাট গোটানোর কথা চিন্তা করে। সূর্যপ্রকাশমের কাছে যেতে হবে। ও পঁচিশটা টাকা ধার দেবে বলে কথা দিয়েছে। ক্লাবে গিয়ে নিতে বলেছে। আজ না গেলে স্রেফ বলে দেবে যে পয়সা তাসে চলে গেছে ব্রাদার। সূর্যপ্রকাশম কালেক্টরের অফিসের সাধারণ ক্লার্ক। কিন্তু রোজ ক্লাবে গিয়ে তাসখেলার পয়সা ও কি করে পায় এটা চক্রপাণি কিছুতেই বুঝতে পারে না। 'যাক্ সে কথা। ও-তো আমারই ক্লাস-ফেলো, দিননাথের মতো মাঝে মাঝে টাকা ধার দেয়।'

চক্রপাণি কি করবে তা ঠিক করে নেয়। উঠে পাখা বন্ধ করে বাইরে বেরিয়ে যায়। প্যাণ্টের পকেটে লটারীর টিকিটের ওজন বেশ ভালোভাবেই অনুভব করে। অফিস থেকে বেরিয়ে বিকেলের পড়ন্ত রোদ্দুরে চক্রপাণি হেঁটে চলে। সামনে ফলের দোকানে একটা গাড়ী এসে দাঁড়ালো। সূর্যের আলোয় কালো রঙের গাড়ীটা চকচক করছিলো। গাড়ী থেকে একজন মহিলা খুব কায়দা করে নামলেন। দরদস্তুর না করেই আপেল আর কলা কিনে গাড়ীতে উঠে চলে গেলেন। চক্রপাণি ভাবে, 'যদি আমার এরকম গাড়ী থাকতো তা হলে সারদাও এইভাবে চালাতো।' ঐ ভদ্রমহিলাটি কে? কে হতে পারে? নিশ্চয় ওঁর ছেলেপুলে আছে। তা না-হলে একডজন আপেল নিয়ে করবেনটাই কি? ফলের দোকানে কয়েকজন বলাবলি করে, 'ইনি

নেড়ীর পুত্রবধূ। ওঁর স্বামী ফিল্ম প্রোডিউসার।' লোকগুলোর কথা চক্রপাণির ভালো লাগে না। মনে মনে রেগে ওঠে ওদের ওপর।

এবার ও বুঝতে পারে ঐ ভদ্রমহিলাটি কে।

ও টিম্বার মার্চেণ্ট নলিনীকান্তর স্ত্রী।

এক সময়ে নলিনীকান্তের মা কাঠের ব্যাবসা আরম্ভ করেছিলো, ওর মাথায় একটাও চুল ছিলো না। সেইজন্যেই ওর দোকানটাকে নেড়ীর দোকান বলেই সবাই জানতো। পরে ওর ছেলে বড় হয়ে লাখ লাখ টাকার কাঠের ব্যাবসা করে। এখন ও সারা পৃথিবীতে একজন বড় টিম্বার মার্চেণ্ট নামে খ্যাত। কিন্তু কি লাভ? লোকে তো এখনও বলে সে নেড়ীর ছেলে আর ও তার বউ। চক্রপাণি উদাস হ'য়ে পড়ে।

'নমস্কার চক্রপাণিবাবু।' পেছন থেকে একজন বলে ওঠে চক্রপাণির কানে এই ডাক অন্যরকম শোনালো। 'লটারী চক্রপাণি-বাবু।' এই ডাকে ওকে কেউ ডাকে নি, এটা ওর মনেরই ভুল।'

'এই লাখ টাকা না পেলেই ভালো।' ওর মন আবার বলে ওঠে।

সে এখন বাস স্টপে দাঁড়িয়ে। রোদ্দুর সারা গায়ে যেন হুল ফোটাচ্ছে। পকেট হাতড়ে দেখলো— শুধু ক্লাবে পৌঁছোনোর পয়সাই আছে। ঐ সঙ্গে লটারীর টিকিটটাও। ভাবে, টিকিটটা বার করে একবার দেখে নিলে কেমন হয়।

কিন্তু বিকেলের এই ভীড়, এই রোদ্দুর, এই গরম হাওয়া, ধুলো আর ধোঁয়া দেখে তার নিজেরই লজ্জা হয়। ভাবে এই অবস্থায় টিকিট বার করে পড়াটা তার পক্ষে শোভা পায় না। এক লাখ টাকা। হাজার সমস্যার সমাধান করবে এই এক লাখ টাকা। একবার লাকি নম্বরটা দেখার ইচ্ছে হয়।

বাসের কোনো পাত্তাই নেই। চক্রপাণি নিজের ছেলের আমেরিকা যাবার কথা ভাবছিলো। ওর বড় ছেলে 'পার্থসারথি আমেরিকা রিটার্ণ্ড' হ'য়ে এই ভাবে রোদের মধ্যে কি বাসের জন্যে অপেক্ষা করবে? সূর্যপ্রকাশমের কাছে টাকা ধার নিতে যাবে?

যাবে না— ও ঠিক করে ফেললো।

একজন জানাশোনা লোক 'নমস্কার' জানালো। আর দুদিন পরে পার্থসারথিকে দেখে লক্ষ লক্ষ লোক নমস্কার করবে। কেনই বা করবে না?

তবুও ওর সন্দেহ হ'লো।

এও হতে পারে পার্থসারথিকে লোকে ঈর্ষার চোখে দেখবে। লোকে ওকে দেখে কি বলবে? হযতো তারা পরস্পরের মধ্যে আলোচনা করবে, 'তুমিও যদি ওর বাবার মতন লটারীর টাকা পাও তা হ'লে আমেরিকা কেন 'মুন'-এও বেড়িয়ে আসবে ব্রাদার। (ছিঃ! কি দুরবস্থাই না এ দেশের।)'

'হঠাৎ আঙুল ফুলে কলাগাছ হ'লে লোকে এইরকম হ'য়ে যায়—' দাঁড়িয়ে কেউ যেন আর একজনকে বলছে।

কথাটা কানে যেতেই চক্রপাণি চমকে ওঠে।

কোনো একটি মেয়ে লোকটির পায়ের ওপর দিয়ে গাড়ী চালিয়ে বেরিয়ে গেলো। ব্যথায় কাতরাতে কাতরাতে লোকটি বললো।

চক্রপাণি শুধু মেয়েটার নাম জানার জন্যেই কৌতূহলী হয়ে উঠলো না, তার বিস্তারিত খোঁজ নেওয়ার কথা ভাবলো।

আজ থেকে দশ বছর পরে এই মেয়েটির মতো (যদি অবশ্য ও লটারী পায় তবে) তার মেয়েও গাড়ী চালাতে পারে—

চক্রপাণি ভাবে যে নিজের মেয়েকে ডাক্তারী পড়াতেই হবে।

গাড়ীর দুর্ঘটনা থেকে কোনোমতে বেঁচে-যাওয়া লোকটিকে জিজ্ঞেস করে, 'মেয়েটি কে ?'

'যেই হোক না কেন। এটা তো কলিযুগ। চোখদুটো মাথায় তুলে চলে এই সব আধুনিকারা। অনেকদিনের কথা। গুণয়য়া নামে এক গরীব লোক ছিলো। সে সময়ে আমি খুব ছোট। লটারীর টিকিট পেয়ে হঠাৎ ওর ভাগ্য ফিরে যায়। ব্যস্, তারপর, দেখতে দেখতে সে নবাব হয়ে উঠলো। তিতলী নামে এই মেয়েটা তার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর ছেলের মেয়ে। ডাক্তারী পড়ার অছিলায় সে এ পৃথিবীর সব রকম অন্যায়ই করে বেড়ায়।' এই বলে চক্রপাণিকে মুখ ভেংচায়। — গুণয়য়া। চক্রপাণির এই নামটা জানাশোনা মনে হয়। ওর পরিচিত কি ? ওর কোম্পানীর সঙ্গে গুণয়য়ার ডিলিংস্ আছে। হালে গুণয়য়াকে ক্ষতিপূরণও দিতে হয়েছে। সে লক্ষপতি। গুণয়য়া খাদের এক কোম্পানীর মালিক।

চক্রপাণির খুব দুঃখ হয়। পাশে দাঁড়ানো বুড়ো লোকটার ওপর রাগই হয়। এই হারামজাদা অন্যের উন্নতিতে জ্বলেপুড়ে মরে। ভাবে, এ গাড়ী চাপা পড়ে মরে গেলেই ভালো হ'তো। লটারীর টিকিট বিক্রীর একটা গাড়ী ঐ রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলো। বুড়ো লোকটি বলে, 'কি খারাপ সময়ই না পড়েছে ? এই লটারীওয়ালারা দুনিয়াটাকে লুটেপুটে খাচ্ছে।'

লটারীতে লাখ টাকা পেয়ে সারদা আর ছেলেমেয়েদের সঙ্গে কি রকম ভাবে জীবন-যাপন করবে, চক্রপাণির এই রকম একটা চিন্তায় ছেদ পড়লো। এই লটারীর ব্যাপার নিয়ে লোকেদের নানান মন্তব্য ও উপহাস ওকে আর ওর পরিবারবর্গকে শুনতে হ'ত।

পকেটে হাত দিয়ে দেখলো, লক্ষ আশা-আকাঙ্খা যে পূরণ

করবে, ঝন্‌ঝন্ শব্দে যার সঙ্গে লক্ষ্মী আসবে— অয়য়ারাওর কথাগুলো ওর কানে বাজতে থাকে। চক্রপাণির মনে হয় এই টাকা তার জীবনে লক্ষ আশা-আকাঙ্খা মেটানোর বদলে সহস্র সমস্যাকে টেনে আনবে।

সে ব্যতিব্যস্ত হ'য়ে পড়ে। এই সব এলোমেলো চিন্তার হাত থেকে রেহাই পাবার জন্যে নিজের শালার লেখ' ইনল্যাণ্ড চিঠির মধ্যে সযত্নে রাখা লটারীর টিকিটটা বের করে মন দিয়ে তার দুটো পিঠই দেখে।

বাসের কোনো হদিশই নেই। চিঠিটার ভেতরে রেখে টিকিটটাকে ও মন দিয়ে একলা দেখতে থাকে। লাখ টাকার ফার্স্ট প্রাইজই শুধু নয়, তার সঙ্গে দুটো সেকেণ্ড প্রাইজও আছে— তিরিশ হাজারের। তিনটে থার্ড প্রাইজ আছে— দশ হাজার করে। ছোট ছোট হরফে ওটাতে এই সব লেখা আছে। নম্বর··· 3245670। চক্রপাণি ভাবে, লাখ টাকার দরকার নেই। দশ হাজার পেয়ে গেলেই যথেষ্ট। ধারের পয়সা মিটিয়ে আরামে থাকতে পারবে। তাতে পাবলিসিটি করার কোনো কষ্টই থাকবে না। অয়য়ারাও বা নাগয়্যা কেউই এর কোনো উচ্চবাচ্য করে নি।

লাখ! লাখ! শুধু এই বলে ব্যতিব্যস্ত করেছে। আমায় এক টাকার ধারী করেছে।

লাখ টাকা পেয়ে গেলে বেশ আরামে থাকতে পারবে। কিন্তু মর্যাদা সব মাটিতে মিশে যাবে। সারাজীবন ধরে শুধু অপমান সহ্য করে যেতে হবে।

টিকিটের নম্বরগুলোকে নিউমারোলজীর হিসেবে যোগ করে দেখলো, নয় হচ্ছে।

বুকটা কেঁপে ওঠে। তার ভাগ্যের নম্বরের সঙ্গে নয়ের কোনো মিল নেই। এ থেকে অপমান, অপযশ আর অপকার অবশ্যম্ভাবী। এবার চক্রপাণি লাখ টাকার নামে ভয়ে কেঁপে ওঠে।

ইতিমধ্যেই একটা বাস এসে পড়লো।

কিন্তু বাসটা তার গন্তব্যস্থলে যাবে না।

সূর্যপ্রকাশম ছটার আগেই আসতে বলেছিলো। চক্রপাণি ঘড়ি দেখে। পাঁচটা-পঞ্চাশ। সূর্যপ্রকাশমকে চক্রপাণি খুব ভালো করেই চেনে। জানে ছটার পর তাস ছেড়ে কিছুতেই সে আসবে না। লটারীতে টাকা পেলে সেও তাস খেলবে। সে নামকরা তাস খেলোয়াড়। ব্রিজ খেলায় মাত করে দেয়। এখন শুধু সংযমী হয়ে নিজেকে দূরে সরিয়ে রেখেছে (পয়সার অভাবে)। চক্রপাণি ন-নম্বরের খারাপ প্রভাবটা এখন থেকেই বুঝতে পারে।

নিজের কথা নয় বাদই দিলো, ছেলেমেয়েরা যদি এর খপ্পরে পড়ে তবে তাদের কি অবস্থা হবে? ইচ্ছে হয় টিকিটটা বার ক'রে ফেলে দিতে।

কিন্তু মন তা মানে না।

লাখ টাকার দরকার নেই দশ হাজার হ'লেই চলবে। মনে মনে গুনগুনিয়ে ওঠে— এক হাজারের কোনো প্রাইজ থাকলে তাই যথেষ্ট— আবার মনে মনে গুনগুন করতে থাকে।

ওরে, বাস এসে গেছে [illegible] ধাক্কাধাক্কি করছে— চক্রপাণিও বাসে উঠে [illegible] একটা টিকিট কিনে নেয়।

'লটারী [illegible] যদি এরকম কঞ্জুস [illegible] কি করে কাজ [illegible]' [illegible] এই কথাটাই

পাকে প্রকারে বলতে চায়। 'দশগজ পরের স্টপেজের জন্যে পাঁচ পয়সা ভাড়া বেশি চায়।' এই ব'লে চক্রপাণি কণ্ডাকটারের চোদ্দ-পুরুষকে উদ্ধার করলো।

বাসে ভীষণ ভীড়। ঘামের দুর্গন্ধে টেকা দায়। বাস তো নয় যেন নরক। ভীড়ে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়লো চক্রপাণি। ভাবে, 'লটারীর পয়সা পেলে দেখা যাবেখন।' কণ্ডাকটর বস্তায় তুলো ঠাসার মতো করে বাসেতে লোক তুলেছে।

সূর্যপ্রকাশমের কাছে যাওয়া চক্রপাণির নেহাতই দরকার। ওকে ছাড়া কাজ চলবে না। 'আসচে কাল নাগয়্যাকে টাকাটা ফেরত দিতে হবে।' লাখ টাকার লটারী না পেলেই ভালো। দশ হাজারের প্রাইজটাই ভালো। বার বার ও এই একই কথাই চিন্তা করে।

তাস খেলোয়াড় সূর্যপ্রকাশমকে টিকিটটা দিয়ে দিলে কেমন হয়...? আনন্দে সে আটখানা হ'য়ে পড়বে। যদি দরকার পড়ে তবে এ কথাও লিখে দেওয়া যেতে পারে যে এই টিকিটে আমার কোনো অধিকার নেই। বড়জোর একটা টাকাই যাবে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে লক্ষটা সমস্যার হাত থেকেও রেহাই পাওয়া যাবে। মান-সম্মান সবই অটুট থাকবে।

এত ভীড়ের মধ্যেও যে ভদ্রমহিলা নাইলনের শাড়ী পরে দাঁড়িয়ে ছিলেন তার দিকে চক্রপাণির চোখ পড়লো।

ঠোঁটে লাল লিপস্টিক, চোখে সুর্মা, লম্বা ফিতেবিহীন বেণী আলতোভাবে বুকের ওপর পড়ে আছে। মেয়েটার দাঁড়ানোর ভঙ্গী অনেকটা মালা সিন্‌হার ওয়াল-পোস্টারের মত। এত ভীড়ের মধ্যেও চক্রপাণির মনে কামনা আর লালসা জাগে।

আর দেখে কে? বাস স্টপ এসে পড়ায় কণ্ডাকটারের হাঁকডাক

যতক্ষণ না কানে যায় ততক্ষণ চক্রপাণি ঐ মেয়েটির চিন্তায় মশগুল। লক্ষ টাকার চিন্তাও উবে গেছে। কারুর কনুই, কারুর বা হাঁটু, দাদুর ছড়ি, মাস্টারমশায়ের ছাতা, স্কুলের বাচ্চাদের লাঞ্চবাক্স আর শেষবেশ ঐ মালা সিন্‌হার শাড়ীর আঁচল— সব পেরিয়ে চক্রপাণি কোনোমতে বাস থেকে নামলো।

আলো জ্বলে গেছে। ছটাও বেজে গেছে। ছুটে সে ক্লাবে ঢুকে পড়লো। প্রকাশমকে দেখতে পেয়েই চক্রপাণি বলে ওঠে, 'তোমার আর ভগবানের দর্শন পাওয়া একই ভাই।' লটারী পাওয়ার আনন্দের মতো সে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে। ভেতরে তাসখেলার তোড়জোড় চলছে নিশ্চয়ই, প্রকাশম হুড়মুড়িয়ে বেরিয়ে এলো।

'সরি, পাণি। পঁচিশের জায়গায় কুড়িই পেয়েছি। ওধারে সব বসে আছে। আমি চলি। বাই··· বাই।'

দশটাকার দুটো নোট চক্রপাণির ভিজে হাতের ওপর রেখে সে তক্ষুণি ভেতরে চলে যায়। মনে হ'লো ওকে যেন কেউ ধাওয়া করেছে। কুড়িটাকার বদলে চক্রপাণির মনে হয় সে হাতে উনিশ টাকাই পেয়েছে। একটা টাকা নাগয়্যাকে যে দিতে হবে।

'আরে, আমি একেবারে ভুলেই গেলাম। লটারীর টিকিটটাতো একেই দেবার কথা ভেবেছিলাম।' চক্রপাণি পকেটে হাত দিয়ে প্রকাশমকে ডেকে বলে, 'প্রকাশম, একটা কথা শোনো।' প্রকাশম বিরক্ত হয়ে ফিরে তাকায়। ওর জিজ্ঞাসু চোখের প্রশ্ন, কেন আবার কি দরকার? চক্রপাণির চিন্তাধারা পালটে যায়। এক লাখ টাকা। একটা নয়, দুটো নয়। এটা দিয়েই বা কি লাভ? 'না, ও কিছু না। এমনিই ডেকেছিলাম। আচ্ছা, গুডনাইট।' ব'লে চক্রপাণি ফিরে যায় পকেট থেকে হাত বার করলো। শুধু

রুমালটাই বেরিয়ে এলো। শ্যালকের ভেজা চিঠিটা আর নেই (লটারীর টিকিটটা যে তারই মধ্যে ছিলো)।

অন্য পকেটও দেখলো।

'না ও পকেটেও নেই। টিকিটটাও নেই, চিঠিটাও নেই।' চক্রপাণির বুক হিম হয়ে আসে।

'আরে, টিকিটটা গেলো কোথায়?' এই বলতে বলতে আলোয় সারা পকেট উল্টে দেখলো।

'ছিঃ ছিঃ, কি হতভাগ্য জীবন এটা। আমার কপালে ভিক্ষে করাই লেখা আছে। ফকিরের জীবন।'

কে জানে ও কে ছিলো, কাঁচের পরীর মতো দাঁড়িয়ে ছিলো। ওকে দেখেই তো আমার মনে লালসা জাগলো আর তাতেই গেলো হারিয়ে আমার লাখ টাকার টিকিটটা। আমার জীবনে ভালো দিন আর কখনো আসবে না। লাখ টাকার ভাগ্য আমার থেকে অনেক দূরে। চক্রপাণির চোখে জল নেই কিন্তু তার দুঃখের কূলকিনারা নেই। ইন্‌ল্যাণ্ড লেটারের মতে কোনো কাগজ দেখলেই সেটা তুলে আলোয় নিয়ে গিয়ে ভালো করে দেখে।

ফেরার পথে সে প্রায় সবকটা তুলে তুলে খুঁটিয়ে দেখে। খুঁজতে খুঁজতে আবার সে অফিসের বাসস্ট্যাণ্ডে পৌছে যায়।

একটা টাকা হারালে তার এত দুশ্চিন্তা হতো না। লক্ষ্মী স্বইচ্ছায় তার কাছে এসেছিলেন। এক লাখ টাকার টিকিট হারিয়ে গেলো। চক্রপাণি জীবনে এত নিরাশ আর কোনো দিন হয় নি। তিরিশ বছর ওর প্রোমোশান আটকে ছিলো, তাতেও ওর এতো দুঃখ হয় নি। নিশ্চয়ই কোনো ভাগ্যবানের হাতে পড়েছে। যে কোনো জিনিসের জন্যে ভাগ্য দরকার।

'তা না হলে এই গরীবের ভাগ্যে প্রাইজ কি করে উঠতো। হয়তো বাসেই হারিয়ে গেছে। বাসটার নম্বর কত ছিলো? কণ্ডাকটারকে জিজ্ঞেস করবো? কিই বা জিজ্ঞেস করবো? (লজ্জা পাওয়া উচিত) না, বলবো যে আমার একটা চিঠি হারিয়ে গেছে, বিশেষ দরকারী চিঠি।' কিন্তু চক্রপাণি বাসটার কোনো হদিশ পায় না। অভাগা যে দিকে চায় সাগর শুকিয়ে যায়।

'যাক্, বাঁচা গেলো।' কিন্তু বাসস্ট্যাণ্ড ছেড়ে যেতে পারে না। আটটা বেজে যায়। পুরোনো ঘড়িটা কানের কাছে এনে দেখে নেয়। ঘড়িটাও বন্ধ হয়ে গেছে। আটটা বাজার পর ওটাও বন্ধ হ'য়ে গেছে।

অনেক বাসই এলো আর গেলো। কিন্তু ওর যাওয়ার বাসটা আর এলো না। কে জানে কটা বেজেছে। নিশ্চয় নটা বেজে গেছে। ঘড়িটা হঠাৎ এখনই বা কেন থেমে গেলো। চক্রপাণি তেলেবেগুনে জ্বলে ওঠে। অয়য়ারাও, নাগয়্যা, বাস, ঐ মালা সিন্হার মতো মেয়েটা— সবার ওপর, নিজের ওপর আর সংসারের ওপর মন বিষিয়ে ওঠে; দুঃখও হয়।

হিসেব নিকেশের অভিজ্ঞতা চক্রপাণির কুড়ি বছরের। আশা করাটাই পাপ, কিন্তু এতে ক্ষতিই বা কী। 3245670 এই নম্বরটা মনে জপতে জপতে একাউন্টেন্ট চক্রপাণি বাড়ীমুখো রওনা হয়। শোক-দুঃখ, রাগ ও দয়া সবকিছুর ভার মনে নিয়ে সে পায়ে হেঁটে চলতে থাকে।

নেউলের গল্প

বংশধারা নদীর ধারে মন্তয়াম্ গ্রামে অয়য়ারাও কবিরাজের বাড়ী। নদীর পূর্বদিকে একটা ছোট্ট পাহাড়। ঐ পাহাড়ের ওপরেই কবিরাজের বাড়ী। দুটো বাড়ী ওখানে, একটা পাকা বাংলো, অন্যটা খড়ের চালা। প্রত্যেক বছর বানের ভয়ে নদীকে বাঁধাবার জন্যে সরকারের তরফ থেকে পাহাড় থেকে পাথর এনে তীরে ফেলা হয়। বাঁধ দেবার পর দুবার বন্যা হয়েছে; কিন্তু খুব অল্পের জন্যে বাঁধ বেঁচে গেছে।

ঐ নদীর ধার গরমকালে নীলগিরির মতো ঠাণ্ডা থাকে। শীতকালে গ্রামের চেয়ে বেশি ঠাণ্ডা এখানে। উঠোনে দাঁড়িয়ে দক্ষিণ দিকে বয়ে যাওয়া নদীর দিকে তাকালে যে প্রাকৃতিক দৃশ্য চোখে পড়ে তা মনকে পুলকে ভরে তোলে। খানিকটা দূরে ইতিহাসপ্রসিদ্ধ সালিহুণ্ডা পাহাড় দেখা যায়। লম্বা লম্বা কলাগাছের ঝাড়— একের পর এক, সূর্যাস্তের সময় বিচিত্র রঙীন নয়নমুগ্ধকর মেঘের শোভা। ফেব্রুয়ারি মাসের সন্ধ্যেবেলায় অন্ধকারের মধ্যে পশ্চিম দিগন্তকে আলোকিত করে রাখে শুকতারা। তার আলো কলকল প্রবাহিনীর ওপর যখন এসে পড়ে তখন সুগম ছন্দের নাট্যরস উপভোগ করা যায়।

এই নদীর কিনারার বাড়ীগুলোর যেমন একদিকে অনেক সুবিধে আছে— তেমনি কিছু অসুবিধেও আছে। বর্ষার সময় বানের জলের

সঙ্গে কাঠ, মৃতদেহ, সব ভেসে আসে। কখনও কখনও জ্যান্ত সাপও পাহাড় থেকে ঘরের ভেতরে এসে ঢোকে। একদিন রাতে সবাই যখন ঘুমোচ্ছিলো তখন ঘরের ছাদ থেকে একটা সাপ মেঝেতে পড়েছিলো। আয়ুর্বেদ চিকিৎসার সঙ্গে সঙ্গে অয়য়ারাও খেত-খামারেও কাজ দেখেন। তাই ফসল কাটার সময় তাঁকে আর একটু অসুবিধার মুখোমুখি হতে হয়। যত্ন করে রাখা-ফসলের শতকরা দশভাগ ইঁদুর আর ছুঁচোয় খেয়ে যায়। পাথরের মধ্যে ঐসব ছুঁচো আর ইঁদুর লুকিয়ে থাকে। রাতের বেলা স্বচ্ছন্দে ঘুরে বেড়ায়। দিনের বেলাতেও মাচাতে তুলে রাখা শস্য ও লঙ্কার বস্তা কেটে ছারখার করে। এই সবের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্যে অয়য়ারাও ইঁদুর ধরার ব্যবস্থাও করলেন। কিন্তু যে সব ইঁদুর ধরা পড়ে তাদের প্রাণে মারতে অয়য়ারাওর মায়া হয়। দূরে কোথাও ছেড়ে এলে রাতে আবার তারা যথাস্থানে পোঁছে যায়। একবার ইঁদুর মারবার ওষুধও ব্যবহার করলেন। ফলে মরা ইঁদুরের পচা গন্ধে তেষ্ঠানো হ'লো দায়। গন্ধের জন্যে তাঁদের বাড়ী থেকে বেরিয়ে যেতে হ'লো। যখন খেতে বসতেন তখন ওপর থেকে মরা ইঁদুরের গা থেকে সাদা সাদা পোকা ঝরে পড়তো। অয়য়ারাও এই সব দেখে রীতিমত ভয় পেয়ে গেলেন। একটা বেড়াল পুষলেন কিন্তু সেও ইঁদুরের ভয়ে গিন্নীর সঙ্গে গিয়ে শুয়ে পড়তো। বাড়ীতে সে কখনও শুতো না।

কবিরাজ মশায়ের দুটি সন্তান। ছেলে হাজার মাইল দূরে মিলিটারী অফিসার। মেয়ের শ্বশুরবাড়ী আট মাইল দূরে। বাড়ীতে বসে থেকে থেকে যখন আর ভালো লাগতো না তখন বাড়ীতে তালা দিয়ে খানিকদূরে উত্তর দিকে বট গাছের তলায় দাঁড়িয়ে

দাঁড়িয়ে গল্প করতেন। যদি কোনো বাস পেয়ে যেতেন তো তাতে চেপে মেয়ের শ্বশুরবাড়ী চলে যেতেন। ওখানে একদিন থেকেই ফিরে আসতেন। এইরকম ভাবেই ওঁদের দিন কাটতো।

কবিরাজ মশায় অনেক লোককেই অনেক রোগ থেকে সারিয়ে তুলছেন। কিন্তু ইঁদুর আর সাপের হাত থেকে তিনি নিজে মুক্তি পান নি।

একদিন সকালে এক বেদে এসে হাজির। গরীবের দুঃখ বোঝেন কবিরাজ মশায়, তাঁর জন্যে সে একটা নেউলের বাচ্চা নিয়ে হাজির। ওর বৌয়ের বমির ব্যারাম ছিলো, কবিরাজের ওষুধে সে ভালো হয়ে ওঠে। তারই প্রতিদান এটা।

'এটা নিয়ে আমি কি করবো?' কবিরাজ জিজ্ঞেস করেন।

'আপনার বাড়ীতে সাপ আর ইঁদুরের বড় উৎপাত। ছমাসের মধ্যে এটা বেশ বড় হয়ে যাবে। তখন বুঝতে পারবেন এ আপনাদের কত কাজে আসে।'

'এ কি পোষার মতো জানোয়ার!'

'সে তো আপনাদের ওপর নির্ভর করছে বাবু! পনেরো দিন ওকে কোনো একটা গর্তে দড়ি বেঁধে রেখে দিন। কুকুর কি বেড়ালকে কাছে ঘেঁষতে দেবেন না। দুধভাত খাবে। মাছ খাবে, যে কোনো মিষ্টি খাবে। তারপর ওর গলায় তিনটে ঘুঙুর বেঁধে দেবেন।'

ঘুঙুর বেঁধে সাপ আর ইঁদুরকে ও ধরবে কি করে? বেড়ালের গলায় ঘন্টি বাঁধার মত।'

'তা নয় বাবু! ঘুঙুরের শব্দ শুনে অন্য সব নেউল ওকে তাদের কাছে ঘেঁষতে দেবে না। তখন নিরুপায় হয়ে ও এখানেই থাকবে।' নেউলের বাচ্চাকে হাতে নিতে কবিরাজের ভয় করে। বেদে ওর

গলায় ঘণ্টি বেঁধে দেয়। ওর ঘুরেফিরে বেড়াতে যাতে অসুবিধে না হয় তারও ব্যবস্থা করে দেয়। দুধভাত মেখে ওর সামনে ধরা হ'লে ও খেলো না, কট্‌কট্‌ শব্দ করতে লাগলো।

'অ'রে! এ যে কুঁই কুঁই করছে, এখানে থাকবে কি করে?'

'মাকে ছেড়ে এসেছে কিনা, তাই! দুদিন মার জন্যে কাঁদবে।'

'এটা তুমি পেলে কোথায়— '

'ঐ দেখুন; ঐ রাস্তার ধারে, বটগাছটার ওপরে।'

'চলো,' বলে কবিরাজ ওখান থেকে উঠে পড়লেন। বটগাছের কাছে গিয়ে দেখেন দুটো বড় বড় নেউল গাছের ওপর থেকে নীচে ছুটে বেড়াচ্ছে আর পরিত্রাহি রবে ডাকছে।

'বেচারা নিজের বাচ্চাকে খুঁজছে। এ অন্যায় কাজ আমি করতে পারবো না। ওকে নিয়ে এসে এখানে ছেড়ে দাও।'

'না বাবু, না! এদের আবার বাচ্চা হবে। আপনি যদি কিছু মনে না করেন তো একটা কথা বলি— আপনাদের তো আর কোনো সন্তান হবে না। এই বাচ্চাটা বড় হয়ে আপনাদের অনেক সহায় হবে। ওকে তো পুষ্যি নেওয়া হয়েছে। এখন আপনারাই ওর মা-বাপ।'

কবিরাজ একলাই বাড়ী ফিরলেন। তাঁর স্ত্রী অম্মায়ম্মা রুটির সঙ্গে চিনি দিয়ে নেউলেটাকে শান্ত করে ফেলেছেন। দু-তিন দিন বাদে বাদেই ঐ এডন্না বেদে এসে নেউলকে কি করে রাখতে হবে সে বিষয়ে শলাপরামর্শ দিয়ে যেতে লাগলো।

অম্মায়ম্মা রান্নার কাজ সেরে নেউলটার কাছেই থাকতেন। আস্তে আস্তে সে বড় হতে থাকে। পনেরোদিন বাদে ওকে আর বেঁধে রাখার দরকার রইলো না। গলায় দড়ি বেঁধে ওকে যে দিকে

নিয়ে যাওয়া হ'তো, সে দিকেই যেতো। ছোট্ট মুখ, মুখের সামনে হাল্কা গোলাপী আভা। বেগুনি রঙের শরীর। ঘন লোমশ ল্যাজ, ছোট্ট কুতকুতে চোখ। ছোট্ট কান—ঘুরতে ফিরতে ঘুঙুরের আওয়াজ— অম্মায়ম্মা ওর নাম রাখলেন— 'বয়য়ন্না··· বয়য়ন্না।'

একমাস বাদে দড়ি বাঁধারও দরকার রইলো না। নাম ধরে ডাকলেই ছুটে চলে আসতো। খেয়ে দেয়ে দিন দিন বেশ হৃষ্টপুষ্ট হতে লাগলো। আজকাল আর সে বাড়ীতে থাকে না, খাঁচাতেও থাকে না। নদীর ধারে পাথরে একটা ছোট্ট গর্ত তৈরী করে তার মধ্যে থাকে। সকালে কফি খাবার সময় গর্ত থেকে বেরিয়ে আসে। চিলেকোঠার ঘর বেয়ে পাঁচিল দিয়ে ঝনঝন শব্দ করতে করতে নীচে নেমে আসে। ওর ঝনঝন শব্দ শুনে 'বয়য়ন্না আয়' বলে অম্মায়ম্মা ওকে ডাকেন। দেওয়ালের কাছে ওর জন্যে একটা পুরোনো মোড়া পাতা থাকে। এসেই ওতে বসে পড়ে সামনের দুটো পা তুলে দেয়। ইড্‌লিতে যদি চিনি দেওয়া না থাকে তো রাগ দেখায়, চিনি দেওয়ার পাঁচ মিনিটের মধ্যেই সব সাফ করে দেয়। ফেরার পথে চিলেকোঠায় উঠে পুরো বাড়ীর চারদিক ভালো করে পাহারা দিয়ে নিজেই গর্তে গিয়ে ঢোকে।

দিনের বেলা অম্মায়ম্মা নদীর ধারে গিয়ে 'বয়য়ন্না' ব'লে একবার ডাক দিলেই সে ঝন্‌ঝন্ করতে করতে বেরিয়ে আসে। অম্মায়ম্মার হাতে মাছ। যদি মাছটা ওকে দেওয়া না হয় তো দুপা দিয়ে গায়ে চড়ার চেষ্টা করে। অম্মায়ম্মা ওকে কোলে তুলে নিয়ে 'তোর জন্যেই এনেছি' বলে মাছটা মাটিতে ফেলে দেন। অম্মায়ম্মার কোল থেকে লাফিয়ে পড়ে সে তখন মাছটা নিয়ে গর্তের মধ্যে চলে যায়।

এখন বয়য়ন্না বাড়ীর বেশ আদুরে ছেলে। পুরো-পেট খাবার

না পেলে চেঁচামেচি জুড়ে দেয়, অম্মায়ম্মার পায়ে ধরে, কোনো কাজ করতে দেয় না, ক্রমাগত চেঁচাতে থাকে। ওঁর ঘাড়ে চড়ে যেন কানে কিছু বলতে চায়। ছোট্ট ছোট্ট হাত-পা ও মুখ দিয়ে আদুরে মার প্রাণে অদ্ভুত এক পুলক জাগায়।

ওঁদের কাছে বয়ন্না এখন ছ'মাসের ছেলে। কিন্তু তা হলে কি হবে, বাড়ীর মালিক হয়ে বসেছে। যে কাজ বাড়ীর মনিব করতে পারে না, সে কাজ এই জোয়ান ছেলেটি করে দেখায়। এখন ঘরে ইঁদুর নেই, ছুঁচোর পাত্তাই নেই, কোথায় যে পালিয়েছে তা বোঝবার জো নেই, সাপের বাচ্চাও আর দেখা যায় না। নদীর ধারে সাপের খোলসও আর পড়ে থাকে না। এ বছরে ঘরের যেখানে যে জিনিসটা রাখা ছিলো সেটা সেখানেই আছে। তরকারীর চুপড়ি বাক্সের ওপরই রাখা থাকে। গম-টম কখনও মাটিতে, কখনও বা ঝুড়িতে রাখা থাকে। নদীর ঠাণ্ডা হাওয়া উপভোগ করে, জ্যোৎস্নার ছায়ায় নৌকোর মতো ঢেউ-এর খেলা দেখে তাঁরা আনন্দে দিন কাটাতে থাকেন। কখনও কখনও তাঁদের যৌবনের কথা মনে পড়ে যায়। সাপ উঠে আসার আর ভয় নেই।

রাতে 'বয়ন্না আয়' বলে ছোট বাচ্চাকে যেমনভাবে ডাকা হয় তেমনভাবে ডাক দিলে ঝন্‌ঝন্ শব্দে সে এসে হাজির হয়। সে কাছে এসে দুজনের চারদিকে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়, মনে হয় যেন নমস্কার করছে। তারপর মাথা তুলে অম্মায়ম্মার দিকে তাকিয়ে তাঁর পায়ের ওপর গিয়ে বসে। বয়ন্নাকে কোলে তুলে কাঁধে বসালে সে তাঁর গালে চুমু খায়। 'যা, যা, গর্তে ফিরে যা' বললেই সে ঝন্‌ঝন্ করতে করতে আবার ফিরে যায়।

একদিন ভোরবেলায় হাতে ছড়ি নিয়ে ভৈরবিয়য়া কবিরাজ মশায়ের

বাড়ীর সামনে এসে দাঁড়ালো। সে এঁদের দূর সম্পর্কের আত্মীয়। এঁদের আর্থিক অবস্থা ওর চেয়ে ভালো দেখে সে মনে মনে হিংসে করে। সবসময় কোনো না কোনো অজুহাতে ওঁদের সঙ্গে ঝগড়া করবার ফন্দি আঁটে। রেগে গেলে তাকে খুব ভয়ঙ্কর মনে হয়। তার গোঁফ এত খাড়া যে গোঁফের ওপর লেবু রাখতে পারে বলে সে বাজী ধরে। লম্বা লম্বা চুলগুলো পেছন দিকে আঁচড়ে খোলা রেখে দেয়।

দরজার সামনে পাঁচটা মরা মুরগী ফেলে দিয়ে সে চিৎকার করে হাঁক দেয়।

'কি হয়েছে?' কবিরাজ জিজ্ঞেস করেন।

'আমায় কি জিজ্ঞেস করছো, কাল রাতে বয়য়ন্না এই মুর্গীগুলোর ঘাড় মটকে দিয়েছে।'

'কেউ দেখেছে?'

'এর জন্যে সাক্ষী চাই?'

'চোখ রাঙালেই কাজ হবে না। আমার বয়য়ন্নার নামে মিথ্যে মিথ্যে বোলো না। এই রকম অন্যায় কাজ ও করে না। ওকে ডেকে যা খেতে দেওয়া হয় ও তাই খায়। ব্যস!'

'তুমি যদি সাক্ষী চাও তো, ডেকে আনছি।'

পাড়াপড়শীদের ডেকে ভৈরবিয়য়া সাক্ষী দেওয়ালো যে বয়য়ন্নাই মুরগীগুলোকে শেষ করেছে। কবিরাজ চিৎকার করে বললেন, 'সাক্ষীরা মিথ্যে বলছে।'

'এর দাম দশটাকা, দিয়ে দাও।'

'অকারণে আমি দেব না। আমার বয়য়ন্না এমন পাপিষ্ঠ নয় যে গলা টিপে মারবে। আমি একটা পয়সা দেবো না, দেবো না, দেবো না।'

'কেন, বড়লোক বলে মাটিতে পা পড়ছে না? ক্ষতি যা হবার

তা তো আমার হয়েছে, তোমার তো হয় নি। যাক গে, ভাববো এই মুরগীগুলো আমার সইলো না।' বলতে বলতে মুরগীগুলো ও নদীতে ফেলে দিলো। উড়ন্ত শকুনির পাল মাঝপথ থেকে মুরগী-গুলোকে ছোঁ মেরে নিয়ে গেল। তারপর ওগুলো নিয়ে ঝাপটা-ঝাপটি করতে লাগলো।

রেগে টং হয়ে কবিরাজ যখন বাড়ী ফিরলেন তখন গিন্নী বললেন, 'ওটা তো একটা বদমায়েস, ওর সঙ্গে ঝগড়া করছিলে কেন? অর্ধেক দাম দিয়ে মিটিয়ে নিলেই পারতে।'

কবিরাজ আরো রেগে যান। 'হারামজাদা, নির্দোষ বয়য়ন্নার নামে বলছে, আমি কি করে চুপ করে থাকবো? ও যদি ওখানে যেতো তো ঝনঝন করে শব্দ হ'তো না? মুরগীর চেঁচামেচি শোনা· যেতো না? ওদের ঘুম ভাঙতো না?'

ভৈরবিয়য়া বাড়ী ফিরে সবাইকে বললো, 'সব ভণ্ডুল হয়ে গেছে! আমি হলাম মিথ্যেবাদী আর ও হ'লো সত্যবাদী যুধিষ্ঠির। আমাদের নিজেদের ব্যবস্থা নিজেদের করতে হবে। বাকী মুরগীগুলো সাবধানে রাখবে, ওদের ঘরে রাখো, আমরা বাইরে শোবো।'

দশদিন কেটে যায়। ভৈরবিয়য়া কবিরাজের কাছে ওষুধ নিতে আসে। একটা পয়সা না নিয়ে তিনি ওষুধ দেন। মুরগীর কথা একেবারেই ভুলে গেছেন।

শহরে মেয়ের সঙ্গে দেখা করার জন্যে কবিরাজ ও তাঁর স্ত্রী একদিন বেরিয়ে পড়েন। বাড়ীতে তালা দিয়ে একটা বাটীতে দুধ-ভাত রেখে দিয়ে অম্মায়ম্মা বললেন, 'বয়য়ন্না দুপুরে খেয়ে নিস। শহরে যাচ্ছি, বিকেলে ফিরে আসবো। সাবধানে থাকিস।' বলে তাঁরা রওনা হলেন।

অনেক বোঝানো সত্ত্বেও বয়য়ম্মা ওঁদের পিছু পিছু চললো। বাসের অপেক্ষায় তখনও বটগাছের তলায় বসেন নি, পেছন থেকে নেউলের চিৎকার শোনা গেলো। পেছন ফিরে দেখেন— একটা নেউল নয়, বয়য়ম্মা ছাড়া আরো দুটো নেউল। দুটোতে মিলে কান খাড়া করে চিৎকার করছে, আর বয়য়ম্মাকে এগুতে দিচ্ছে না। বয়য়ম্মা ওঁদের দেখে ওঁদের সঙ্গে যাবার জন্যে উতলা হয়ে পড়েছে।

'দেখো, এরাই বয়য়ন্নার মা-বাবা।' কবিরাজ বলেন। 'দুজনেই কেমন আশ্চর্য হয়ে তাকিয়ে আছে আর বয়য়ন্নাকে মারতে যাচ্ছে। বয়য়ন্নাকে ওরা যেন ওদের জাতের বাইরে করে দিয়েছে।'

'ওরা তো ওকে মেরেও ফেলতে পারে। ওদের তাড়িয়ে দাও।' অম্মায়ম্মা বলেন।

'বয়য়ন্না, আয়, এ দিকে আয়!' বলে বড় নেউল দুটোকে যখন তাড়ানো হ'লো, বয়য়ন্না তখন অম্মায়ম্মার পায়ে এসে লুটিয়ে পড়লো। কোলে তুলে নিতে মুখে মুখ ঠেকিয়ে আওয়াজ করতে থাকে।

'তোর মা-বাবা তোকে আসতে দিচ্ছিলো না বলে তুই কাঁদছিস? দেখি, আমার দিকে তাকা! আমিই তোর মা, আর উনি তোর বাপ ···যা বাড়ী চলে যা। তুই বাড়ীতে না থাকলে শত্রুরা আবার ধাওয়া করবে। যা বাবা! যা।'

অম্মায়ম্মা ওকে চুমু খেয়ে খানিকটা এগিয়ে নিয়ে ওকে ছেড়ে দেন। বাস এসে গেছে। কবিরাজ হাঁক দেন অম্মায়ম্মাকে, উনি ফিরে আসেন। বাড়ী ফিরে গিয়ে বয়য়ন্না বাড়ীর চারদিক একবার ঘুরে দেখে নিয়ে নিজের গর্তে গিয়ে ঢোকে।

দশটা বেজে গেছে। এখনও দুধভাত খাওয়ার সময় হয় নি। বয়য়ন্না ঠিক সময়ে বেরিয়ে আসবে— যেন কেউ ঘণ্টা বাজিয়েছে।

'বয়য়ন্না আয়' বাইরে থেকে কেউ ডাক দেয়। বয়য়ন্না বেরিয়ে এসে দেখে। আবার সেই ডাক। ভৈরবিয়য়াই নদীর ধারে দাঁড়িয়ে। আর কেউ কোথাও নেই। নদীর ধারে কাছেও কেউ নেই। 'আয় বয়য়ন্না, আয়, মাছ নে, আয়, আয়।'

ঝনঝন শব্দ হয়। চট্‌চট্‌ শব্দ করে সে ওপর-নীচে ছুটোছুটি করতে থাকে। ভৈরবিয়য়ার হাতে মাছ। ভৈরবিয়য়া একটু এগিয়ে এসে বলে, 'তোর জন্যে মাছ এনেছি··· আয়।' দুপা পিছিয়ে··· আবার একটু এগিয়ে, কোণায় একটু লুকিয়ে··· তারপর বাইরের দিকে তাকিয়ে দেখে,··· লতাগাছের পেছনে লুকিয়ে শেষ পর্যন্ত সে মাছের লোভ আর সামলাতে পারে না।

মাছটা নেবার জন্যে সে ঝনঝন করতে করতে এগিয়ে আসে। হাতে পেরেকওয়ালা ছড়ি নিয়ে গোঁফে তা দিয়ে ভৈরবয়য়া দাঁড়িয়ে আছে। হঠাৎ সে ছড়িটা তুলে নিয়ে বয়য়ন্নাকে মারলো। বয়য়ন্না ব্যথায় চিৎকার করে ওঠে। মুখটা তুলে যেন বলতে চায়, 'মেরো না, মেরো না, আমার কোনো দোষ নেই।' সামনের পা-দুটো তুলে সে যেন হাত জোড় করে বলতে চায়, 'আমি তোমার পায়ে ধরি, আমি নির্দোষ, আমায় মেরো না।' আবার আর এক ঘা। বয়য়ন্না ছটফট করতে থাকে। আর দু-এক ঘা মারতেই বয়য়ন্না মরে গেলো। ভৈরবিয়য়া ওর ল্যাজ ধরে ওঠায়। ওর মুখ দিয়ে গলগল করে রক্ত বেরুচ্ছে। মুখের ভেতর ছোট ছোট দাঁত দেখা যাচ্ছে। সেই দাঁত যা মানুষ মারতে পারে, সাপকে চিবিয়ে চিবিয়ে খায়। সাপকে দেখে লড়াই করতে যাওয়া সিপাহীদের মত এগিয়ে যায় যে পা সেই পা এখন শিথিল। চোখ দুটো খুব ছোট কিন্তু ইঁদুর আর ছুঁচোকে ভয় পাওয়াতে যথেষ্ট। সেই চোখও এখন বন্ধ। তার যে কানে 'বয়য়ন্না

আয়' ডাক শুনতো আর ভাবতো মানুষের স্নেহ, ভালোবাসা, বন্ধুত্বের কথা, ভাবতো সৎ, ভালো মানুষের কল্যাণের কাছে তার মতো অনেক জীব আশ্রয় পাবে, সে কান আজ চিরকালের মত স্তব্ধ হয়ে গেলো।

ভৈরবিয়য়া মহানন্দে তার ল্যাজ ধরে নদী মধ্যে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। কিছু হয় নি ঐ রকম একটা ভাব নিয়ে নদীর ধারে গিয়ে হাত-পা ধুয়ে নেয়।

বয়য়ন্নার লাস নদীর জলে ভেসে যায়। লাসটা পচে না, নদীর কোনো এক কিনারায় গিয়ে আটকে যায়, শকুনির খোরাক হয়। যে চাকরটা সকালে খেতে গরু চরাতে গিয়েছিলো সূর্যাস্তের আগেই সে ফিরে আসে। শহর থেকে অম্মায়ম্মা ও কবিরাজ ফিরেছেন। বয়য়ন্না মিষ্টি খেতে খুব ভালোবাসে, সুঁটকি মাছ বলতে বয়য়ন্না অজ্ঞান—তাই অম্মায়ম্মা এ সব কিনে এনেছেন। বাড়ী ফিরেই বয়য়ন্না দুধ-ভাত খেয়েছে কিনা দেখবার জন্যে অম্মায়ম্মা উঠোনে গেলেন। যেমনকার দুধ-ভাত তেমনি পড়ে আছে।

'দেখো, বয়য়ন্না কি রকম লাটসাহেব হয়েছে। এতো বুঝিয়ে পড়িয়ে গেলাম তবুও খায় নি।'

'পাশে বসিয়ে খাওয়ালেই খাবে।'

থলে থেকে একটা সুঁটকি মাছ বার করে নিয়ে অম্মায়ম্মা নদীর ধারে গেলেন :

'বয়য়ন্না আয়, দেখ, তোর মনের মতন জিনিস এনেছি, আয় বাবা, আয়।'

একবার নয়, বেশ কয়েকবার ডাক দিলেন। সন্ধ্যে হওয়া অবধি বাগানে, উঠোনে, বাড়ীর চারদিকে ঘুরে ঘুরে ডাকতে থাকেন।

'জানি না কোথায় গেছে। বাড়ী এসে ওকে রেখে যাই নি সেটাই

আমার দোষ হয়েছে। রাস্তাতেই ছেড়ে দিয়ে গেছিলাম। হতভাগা বাসটার ঠিক তক্ষুণি না এলে আর চলছিলো না। দেরী তো হয়েই ছিলো, না-হয় আর একটু হ'তো। পথে কোনো কুকুর কিংবা বেড়ালের খপ্পরে পড়ে নি তো? ঐ নেউল দুটো ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েনি তো?'

রাতেও কবিরাজ স্ত্রীর সঙ্গে বটগাছের তলায় বয়য়ন্নার খোঁজে গেলেন। অনেকবার ডাক পাড়লেন। ফেরার পথে অনেকবার ডাকলেন।

বাড়ী ফিরে এলেন। কিন্তু রান্নাঘরের দিকও মাড়ালেন না। জলও স্পর্শ করলেন না। সারারাত জেগে কাটালেন। মাছে মাঝে নদীর ধারে গিয়ে ওকে ডাকতে থাকেন, 'বাবা বয়য়ন্না! তুই ভালোবাসিস এমন সব মিষ্টি এনেছি··· ভালো ভালো মাছ এনেছি। আয় বাবা! আয়··· '

সকাল হ'লো কিন্তু সেই ঝন্‌ঝন্‌ আওয়াজ আর শোনা গেলো না। সকালে স্নান সেরে ঠাকুরের পুজো করে বর চাইলেন, 'আমাদের বয়য়ন্নাকে ফিরিয়ে দাও ঠাকুর।' পাঁচজনকে খুঁজতে পাঠালেন। ঠাকুরের কাছে মানত করলেন বয়য়ন্নাকে খুঁজে পেলে পুজোপাঠ করবেন।

দু'রাত কেটে যায়। বয়য়ন্নার খবর মেলে না। তিনদিনের দিন রাতে ওপর থেকে শব্দ হয়। অম্মাসম্মা অনেক আশা নিয়ে ওঠেন। কিন্তু ঝন্‌ঝন্‌ শব্দ নয়, খট্‌পট্‌ শব্দ। প্রদীপ জ্বেলে দেখেন যে ইঁদুরেরা মনের আনন্দে গম যব আনাজ খাচ্ছে। তাদের তাড়াবার মতো মনের অবস্থা তাঁর ছিলো না।

আজও যখন মাছ কেনেন তখন বয়য়ন্নার জন্যে একটা আলাদা করে

রেখে দেন। কাগজে বয়য়ন্নার ছবি এঁকে গলায় ঘুঙুর পরিয়ে সেটা কেটে নিয়ে খাঁচায় রেখে দেন। হাওয়ায় সেটা দুলে ওঠে, মনে মনে অনেক আশা নিয়ে অম্মায়ম্মা দেখেন। দুধ-ভাত মেখে রেখে দেন। বেড়াল এসে দুধ খেয়ে গেলে ভাবেন বয়য়ন্না এসে খেয়ে গেছে।

এখনও অম্মায়ম্মা মনে আশা নিয়ে আছেন যে কোথাও না কোথাও বয়য়ন্না আছে। কেউ হয়তো তাকে শেকল দিয়ে বেঁধে রেখেছে। বয়য়ন্না দাঁত দিয়ে চিবিয়ে চিবিয়ে শেকল ছিঁড়ে একদিন না একদিন ফিরে আসবে।

একদিন ভোর বেলায় রোদ্দুর ওঠার সময় ভৈরবিয়য়া মুরগীর বাচ্চাগুলোকে ঘর থেকে বার করে দিলো। মার সঙ্গে বাচ্চাগুলোও নদীর ধারে গিয়ে পৌঁছোলো। কবিরাজের বাড়ীর পাশেই রাস্তা। নদীর ধারে তেঁতুল গাছেব তলায় গম শুকোচ্ছিলো, মুরগীর ছানাগুলো তা খুঁটে খেতে আরম্ভ করলো। বয়য়ন্না মরে আপদ বিদায় হয়েছে ভেবে ভৈরবিয়য়া মুরগীর ছানাগুলোকে নিশ্চিন্তে উঠোনে ছেড়ে দিয়েছিলো। অনেক যত্নে পালিত ছানাগুলোকে দেখে সে মনে মনে মহাখুশি। ওর মধ্যে রোজ ডিম পাড়ে এমন মুরগী আছে; মোরগের লড়াইয়ে জিতে আসতে পারে এমন মোরগও আছে। মনে মনে তাই ভেবে ভৈরবিয়য়া আনন্দে আটখানা।

সে ওখানেই বসেছিলো। একটা মস্তবড় নেউল-বয়য়ন্নার চেয়েও বড়, দেখতে বীভৎস, রঙ কালো— হঠাৎ কোথা থেকে এসে একটা ছানা মুখে তুলে নিলো। ভৈরবিয়য়া নেউলটাকে তাড়া করলো। বুঝতে পারলো না সে পাহাড়ের কোথায় গিয়ে লুকোলো। অনেক খুঁজলো, কিন্তু পেলো না। শেষে নিরাশ হয়ে বাকী মুরগীগুলোকে

জড়ো করে নিয়ে বাড়ী ফিরে এসে বৌকে বললো, মুরগীগুলোকে ঘরে বন্ধ করে দিতে।

ভৈরবিয়য়া অসুখে পড়লো। যেদিন সে গোবেচারা বয়য়ন্নাকে ছড়ির বাড়ি মেরেছিলো, বেচারি নেউল মুখ তুলে হাত জোড় করে বার বার করুণ মিনতি করেছিল তাকে, 'আমার কোনো দোষ নেই, আমায় মেরো না, আমায় মেরো না।' প্রাণভয়ে ভীত বয়য়ন্নার কাকুতি আজ তার বার বার মনে হয়। ভৈরবিয়য়া উদাস হয়ে পড়ে। সে আর রোগ থেকে সেরে উঠলো না।

থাঙ্কস ফর দি পি. এম.

ঐ লাইনের সব-কটা বাড়ী ঠিক যেন সিমেণ্টের কেক। বাংলো-গুলোর সামনে যেন ঝুঁকে আছে রাস্তা। বাংলোবাড়ীতে যারা থাকে তাদের কাছে গরীবলোকেরা যাতে পৌঁছোতে না পারে তার নিষেধরেখা ভগবান যেন নিজের হাতে টেনে দিয়েছে। রাস্তার ওপারে সমুদ্রতট জ্যোৎস্নায় যেন স্তূপাকার। সমুদ্রে ছিটকে-পড়া চাঁদের আলোকে মনে হচ্ছে রূপোলী ধোঁয়া। ঐ লাইনের বাংলো-গুলোর ১৩ নম্বর বাড়ীটার পরিধি ছ'একরের মতো।

শীতের রাতে বাড়ীর সামনের নিথর গাছগুলো যেন পাথরের গাছ।

বাড়ীর ফটকের কাছে নতুন গ্যারাজটা সাবানের মতো। পোর্টি-কোতে ডানা-গোটানো তিনটে গাড়ী লোহার পাখীর মতো।

বাড়ীর সমুখে ফুলের বাগানে দুটো পাকদণ্ডীর পথ ঠিক যেন দোহারা মেয়ের মাথায় দুটো বেণী। পাকদণ্ডীর দুপাশে লাল লাল গামলা, ছোট্ট বাচ্চার হাতের চেটোর মতো ; গাছগুলো ফুলের ভারে ঝুঁকে পড়েছে— হয়তো বা সফল আকাঙ্খার প্রতীক।

বাড়ীর সামনে মোজেকের সিঁড়িগুলো ছানার টুকরো।

ওপরের সিঁড়িতে পাতা পাপোষটা স্পঞ্জ কেক।

বারান্দায় রাখা গোলটেবিলটা কোনো বড় ফুলের কোষ। তার চারদিকের চেয়ারগুলো সেই ফুলের পাপড়ি। তার ওপর সাজিয়ে রাখা কালো কাঁচের বোল, খেয়ে খেয়ে ফুলে-যাওয়া একটা ভ্রমরের

মতো। বারান্দার কোণে ঘুমন্ত চাপরাশী, ঠিক যেন বাড়ীর গোলাম।

বারান্দার পেছন দিকের হলের শিলিং-এর মাঝখানে সবুজ রঙের বিজলী বাড়ি; যেন বাঘের চোখ।

মেঝে-পাতা লাল কার্পেট, রক্তের গর্তের মতো।

ঐ বাড়ীটার সামনে একটা কালো রঙের গাড়ী নিঃশব্দে নিঃসাড়ে এসে দাঁড়ালো। গাড়ী থেকে একজন লম্বা যুবক নামলো। পরণে কালো রঙের স্যুট, মাথায় কালো ফেল্ট হ্যাট। জুতোর তলায় রবারের সোল। হাতে কালো ব্যাগ, চোখে মোটা চশমা। 'চলুন', আগন্তুকের পিছু পিছু চলি।

ফটকটা আস্তে আস্তে খুলে যুবক ভেতরে ঢুকলো। টিপে টিপে বারান্দায় উঠে টর্চ জ্বালিয়ে দেখলো। চাপরাশী ঘুমোচ্ছে দেখে বেশ খুশিই হ'লো। কোটের কলারটা উঁচু করে দিয়ে হ্যাটটা চোখ অবধি টেনে নিলো; দরজাটা আস্তে ভেতরের দিকে ঠেলে দিলো।

দরজা খোলা ছিলো।

হলঘরে পেঁাছে সিঁড়ির আলো নিভিয়ে দেয়। বাড়ীর একতলায় কোনো সাড়াশব্দ নেই। হ্যাণ্ডব্যাগটা খুলে একবার দেখে চুপচাপ সিঁড়ি দিয়ে উঠতে থাকে। এভাবে সিঁড়ির বাঁক অবধি পেঁৗছেছে, হঠাৎ ওপর থেকে যে যুবকটি নীচে নামছিলো, সে ওকে জাপটে ধরে চেঁচিয়ে উঠলো, 'মৈথ্যূ! চোর!'

ওর চেঁচামেচি শুনে ওপরের হলঘর থেকে পাঁচজন ছেলে এসে ওকে ঘিরে ধরে।

'স্যরি ব্রাদার্স, দেরী হয়ে গেলো।' কালো স্যুটপরা ছেলেটির অনুনয় শোনা যায়।

'আরে রেগ্‌গী, আগে ব'লো কোন পার্টিতে তুমি সময়মত পৌঁছেচো?' প্রশ্নের সঙ্গে চলপতি উত্তরও দিয়ে দেন।

'তোমার জন্যে বিয়ে আটকে নেই,' সুন্দরম বলেন।

'আচ্ছা, আপনারা কি তা হলে···।' রেগ্‌গী জানতে চান।

'এখন সেকেণ্ড রাউণ্ডে আছি।' ডাঃ জগন্নাথন জবাব দেন।

'তিনটে রাউণ্ড পুরো হলে আমবা বুঝতে পারবো যে এটা জল নয়, ওষুধ।' সুন্দরম ঠাট্টা করেন।

'ঠিক আছে, অন্য কাউকে এতো তাড়াতাড়ি বোলো না' বলে রেগ্‌গী হেসে ফেলেন।

সবাই ওপরের হলঘরে গিয়ে হাজির। হলঘরে পর্দার পেছনে লুকোনো চাঁদের মতো কনসীলড্‌ লাইটিং।

হলঘরের মাঝখানে মেহগনী ডাইনিং টেবিল। কালো কালো পাহাড়ী ঝিলের মতো।

টেবিলে সাজানো প্লেটগুলো ঠিক সদ্য ফোটা ফুল। প্লেটের কাছে রাখা বোতলগুলো দামী 'ওষুধের বোতলে'র মতো। ওর মধ্যে একটা বোতল যেন রক্তে ভরা।

হল ঘরের দেয়ালে একটা তৈলচিত্র; উন্নত বক্ষ এক মেয়ে। মেয়েটির ব্লাউজের নীচের বোতাম খোলা। ওপরের বোতাম খুলছে না লাগাচ্ছে বলা মুশকিল।

হৈ-হল্লা আর সোরগোলের মধ্যে পার্টি বেশ ভালোই জমেছে। পার্টিতে সবসমেত সাতজন লোক। তার মধ্যে পাঁচজন ডাক্তার—মৈথ্‌যূ (মধু), রেগ্‌গী (রঘু), সুন্দরম, জগন্নাথন আর জগন্মোহন। এ ছাড়া উপস্থিত আছেন কনট্রাক্‌টার চলপতি আর উকিল ভেঙ্কটরাও।

বহুলোক বহু কারণে ডাক্তারদের বন্ধুত্ব কামনা করে। কেউ স্ট্যাটাসের জন্য, কিছুলোক বিনা খরচায় চিকিৎসার প্রয়োজনে, আর কিছুলোক ডাক্তারদের কাছ থেকে ওষুধের স্যাম্পল নিতে।

ভেঙ্কটরাওর বন্ধুত্ব ওষুধের জন্যে।

চলপতি নার্সদের জন্যে।

চলপতির 'ওষুধ'-এর প্রতি মোহ নেই। কিন্তু কোনো পার্টি সে মিস করে না। প্রথম রাউণ্ডে তার খিদে মিটে যায়। দ্বিতীয় রাউণ্ডে তার কামনা-বাসনা শেষ হয়ে যায়। তৃতীয় রাউণ্ডে ঘুম পেতে থাকে। এখন সে তৃতীয় রাউণ্ডে। তাই হাই তুলতে তুলতে জিজ্ঞেস করেন, 'আচ্ছা, আজকের এই পার্টিটা কিসের জন্যে।'

'এ জেনে তোমার কি হবে? মৈথ্যূ দিচ্ছে আর আমরা খাচ্ছি। কিসের জন্যে এই পার্টি, তাতে তোমার কি?' একজন চটে গিয়ে বলেন।

'মেমসাহেবের মনটা কি একটু গলেছে?' চলপতি জিজ্ঞেস করেন।

'এ ব্যাপারে তোমার সন্দেহ হচ্ছে না হিংসে?'

'মুফোতে হলে ছুটোই, ঠিক তো? তাই ছুটোই।'

'নাকে ঘাস খাও যে জিজ্ঞেস করছো?'

'বুঝলে, আর এ রকম বেতালা প্রশ্ন কোরো না। আসলে কেন যে তুমি পার্টিতে আসো, বুঝি না।'

'তুমি নিজে মদ খাও না, আমাদেরও খেতে দাও না। হংস মাঝে বক যথা।'

'আরে চলপতি! পেছনের ঘরে বিছানা পাতা আছে।'

'ওতে ধোপদুরস্ত চাদরও পাতা।'

'দুটো মাথার বালিশ আর একটা পাশ বালিশও।'

'গিয়ে শুয়ে পড়ো।'

'আমি জানতে চাই এই পার্টি কি উপলক্ষ্যে, আর তোমরা বলছ শুয়ে পড়তে।'

'পার্টি তো··· সে যে কারণেই হোক, তাতে তোমার কি?' মৈথ্‌য়ু বলেন।

'মৈথ্‌য়ু কালকে অশ্বমেধ যজ্ঞ করেছে। বোধহয় সেই উপলক্ষ্যে।

'তাতে তোমাকেই ঘোড়া হতে হবে। সকালে খুব দৌড়তে হবে। তাই তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়ো।'

'কাকে দৌড় লাগাতে হবে?'

'বেটা তোমাকেই। যা, শুয়ে পড় না।'

'আগে বল পার্টি কেন দেওয়া হচ্ছে, তারপর শুতে যাবো।' চলপতি বেঁকে বসেন।

'পার্টির কথা জিজ্ঞেস করছো?··· ' সিগারেট ধরাতে ধরাতে মৈথ্‌য়ু বলেন, 'একটা মজা হয়েছে।'

'মজা?'

'কবে?'

'গতকাল রাতে··· '

গতকালের জ্যোৎস্নার রাত যেন রূপোর পাউডার মেখেছিলো।

ভেতর থেকে শরীরটা যাদের গরম হয়ে উঠেছিলো তাদের বাইরে বেশ ঠাণ্ডা লাগছিলো।

থিয়েটারের দ্বিতায় শো আরম্ভ হয়ে গেছে। পথঘাটও নির্জন হয়ে আসছে।'

এমার্জেন্সী ওয়ার্ড থেকে দেখলে দূরে হাসপাতালটা যেন শীষমহল। কিন্তু এমার্জেন্সী ওয়ার্ড একেবারে নীরব ও নিষ্প্রাণ। সিংহাচলম খুব টেনে নেশার ঘোরে বারান্দায় ঘুমোচ্ছে।

ওয়ার্ডের দেওয়ালে টাঙানো ঘড়ি লোহার থাবা দিয়ে সময়ের তাল দিচ্ছে।

ঘরের মধ্যিখানে টেবিল। তার ওপর খদ্দরের কাপড় বিছানো। কাপড়ের ওপর একটা বই। সে বইটায় দু'টো চোখ।

বইটা 'বিদ্বানদের জন্যে বিশেষভাবে পুতুচ্চেরীতে প্রকাশিত।'

চোখ দু'টো নার্স সরোজার। বই পড়তে সরোজার আর ভালো লাগছে না। সেই সময় ওর মনে যে ইচ্ছার ঢেউ জাগছিলো, তা যদি লেখা যায় তো কোনো ভদ্রপুরুষ পড়বে না। কিন্তু ইচ্ছেটা এমন জোরালো যে ষাট বছরের কোনো লোক যদি বইটা পড়তে পারতো তবে তার মনেও সেই ইচ্ছার ঢেউ এসে লাগতো।

তার হাড়গুলোয় অব্যক্ত বেদনার সঞ্চার হয়। মনের অসহ্য ভারটা সামনের দেওয়ালটায় গিয়ে যেন মাথা ঠোকে।

সামনের টেবিলটা ভেঙে ফেলতে প্রাণ চায়।

অন্যমনস্ক হবার জন্যে ফ্ল্যাস্ক থেকে কফি বার করে খায়।

কফি খাওয়ার পর ওর মনে হয় ও যেন আগুনগোলা জল খেয়েছে। নিঃশ্বাস ফেলার সঙ্গে সঙ্গে যেন আগুনের স্ফুলিঙ্গ বেরুচ্ছে। এই উত্তাপের শান্তির জন্যে···

কাপটা মেঝেয় ফেলে দিতে হবে।

টেবিলটা দেওয়ালের গায়ে ভিড়িয়ে দেবে?

তা না হ'লে ঘুমের ওষুধ···

কদিন চলবে এই ঘুমের ওষুধে?

বিনা ওষুধের বড়ির রাত, বিনা ওষুধের রাত, বিনা রুগীর রাত —সেই রাতের ডাক্তার যে মন-ভোলানোর জন্যে ওর সঙ্গে খুঁনসুটি করতো সেই ডাক্তারবিহীন রাত, যে রাত কাটতে চায় না—

এ মাসে আর আসবে না।

বাপরে! একমাস! একটা পুরো মাস!

তিরিশটা রাত!!

সেই রাতে —

কমলা চেয়ারে বসে। সমুখের আর্শিতে নিজের চেহারা দেখছে, যেন কোনো নতুন চেহারা। চমকে ওঠে।

আর্শির সামনে কমলা কনের মতো সেজে বসে।

সবুজ রঙের ঘর। সবুজ রঙের আলোয় ঘরটা ঠিক যেন শেওলা-জমা কুমীর-ভরা পুকুর।

ঘরের সব দরজা-জানলা বন্ধ। একটু গুমোট।

গরম হাওয়ায় কমলার শরীর গরম হয়ে উঠলো, জ্বর জ্বর লাগছে। কমলার মুখ দেখলেই মনে হয় ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ করছে আর সেটা অন্যায় কাজ। বেশ ভীত ও ত্রস্ত। ভয়েতে টানা টানা চোখ দুটো বড় হয়ে স্বাভাবিক সৌন্দর্য হারিয়ে ফেলেছে। রেশমী শাড়ীর জরির ফুলে আর গয়নার ওপরে আলো ঠিকরে পড়ছে, সৌন্দর্য যেন আরো বিকশিত হয়ে উঠছে।

কাঁধের নাইলনের চুন্নী যেন রূপোর পরী।

পুরো বেণীটা গোলাপী ফুলে ভরা। অদ্ভুত একটা গাছের মতো দেখাচ্ছে।

গয়নার ওজন ছ-সাত সের। দেখলে মনে হয় ও এই গয়নাকে ঘৃণা করে।

জড়োয়ার গহনার পাথরগুলোকে নানান রঙের কীটপতঙ্গ মনে হয়।

সরু কোমর। কোমরবন্ধ ঠিক যেন একটা 'সোনার সাপ'।

রেশমী শাড়ীর ফুল ঠিক যেন তার চারিদিকে ছড়ানো বিষবৃক্ষের জরির ফুল।

কমলা আশিতে আবার নিজের চেহারা দেখলো। ভয়েতে ঠোঁট ছ'টো কাঁপছে।

ওর সাজগোজ আর গয়নাগাটি দেখলে মনে হয় ও কোনো বড়-লোকের বাড়ীর মেয়ে, পালাবার জন্যে তৈরী হয়ে বসে আসে।

বাইরে ব্যাণ্ডের বাজনা যেন বলছে এক কনে বউকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর করে বিয়ের পিঁড়িতে বসানো হচ্ছে।

একজন চুপচাপ ভেতরে ঢুকে দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ করে দিলো। ছেলেটির বয়স ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ। তিরিশ বছর ধরে নিয়মিত ব্যায়ামে তার সুগঠিত দেহ বেশ বলিষ্ঠ। চোখের জ্রগুলো মোটা পতঙ্গের মতো। পরিপাটি সাজানো মাথার চুল। খুলে ফেললে ছ-তিন হাত লম্বা হয়ে যাবে। সরু কাঁচির মতো একজোড়া সরু গোঁফ। সাপের গায়ের মতো টেরেলিনের সার্ট। কাঁধে জড়ানো স্কার্ফটা যেন সাপের গায়ের ধাবি।

ঝকঝকে পালিস-করা জুতোয় ঝুঁকলে নিজেরই সৌন্দর্য যেন দেখতে পাবে।

ডান গালে একটা ক্রশের চিহ্ন; কোথাও গুণ্ডাদের সঙ্গে লড়াই করতে গিয়ে হয়ত কেটে গিয়েছিল। সার্টের ডান হাতের আস্তিনটা গোটানো; হাতের মাংসপেশী দেখাতেই বোধহয়।

ডান হাতের কনুইতে একটা দশইঞ্চির চওড়া চামড়ার পটি। পটিটায় মাঝে মাঝে পেতলের কাঁটা লাগানো। পটিটা দিয়ে কাউকে পেটালে তিন সের রক্ত বেরুবে।

মুখের বিড়িটা এখনো শেষ হয় নি। লোকটাকে দেখলে মনে হয় একটা ভিলেন হিরোইনকে বিয়ে করার জন্যে যেন দাঁড়িয়ে আছে।

ওকে দেখে কমলা উঠে পালিয়ে যায়।

বোধহয় তার পথরোধ করার জন্যে লোকটা দু'হাত বাড়িয়ে দেয়।

তিন পা এগুতেই কমলা তার বাহুর মধ্যে ধরা পড়লো।

আদর করে তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'এখন কেমন আছো?'

'ভয় করছে ...'

'এখন ভয় করলে কি হবে?'

আস্তে আস্তে দরজার কড়া নাড়ার শব্দ হ'লো। কমলা চেয়ারে গিয়ে বসলো। চুল ঠিক করার অছিলা করতে লাগলো। স্কার্ফটা ঠিক করতে করতে যুবকটি দরজা খুললো।

দু'জন যুবক হাতে ফুলের মালা নিয়ে ঘরে ঢুকলো। ওর মধ্যে যে ছোটো সে 'ভিলেনের' গলায় মালা পরিয়ে দিলো। 'কমলাদেবী, বুঝতে পারছি না আপনাকে কি ভাবে অভিনন্দন জানাবো.' বলে দ্বিতীয় জন কমলার হাতে মালাটা দিলো।

মালাটা হাতে নিতে নিতে কমলা বললো, 'আমার ভয় করছে।'

'প্রথম রাত সবারই এইরকম লাগে, আপনার ভয় পাবার কিছু নেই,' ছোটজন কটাক্ষ করে বলে।

বড় যুবকটি ভিলেনকে দেখে বললো, 'সাবাস! আপনাদের

তু'জনের অদ্ভুত অভিনয়-কৌশল। পুরো অন্ধ্রপ্রদেশে আপনারা বিজয়-পতাকা ওড়াবেন। স্বামী-স্ত্রী হয়েও আপনারা ভিলেন ও হিরোইনের রোলে নামেন, সেটা দর্শকের কাছে বিশেষ আকর্ষণীয় ব্যাপার।'

'কেউ যদি বলে যে আগে আপনার অভিনয়ের অভিজ্ঞতা নেই, তা হলে কেউ বিশ্বাস করবে না।' ছোটজন বললো।

'দ্বিতীয় দৃশ্য সুরু হ'ব হ'ব। এই দৃশ্য আপনাকে নিয়ে শুরু হবে। আপনি তৈরী হয়ে নিন।' বড যুবকটি কমলাকে বললো।

কমলা কোনো উত্তর দেবার আগেই বাইরে হৈ-হট্টগোল সুরু হয়ে গেলো। লোকেরা চিৎকার করতে থাকে; 'হলে আগুন লেগে গেছে।'

'হল' শুনতেই 'ফুলমালা'র ডাইরেক্টার ও তার এ্যাসিটেণ্ট ঘর ছেড়ে বেড়িয়ে গেলেন। ঘরের দরজা হাওয়ার দাপটে বন্ধ হয়ে গেলো।

কমলা ভয় পেয়ে তাড়াতাড়ি দরজাটা খোলার চেষ্টা করলো, কিন্তু দরজা খুললো না। 'বাপরে, দরজা খুলছে না।' কমলা কাঁপা গলায় বলে।

'আমি খুলে দিচ্ছি।' কিন্তু যুবকের চেষ্টায়ও দরজাটা খুললো না।

বাইরে সাপের চেরা জিহ্বার মতো আগুনের হলকা চারি দিকে ছড়িয়ে পড়েছে। লোকেদের ক্রন্দনের সঙ্গে কাঠ পোড়ার শব্দ সমানে তাল দিয়ে চলেছে।

'বাবু, দরজা খুলুন,' বলে অতি কাতর কণ্ঠে কমলা দরজার ওপর করাঘাত করে। তার আঙুল ফেটে দরজার ওপর রক্ত পড়ছে।

সবুজ রঙের আলোতে সেই রক্ত কাজলটানা চোখের জলের মতো দেখাচ্ছে।

'তুমি ভয় পেয়ো না কমলা,' বলে যুবকটি তাকে সাহস জোগায়।

'কি কথা বলছো? ভয় পাবো না? হায়, ঈশ্বর! আমাদের কি করা উচিত। না হলে আমরা মরে যাবো, পুড়ে মরে যাবো··· ঐ জানালাটা খুলে দাও··· আমরা মরে গেলে বিট্টু···' বলতে বলতে হঠাৎ কমলা একদম থেমে যায়, যেন সে কোনো পিশাচকে দেখেছে।

ওদিকে ও কথা বলছিলো আর এ দিকে এ জানালা খুলে দিয়ে, 'ভগবান' বলে চোখ বন্ধ করে নেয়।

জানলা খুলতেই আগুনের হল্কা মেঘের মতো ঘরের মধ্যে ছড়িয়ে পড়লো। আগুনের হল্কায় তার উইগ, স্কার্ফ, কৃত্রিম ভ্রূ আর সার্টে আগুন ধরে গেলো।

'কমলা!' বলে সে কমলার দিকে ফিরে দাঁড়ায়।

ওর মুখে ঘামের ফোঁটা, আগুনের লাল আলোতে রক্তের ফোঁটা।

বাঁচার আশা ছেড়ে দিয়ে বীভৎস এক চিৎকার করে ও ছুট দিলো।

'আরে, দাঁড়াও!' বলে কমলাও তার পেছনে ছুট দিলো। তারা দু'জনে মিলে বিষাক্ত অন্ধকারের মধ্যে ছুটে যায়; কিন্তু সহস্র জিহ্বা নিয়ে আগুন তাদের পিছু নেয়।

কাঁকরের মতো ছুরি, পায়ে ফোটার কাঁটা— বিষাক্ত অন্ধকার— অগ্নিবর্ষণ— জ্যান্ত পুড়ে মরছে মানুষ আর পেছনে জীবন আর মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে থাকা ঐ স্ত্রী— সে ক্লান্ত হয়ে পড়ে, আগে আর ছুটতে পারে না ওখানেই থেমে যায়।

কমলার মনে হয় সে কোনো দুঃস্বপ্ন দেখছে— যেন সে মরে গেছে— ওকে পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে— আর মৃত্যুর পর ও যেন আবার স্বপ্ন দেখছে!

এতো স্বপ্ন নয়, পা কেটে যে রক্ত পড়ছে, এটা তো মিথ্যে নয়।

সব-কিছু সত্যি! একেবারে বাস্তব সত্যি! চোখ বন্ধ করে পড়েছিলো। মেঘের 'সর সর' শব্দ শুনে আবার ছুট দিলো।

পায়ের তলায় কিছু মোলায়েম জিনিস— অন্ধকারে গাছের আড়ালে ঐ সবুজ চোখ কার?

জঙ্গলের অন্ধকারে— বিযাক্ত সাপের গহ্বরে ঐ পাগল উন্মত্ত মেয়ে ক্রমাগত তাদের পেছনে ধাওয়া করেছে।

কমলা নিঃশ্বাস নিতে পারে না। 'আমাকে পুড়িয়ে দাও। আমি আর ছুটতে পারছি না।' বলে সে একটা চওড়া পাথরের ওপর পড়ে যায়।

ঘুমের ঘোরে ছুটতে ছুটতে কমলা খাটের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে বিট্টুর ওপর পড়ে। উঠে চোখ খুলে বাচ্চার জায়গায় একটা প্রেতাকার দেখে। বাচ্চার শ্বাস বন্ধ হয়ে গেছে। চোখ দুটো ক্লান্ত, দৃষ্টি ক্ষীণ।

'বিট্টু, আমার ধন! কি হয়েছে বাবা? কথা বলছো না কেন?' — তার কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলে।

বিট্টু 'মা' বলে ডাকার চেষ্টা করলো। কিন্তু ঠোঁট দু'টো নড়ে বন্ধ হ'য়ে গেলো। কোনো কথা বলতে পারলো না। 'মা'— এতো ক্ষীণ স্বর, ও শুনতেই পেলো না। শোনার জন্যে তার শিরা-উপশিরা উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠে।

সেদিন ও তার আগের দিন বিট্টু একটু অসুস্থ ছিলো। কিন্তু এরই মধ্যে এমন অন্ধকার রাতে তাকে কোন কালসাপে কামড়ালো? কোন মহামারী রোগ তাকে গ্রাস করলো।

'কি হয়েছে বিট্টু? বল না বাবা? কেমন আছিস! — একবার

বল, তুই ভালো আছিস, একবার বল, — বল বাবা ! আমার প্রাণ। একবার বল— সারা জীবন আমি এখানেই থাকবো— আর তোকে ছেড়ে কখনও কোথায়ও যাবো না। তুই পায়ে ধরে বলেছিলি আজ আমার কাছেই থেকো— তবু আমি চলে গেলাম— ভুল হয়েছে বাবা ! ভুল হয়েছে আমার।···

'কিন্তু··· তুই জানিস না বাবা, কেন আমি গেছিলাম— তুই তো ছোটো— তুই জানিস না— আমি নিজের জন্যে যাই নি।— আমি তো কবেই মরে গেছি।

'আমি তোর জন্যেই গেছিলাম, নিরুপায় হয়েই গেছিলাম— আর যাবো না। বাবা— সবসময় তোর কাছেই থাকবো— একবার বল, আমি ঠিক আছি— এইভাবে তোর হাত ধরে থাকবো— এইভাবেই মরবো— একবার বল, বাবা !' পাগলের মতো কমলা চিৎকার করতে থাকে।

কিন্তু বিট্টুর চোখে তখনও সেই আতঙ্ক।

এখন সে রিক্সা করে যাচ্ছে— কোলে কোনো রকম শ্বাস-প্রশ্বাস নিচ্ছে যে বাচ্চা সে বাইরে বেরিয়ে আসা নাড়ীভুড়ির মতো শিথিল হয়ে পড়ে আছে।

'প্রভু ! এই যাত্রা কি ওদিকেই ?' রিক্সার চেনটা ছিঁড়ে যাওয়ার মতো শব্দ হ'লো।

'গতবছর ঠিক এই ভাবেই ওকে···' রিক্সাওয়ালার কালো পিঠে জ্যোৎস্না ঠিকরে পড়ে।

পায়রা বাসায় যেমন জড়সড় মেরে বসে থাকে ও রিক্সায় ঠিক সেই রকম গুটিসুটি মেরে বসেছিলো।

'তারপর ওখানে ওষুধের জন্যে··· '

বাসার কাছে ছানাদের গিলতে আসা পেঁচাকে দেখলে যে ভাবে পায়রা ভয় পায় ঠিক সেই রকম সে রিক্সার মধ্যে বসে থরথর করে কাঁপছিলো।

'প্রভু! আগুনের নদীতে আমি আর সাঁতরাতে পারছি না। ছুরির ফলার মতো প্রস্তরে আমি আর চড়তে পারছি না। যদি চাও আমাকে মেরে ফেলো, মেরে টুকরো টুকরো করে ফেলো, এক এক করে সব শিরা-উপশিরা ছিঁড়ে ফেলো, যদি ইচ্ছে করে তো আস্তে আস্তে আমাকে গ্রাস করো, আমাকে মেরে ফেলো। আমার কাছে এই জীবন চিরন্তন মৃত্যু আর মৃত্যুই আমার সুখ, আমার আশীর্বাদ।' কমলা মৃত্যু কামনা করে।

কিন্তু মৃত্যু তার কাতরানি শুনতে পায় না।

রাত পৌনে এগারোটা—

নার্স সরোজা ঘুমোচ্ছে।

সঙ্গে সিংহাচলমও শুয়ে ঘুমোচ্ছে।

'মা! বাবু!'

মার কিংবা বাবুর, কারুরই ঘুম ভাঙলো না।

'মা!'

মা উঠলেন না।

'দাদাবাবু!'

মা এক চোখ খুললেন।

'মা!'

দাদাবাবুও আর এক চোখ খুললেন।

'দাদাবাবু! মা!'

দাদাবাবু ও মা দু'জনেই চোখ বন্ধ করে নিলেন।

ঘুম থেকে উঠতে লাগলো পাঁচ মিনিট। কমলার নিজের কথা বোঝাতে লাগলো আরো পাঁচ মিনিট।

'কবে থেকে হয়েছে?'

'বেশিদিন হয় নি। কালই যা একটু দুর্বল ছিলো। আজ গা-টা একটু গরম মনে হচ্ছিলো। রোজকার মতো রাত্রে শুয়ে পড়ে। তারপরেই এই যাদুর অসুখ।'

নার্স কমলাকে খুব ভালোভাবে দেখতে লাগলো, ওর শরীরে এক রত্তি মাংসও নেই। মুখ দেখলে মনে হয় পাগল হ'লো বলে। মুখ দেখলে মনে হয় ভগবান তাকে কাঁদবার জন্যে গড়েছেন, হাসবার জন্যে নয়।

ওকে কোনো ভূমিকায় অভিনয় করতে হয় তো দাসীর ভূমিকাই ওর উপযুক্ত।

ওর মুখটা যেন একটা পরিণত দুঃস্বপ্ন।

'অন্য কোথাও নিয়ে গেলে ভালো করতে।' আর কোথায় নিয়ে যেতো-শ্মশান ছাড়া। কমলা কোনো কথা না বলে দাঁড়িয়ে থাকে।

'... সিংহাচলম!...' ফিল্মের হিরোইনের মতো নার্সের ডাক। সিংহাচলমের ঘুম ভাঙলো না। নার্স এবার ভিলেনের মতো ডাক দেন, তবুও সে ওঠে না। তখন বাঘিনীর মতো গর্জে ওঠেন:

'ডিউটি ডক্টরকে ডাকো।'

সিংহাচলম চলে যায়।

'মা! একটু তাড়াতাড়ি...'

'আমি কি করতে পারি? আমি তো নার্স। ডাক্তার... ডাক্তারের আসা দরকার।' ডাক্তার এলো না।

'ডিউটি রুমে নেই,' সিংহাচলম ফিরে আসে।

'কেন নেই ? এই নাও, এই মেমোটা নিয়ে যাও।'

মেমো দিয়ে ডিউটি রুমে ডাক্তার পয়দা করা গেলো না।

'ফিল্ম দেখতে গেছে।' সিংহাচলম জবাব দেয়।

'দিদি, বাচ্চার বড্ড কষ্ট হচ্ছে।'

'ও রকম হয়েই থাকে— ধৈর্য ধরো— নিয়ে যাও, 'সিনেমা হলে এ মেমো নিয়ে যাও— তুমি নয়— সিংহাচলম তুমি।'

ডাক্তার সিনেমা দেখতে গিয়েছিলো। ওখানে ফার্স্ট ইয়ারের একটি পুরোনো চিড়িয়া দেখতে পান। ডাক্তারকে দেখে 'চিড়িয়া' তার কাঁধে বসলো। চিড়িয়াকে নিয়ে ডাক্তার ছবির মাঝখানেই উঠে চলে যান। একথা শুধু তারাই জানে।

দেড় ঘণ্টা পরে সিংহাচলম ফিরে এলো। বললো, 'সিনেমা হলেও নেই, বাড়ীতেও নেই।'

'ডিউটি ডাক্তার কে ?'

'মৈথ্যূবাবু।'

'সব জায়গায় খোঁজ করো।'

'লাইব্রেরীতে থাকলেও ডেকে নিয়ে আসবে।'

লাইব্রেরী থেকে মৈথ্যূবাবু এলেন না। একটা নাগাদ রেগ্‌গীবাবু এলেন। খাদি প্যাণ্ট আর খাদি শার্ট পরা। চেহারায় সৌজন্য, দয়া ও প্রতিভার দীপ্তি। বয়সের চেয়ে পাঁচ বছর বড়ই দেখায়। নাকের ছ'দিকে কালো দাগটা গভীর হয়ে গেছে।

বড় বড় চোখ, টিকোলো নাক, গায়ের রংও বেশ ফর্সা, দোহারা গঠন, কালো চুল। ওকে সুন্দরই ধরা যায়। মুখাবয়বে একটা গরিমা আছে।

চোখে বিদেশী চশমা।

বেশ দামী জুতোও।

মুখে 'ভালো লোক'এর লেবেল আঁটা। যদি অফিসারের চেয়ারে বসে তবে সোজা পৌঁছোতে কারুরই কোনো দ্বিধা হবে না। যত বড় গাড়ীতেই বসুক, কটা বেজেছে জিজ্ঞেস করতে কারুরই সঙ্কোচ হবে না। রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকলে পয়সা চাইতে ভিখারীরা ইতস্ততঃ করবে না। কোনো স্ত্রীলোক দেখলে ভাববে, ইস্, আমারও যদি এইরকম একটা ভাই থাকতো

'এ কখনও মিথ্যে বলবে না। কখনও কোনো অন্যায় কাজ করবে না। কারুর যদি তার সাহায্যের দরকার হয় তো মানা করবে না।' চেহারা দেখলে এ সব কথা মনে হয়।

ওয়ার্ডে পৌঁছেই দেখলো কমলা বেঞ্চিতে বসে।

স্বামীর মৃতদেহ আর দেখতে পাচ্ছে না এমন নববধূর মতন সে হাতের মধ্যে মুখটা ঢেকে বসেছিলো।

'তুমি মরলে তোমার স্ত্রীরও এই অবস্থা হবে,' কমলার চেহারা এইরকম একটা ভীতি জাগায় মনে।

বয়স সম্ভবতঃ তিরিশ। দেখলে কিন্তু মনে হয় একশো বছর। ভাড়া করা যে শাড়ীটা পরেছিলো সেটা এখনও ময়লা হয় নি।

ডাক্তারকে দেখে কমলা মাথা নিচু করলো। যেন কোনো অন্যায় করেছে। লজ্জার চেয়ে বেশি ভয় পেয়েছে এই রকমভাবে দাঁড়িয়ে রইলো।

ছোটবেলার পরিচিত কোনো বড়লোকের বাড়ীতে গিয়ে নিজের ভুল বুঝতে পেরে অনুশোচনায় ভেঙে পড়ার একটা ভাব নিয়ে দাঁড়িয়ে

আছে। বেঞ্চে শোয়ানো কাপড়ের তলায় বাচ্চাটাকে দেখতে লাগছে ঠিক যেন জিপ ব্যাগের মতো।

ছোট জিপ ব্যাগের পাশে কমলাকে বড় জিপ ব্যাগের মতো দেখাচ্ছে।

রোগীর পাল্‌স দেখে ডাঃ রেগ্‌গী রেগে যান। নার্স সরোজাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'এখনও অপারেশন থিয়েটার রেডি করা হয় নি কেন? সব লোক সমান একথা তোমরা কবে বুঝবে? যদি কিছু অঘটন ঘটে তখন কে দায়ী হবে?'

সঙ্গে সঙ্গে ও রোগীকে নিয়ে অপারেশন থিয়েটারের পাশের ঘরটায় চলে গেলো।

থেমে যাওয়া যুদ্ধ আবার যেন সুরু ;—

থিয়েটার ঘরটা অমনি জমজমাট হয়ে উঠলো। থিয়েটারের আলোগুলো বৃষ্টিতে ধোয়া তারার মতো চকচক করছে।

কমলার চোখে আশা নিরাশার দোলা যেন লুকোচুরি খেলছে।

গত বছর—এই হাসপাতালে ঠিক এই সময়— ঠিক এই ধরনের ডাক্তার···

বড়লোকের বাড়ীতে কাঁদা শোভনীয় ব্যাপার নয়, এই কথাটা জানে ব'লেই ভদ্রতার খাতিরে ও চোখের জল চোখেই চেপে রাখে। নাকের ওপর চাপা লাল শাড়ীর আঁচল, নাক থেকে ঝরে পড়া রক্তকে যেন চেপে রাখার রুমাল।

দশ মিনিট পার হয়ে গেলো।

কাঁধে স্টেথোসকোপ, হাতে নোটবই আর চোখে দুশ্চিন্তা নিয়ে রেগ্‌গী ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন।

কমলা এক পা এগিয়ে, 'বাবু, কেমন' বলে থেমে যায়। 'আছে' কথাটা আর ওর মুখ দিয়ে বেরোয় না।

'চিন্তা করার কিছু নেই,' রেগ্গী বলেন। রেগ্গীর মনে হয় ভদ্রমহিলা তাঁর চিন্তার কারণটা ভুল বুঝেছে···। কোনো খারাপ খবর শোনবার আশঙ্কায় কমলা ছটফট করতে থাকে।

'বোন! এই ওষুধগুলো সামনের ঐ দোকানে···' মরে যাওয়া বাচ্চার জন্যে ডোমের দক্ষিণা চাওয়া হরিশ্চন্দ্রের মতো কঠোর নয়।

'বাবু!··· ' আমাকে জ্যান্ত পুড়িয়ে ফেললেও আমার কাছে একটা পয়সা মিলবে না— এটাই যেন কমলা একটি কথার মধ্যেই বলতে চেয়েছিলো।

'ঠিক আছে বোন। আমারই ভুল, আপনাকে জিজ্ঞেস করা উচিত হয় নি। ভাবলাম, স্টক থেকে আনাতে গেলে দেরী হবে।' ডাক্তার কথাটা এমনভাবে বললেন যেন ভগবানের সামনে দাঁড়িয়ে শপথ করছেন যে এমন অন্যায় কাজ জীবনে আর করবেন না।

ডাক্তার যে ওষুধগুলোর কথা বললেন সিংহাচলম সেগুলো আনতে ছুটলো।

রেগ্গী কমলার চোখে চোখ রেখে দেখবার চেষ্টা করেন, খারাপ কিছু দেখলেন না।

'বোন। যদি আপনি কিছু মনে না করেন···'

'বলুন বাবু,' কমলা তাকিয়ে থাকে।

'আচ্ছা··· এই··· এই ছেলেটির বাবা···' আর কিছু উনি বলতে পারেন না।

'··· গেছে।' কমলার মনে আপসোস হয়, মরে গেছে কেন বললো না।

'আচ্ছা, আই এ্যাম স্যরি! এক্সট্রিমলি স্যরি।' বলেই ভাবলেন

মেয়েটি বোধহয় ইংরিজি জানে না। এ কথাটা তাঁর স্মরণ থাকা উচিত ছিলো।

'তা হলে তুমি··· তোমার··· '

'রেকর্ড, নাচ··· '

এখন কমলা পেভমেণ্টের ফুল।

পুরুষদের মন-ভোলানোর ন্যাকড়ার পুতুল!

এবার রেগ্ গী 'আই এ্যাম স্যরি' বললেন না। কিন্তু ভাবেন এই প্রশ্নটা তাঁর করা উচিত হয় নি।

নিজের পেশার কথা বলে ফেলে কমলার মনটা অনেক হাল্কা হয়ে যায়। ভাবে, ওর নিরুপায় অবস্থার কথা ওর ভাইকে যেন বলেছে।

সময় যেন তাড়াতাড়ি কেটে যায়।

সিংহাচলম ওষুধ নিয়ে আসে।

'প্রভু!'

থিয়েটার তৈরী।

'ভগবান!'

অপারেশনের কাপড় পরে মহাকাশ-যাত্রীর মতো রেগ্ গী ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন।

'আমার ছেলেকে বাঁচিয়ে দাও বাবু!' মায়ের বুকফাটা কাতর আর্তনাদ।

স্ট্রেচারে করে ছেলেটাকে ভেতরে নিয়ে যাওয়া হ'লো।

'ওকে বাঁচিয়ে দাও, আমাকে নিয়ে নাও, ভগবান।'

অপারেশন শুরু হবার আগে নার্স ছেলেটির পালস দেখে 'ডাক্তার' বলে চমকে উঠেছিল— যেন বাচ্চার জায়গায় সে একটা ভূত দেখেছে।

'শাট আপ, যদি কাজ না জানো তো বাইরে থাকো।' রেগ্‌গী চটে ওঠেন।

ফার্স্ট ইনসিশন— গলায় প্রথম ছুরি— যেমন বইতে লেখা আছে —ঠিক সেই রকমভাবে রেগ্‌গী ছুরি চালালেন।

কমলার মানুষের ওপর আস্থা আবার নতুন করে ফিরে আসে, বেশ কিছুদিন এই আস্থা তার ছিলো না ব'লে মনস্তাপ হয়। সাহসে বুক বেঁধে ধৈর্য ধরে কমলা ওখানকার বেঞ্চে বসে থাকে।

ছোট্ট বাচ্চাদের প্যারামবুলেটারের মতো ট্রলিতে করে দুটো অক্সিজেন সিলিণ্ডার তার সামনে দিয়ে থিয়েটারে নিয়ে যাওয়া হ'লো।

'আমার মতন··· নাচিয়ের··· নিচু··· মেয়েছেলের বাচ্চার জন্যেও··· ঈশ্বর আছেন।'

দামী মদের বোতলের মতো ব্লাড প্লাজমার কয়েকটা বোতল নিয়ে ঢুকলো অন্য আর-একজন নার্স।

'এতো লোক··· নার্স··· ডাক্তার··· ওষুধ··· এখন যাই হোক না কেন,··· ভগবান। ··· এমন কুচিন্তা কেন মনে আসছে?···' ঈশ্বর তো আছেন।

অপারেশন শেষ হ'লো। ডাঃ রেগ্‌গী ড্রেস পরেই অপারেশন থিয়েটার থেকে সোজা বেরিয়ে এলেন। কমলার কাছে এসে কাঁধে হাত রেখে দাঁড়ালেন। আস্তে আস্তে বললেন, 'তোমার সিঁথের সিঁদূর মুছে গেছে।' মেয়েকে এই নিদারুণ খবরটা দিতে বাধ্য নিরুপায় বাপের মতো ডাঃ রেগ্‌গী ভেতরে ভেতরে এতক্ষণ যেন জ্বলছিলেন।

'আই হ্যাভ ডান মাই বেস্ট। কিন্তু কোনো লাভ হ'লো না।'

রেগ্‌গী নিজে ব্যবস্থা করে সিংহাচলমকে সঙ্গে দিয়ে মা-ছেলেকে পাঠিয়ে দিলেন।

বাবু যদি এই দয়াটুকু না করতেন— তা হলে ওর শেষ সম্বল দুটো টাকাও রিক্‌সার খরচে বেরিয়ে যেতো।

এই সোনালী কুঁড়িকে,

এই মাণিকের খনিকে,

যে হাতে এতদিন লালন-পালন করলো সেই হাতে পুড়িয়ে দিতে হবে, হায় ভগবান!

'আপনাদের মতো বড় লোকদের মধ্যে আপনার মতো যদি একজনও থাকে, তা হলে তার চরণ-ছায়ায় আমি বাকী জীবনটা কাটিয়ে দেবো।' মনে মনে ডাক্তারকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বাচ্চাটাকে কোলে নিয়ে কমলা উঠে পড়লো।

মরা যীশুকে কোলে নিয়ে ক্রন্দনরতা মেরীর মতো দেখাচ্ছে এই স্ত্রীলোকটিকে।

'আসি, বাবু!' সকৃতজ্ঞ হৃদয়ে আর কিছু বলতে পারে না।

'ঐ দেখো ল্যাজ আসছে, বাঘ বলে নিজেদের পরিচয় দেয় সেই দু-আনি চার-আনির খবরের কাগজওয়ালা। সত্যি সত্যিই যদি বাঘকে দেখে তবে চুপচাপ বসে থাকবে নাকি! যদি রেগ্‌গী আমাকে না বাঁচাতো তা হলে ওরাই আমাকে হাজতে পাঠাতো।' মৈথ্‌যূ বলে।

'এ আর এমন কি করেছি?' নিজের টেরেলিন প্যাণ্টের ওপর

থেকে চিপস্‌টা বাঁ হাতের আঙুল দিয়ে সরাতে সরাতে ডাঃ রেগ্‌গী বলেন। '

'আসলে এই পার্টি কি জন্যে?'

রেগ্‌গীর জন্যে— 'মিলিয়ন থাঙ্কস্ ফর দ্যা পি. এম.'— মৈথ্‌য়ূ কৃতজ্ঞতা জানায়।

'মানে?' কনট্রাকটার কিছুই বুঝে উঠতে পারছিলো না।

'পি. এম.-র মানে পোস্টমর্টম।'

'মানে?' কনট্রাকটর আরো আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করে। 'মানে ঐ হতভাগা ছেলেটা অপারেশনের আগেই বেঞ্চিতে খতম হয়ে গেছিলো।'

মরীচিকা

পাহাড়ের মাঝ বরাবর পাথরগুলোর ওপর আছড়ে পড়ে জল নীচের দিকে গড়িয়ে চলেছে। পাহাড়টা বেশ উঁচু। এই ঝর্নার কাছে দাঁড়িয়ে মাথা তুলে ওপরের দিকে তাকালে সবুজ গাছে ভরা পাহাড়টা বড় সুন্দর দেখায়। মনে হয় যেন আকাশটাকেই ছেয়ে আছে। চুড়োটা দৃষ্টিসীমার বাইরে। সন্দেহ হয় ওখানে কেউ কোনোদিন পৌঁছোতে পারবে কিনা।

প্রতিদিন নীলা এই ঝর্নার ধারে এসে জলে পা ডুবিয়ে বসে। মাঝে মাঝে জলের ছিটে এসে তার গায়ে মাথায় পড়ে। ঠাণ্ডা জলের স্পর্শে নীলার দেহ রোমাঞ্চিত হয়। আনন্দে সে দিশেহারা হ'য়ে পড়ে।

ঝর্নার ধারা পাহাড়ের এক চুড়ো থেকে নেমে এই পাথর অবধি সরু নালার মতো বয়ে আসে। পাথরে ধাক্কা খেয়ে নীচে আছড়ে পড়ে। মাঝে মাঝে নীলা ওপরের পাথরের কাছে গিয়ে বসে। এখান থেকেই জলের তোড় সরু হয়ে বয়ে চলেছে; কখনও কখনও এই পাথরের ওপর নীলা ঘুমিয়ে পড়ে। কখনও বা পাহাড়ের চুড়োর দিকে তাকিয়ে থাকে। ভাবে ওখানে যদি উঠতে পারতো, যদি কখনও পৌঁছোতে পারতো তা হলে কেমন মজা হ'তো। কিন্তু একলা ওঠার সাহস ওর নেই। শুধু মনে একটা ক্ষীণ আশা নিয়ে তাকিয়ে থাকে। তার মনের এ বাসনা হয়তো কোনোদিন পূর্ণ হবে না। লোকে বলে ঐ পাহাড়ের মাথায় কোনো সাধু আছে। নীলা কোনোদিন

তাকে দেখে নি, সাধুও কোনোদিন নীচে নামে নি। চুড়োয় আজ অবধি কেউই পৌঁছতে পারে নি।

রোজ রাতে পাহাড়ের চুড়োয় যেন একটা প্রদীপ জ্বলে। অনেক রাত অবধি সেটা টিম্‌টিম্‌ করে জ্বলে। লোকে বোধহয় তাই বলে, ওখানে কোনো সাধু থাকে।

ঐ পাহাড়ের কোনো উপত্যকায় নীলার কুঁড়ে। নীলা আর নীলার দিদিমা। এ ছাড়া তৃতীয় প্রাণী নেই। পাহাড়ের ওধারে দূরে একটা ছোট্ট গ্রাম। নীলার দিদিমা আগে ওখানেই থাকতেন ; নীলার মা তখন বেঁচে ছিলো। দিদিমা মাঝে মাঝে বলেন, 'মা! তোর মা যখন তোর বয়েসী ছিলো তখন আমরা ঐখানেই থাকতাম। তোর মা রোজ এই ঝর্নার ধারে আসতো, গরু-বাছুর নিয়ে এইখানেই ঘুরে বেড়াতো। একদিন এইখানে এক আগন্তুকের সঙ্গে ওর আলাপ হয়। তার চিন্তা ওকে এমন পেয়ে বসলো যে আর-সবকিছু ও ভুলে গেলো। আগন্তুক কথা দিয়েছিলো সে আবার আসবে, কিন্তু আর ফেরে নি। তুই জন্মাবার পরই তোর মা অসুখে মারা গেলো। ঐ সামনের আম গাছটার তলায় ওর শেষ কাজ করি। তোর মা প্রায়ই বলতো, আমি যেন সবসময় ঐ ঝর্নার কাছে থাকি। ঐ আম গাছটা আমিই লাগিয়েছিলাম। ওটার দিকে তাকালেই তোর মাকে দেখতে পাই। ওতে মুকুল ধরলে তোর মায়ের হাসিটা মনে পড়ে। যেই গ্রাম ছাড়লাম, এখানে এসেই থাকতে লাগলাম।' মার কথা ছবির মতো নীলার চোখের সামনে ভেসে ওঠে। আম গাছটার দিকে তাকিয়ে সেও যেন মাকে দেখতে পায়।

দিদিমার সম্পত্তি বলতে দুটো মোষ আর কয়েকটা ছাগল : তাদের দেখাশোনা করা তার কাজ। তাদের খাওয়ানোর ব্যাপারটা

খুব একটা ঝামেলার কিছু নয়। ছাগল-মোষ পাহাড়েই চরে বেড়ায়, সন্ধ্যে হলেই ঘরে ফিরে আসে। এদের জন্যে চিন্তাভাবনার কিছু নেই। সে নিজেও মনের আনন্দে কখনও ঝর্নার ধারে, কখনও বা গাছের ছায়ায় ঘুরে বেড়ায়। সঙ্গী বলতে গাছের ফলফুল আর পশুপক্ষী। পাতার মর্মরধ্বনি আর পাখিদের কলকাকলি সে শোনে। যখন এক ঝাঁক পাখী এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় উড়ে যায়, এক ডাল থেকে অন্য ডালে উড়ে বেড়ায়, নীলা তখন অন্য জগৎ দেখতে পায়। এরা কখনও দলে, কখনও বা একা উড়ে বেড়ায়। সব সময় কোনো-না-কোনো নতুন জিনিস, কিছু-না-কিছু আশ্চর্য জিনিস নীলা ওদের মধ্যে দেখতে পায়। কিচির-মিচিরের তো অভাব নেই। নীলার কখনও একা মনে হয় না।

পাহাড়ের গায়ে একটু উঁচুতে আরো দুটো কুঁড়ে আছে। একটায় কোকিলা আর গণপতি থাকে, অন্যটা খালি। কখনও কোনো পরদেশী পাহাড় দেখতে এলে তাকে ঐখানে থাকতে দেওয়া হয়। গণপতি তাদের পাহাড় দেখায়, কোকিলা ওদের রেঁধে খাওয়ায়। কোকিলা দিদিমার সঙ্গী। দুপুরবেলায় দু'জনে গল্প করে। নীচের কুঁড়ে থেকে দিদিমা চেঁচিয়ে কিছু বলে আর কোকিলা ওপর থেকে জবাব দেয়। বেশির ভাগই জন্তুদের বিষয় কিংবা মেঘের বিষয়। কখনও বা ঝরাপাতা নিয়ে ওদের আলোচনা হয়। মাঝে মধ্যে দু'জনে মিলে পাশের গাঁয়ে যায়। গাঁয়েতে গিয়ে ওখানকার লোকেদের খবরাখবর নিয়ে জিনিসপত্তর কিনে ফেরে। পাহাড়ের উঁচু জায়গায় দাঁড়িয়ে পাশের দিকে তাকালে একটা উপত্যকা দেখতে পাওয়া যায়। দুদিকে সবুজ গাছে ভরা উঁচু উঁচু পাহাড়। মাঝখানে সরু সরু পথ সাদা সরীসৃপের মতো এঁকেবেঁকে চলে

গেছে। এই রাস্তা সমতল জায়গায় এসে শেষ হয়েছে। দূর থেকে গাড়ী নিয়ে যারা আসে তারা ঐখানেই এসে থামে। ওখান থেকে যারা ওপরে যেতে চায় তারা পাহাড়ী পথে পায়ে হেঁটে যায়।

একদিন দুপুরবেলায় ঝর্নার ধারে ঘাসের ওপর নীলা ঘুমোচ্ছিলো। ঘুম ভাঙলে দেখে বিকেল হয়ে এসেছে। সূর্যের রক্তিম আভা জলে ছড়িয়ে পড়েছে। গাছের ডালের মধ্যে দিয়েও হালকা রোদের আভা এসে পড়েছে। নীলা আলিস্যি ভেঙে চোখ রগড়াতে রগড়াতে এদিক-ওদিক তাকায়। দেখে ঝর্নার ওপারে কে বসে। ঘাস নিয়ে খেলা করছে আর নীলার দিকে আড়চোখে দেখছে। নীলা চমকে ওঠে। কে জানে লোকটাকে, নতুন মুখ, আগে কখনও দেখে নি। না জানি কতক্ষণ বসে আছে। হতে পারে সে যখন ঘুমিয়ে পড়েছে তখন থেকেই ও ওখানে বসে আছে! জানে না, কতক্ষণ ধরে এইভাবে ওর দিকে তাকিয়ে আছে। লজ্জায় সে কুঁকড়ে যায়। ঘুমমাখা মলিন মুখখানা সে লুকিয়ে ফেলতে চায়। আঁচলটাও বড় নয়। লোকটাকে দেখতে ফর্সা; বেশ সুন্দর। পরনের কাপড় বেলফুলের মতো সাদা ধব্‌ধবে। নীলার চেহারা ফ্যাকাসে মেরে যায়।

এই পাহাড়ী এলাকায় এই রকম পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন লোক বড় একটা দেখা যায় না, এই রকম ধব্‌ধবে কাচা কাপড়ও কেউ পরে না। নীলার মনে হয় লোকটি যেন কোনো দেবলোক থেকে এসেছে। সে খুব আশ্চর্য হয়ে তার দিকে তাকিয়ে থাকে। জলের ধারে দুটো সাদা কাঠবেড়ালী এদিক-ওদিক করছিলো। গাছের ডাল থেকে সাদা পাখিটা ফুড়ুৎ করে উড়ে গেলো। নীলার সম্বিত ফিরে আসে, বাস্তবে সে ফিরে এলো। পাহাড় থেকে নেমে সে কুঁড়ের দিকে ছুট দিলো। দিদিমাকে গিয়ে বললো, 'এক নতুন

লোক এখানে এসেছে।' দিদিমা বলেন, 'হ্যাঁ, আমি জানি, দুপুরে এসেছে। ওপরকার কুঁড়েতে থাকে।' কোকিলা বললো, 'ও কালকেও এখানে থাকবে।' নীলার চোখে মুখে আনন্দ ফুটে ওঠে। কাল সারাদিন ও তার সঙ্গে থাকতে পারবে। দিনভোর তাকে দেখতে পাবে। তার সঙ্গে কথা বলবে। যে কটা ছোট পাহাড় নীলা ভালবাসতো তা ওকে দেখাবে। ঐ পাহাড়ে যত গাছ আছে সবকটার নামই নীলা জানে কিন্তু ঐ লোকটা জানে না। নীলা যখন বলতে স্থুরু করবে ঐ লোকটা তখন আশ্চর্য হয়ে শুনবে। এমনিতে গাছপালা, পাখী, ঝিল ছাড়া নীলাকে সঙ্গ দেবার আর কেউ ছিলো না। তাই আজ সেই পুরুষের কল্পনাতেই সে মহাখুশী হয়ে ওঠে। ওকে দেখেই নীলার এত ভালো লাগে যেন মনে হয় ঐ লোকটার সঙ্গে তার জন্ম-জন্মান্তরের সম্বন্ধ। আসছে কাল ওর সঙ্গ পাবে এই আশা নিয়ে সে আজ ঘুমিয়ে পড়ে।

ভোর হতেই নীলা ঝর্নার ধারে গিয়ে বসে। মুখ-হাত-পা ধুয়ে নেয়। জলহাত দিয়ে চুলগুলো ঠিক করে নিল। এই প্রথম তার নিজের রূপ তার মনে সন্দেহ জাগায়। জলে ঝুঁকে পড়ে নিজের ছায়া দেখে। দেখে হতাশ হ'লো। মোটেই স্থুন্দর সে নয়। কালো চেহারা, চোখ কোটরে ঢুকে গেছে। অবিন্যস্ত চুলগুলো অনেক করে সামলাবার চেষ্টা করে, কিন্তু বাগ মানে না; উসকো-খুসকো হয়েই থাকে। নিজের রূপ সম্বন্ধে এতদিন ও মোটেই সজাগ ছিলো না। নিজের রূপে আজ নিজেরই ভালো লাগে না। দৌড়ে বাড়ী ফিরে যায়। বাক্সের সবচেয়ে নীচে রাখা রঙীন শাড়ীটা পরে নেয়। শাড়ী পরে খানিকটা নিজেকে মনে ধরে। শাড়ীটা তার পছন্দ, কালোর ওপর লাল রঙের ছিট্।

একটু বেলা হলে যুবকটি ঝর্নার ধারে এলো। তুহাতে তার সাদা ফুলের তোড়া। মনে হয় পাহাড়ে ঘুরতে ঘুরতে জড়ো করেছে। নীলা তার দিকে চেয়ে হেসে ফেলে। যুবকটিও হাসে। মনে হয় বহুকালের চেনা। নীলাই প্রথমে কথা পাড়ে, 'কি, পাহাড় দেখতে এসেছেন?'

'হ্যাঁ।' নীলা আবার বলে, 'আমা' নাম নীলা। আমরা এখানেই থাকি। আমি এই পাহাড়ের সব অলিগলি চিনি। আমি আপনাকে রাস্তা দেখাতে পারি।' ছেলেটি বিশেষ কিন্তু উৎসাহ দেখায় না। নির্লিপ্তের মতো বলে, 'কাল আমি অনেক কিছু দেখেছি। গণপতি আমার সঙ্গে ছিলো।' জলের ধারে ঘাসের ওপর ছেলেটি পা ছড়িয়ে বসে পড়লো। হাতের ফুলগুলো নিয়ে খেলা করতে থাকে, একবার একটা একটা করে আলাদা করে, আবার তাদের সব কটাকে জড়ো করে।

নীলা ছেলেটির পাশেই বসেছে। তার মনে অনেক প্রশ্নই উঁকি-ঝুঁকি মারে। যুবকটিকে সে অনেক কথাই জিজ্ঞেস করতে চায়। দোনামোনা ক'রে জিজ্ঞেস করে ফেলে।

'মৈত্রেয়ী।' নামটা বড় অদ্ভুত লাগে। মনে মনে 'মৈত্রেয়ী' 'মৈত্রেয়ী' ব'লে নামটা মুখস্থ করে নেয়। নামটা এবার ভালোই লাগে। গ্রাম কোথায়, জিজ্ঞেস করলো। উত্তরে যুবকটি একটা নাম বলে। নীলা জানেই না এ গ্রাম কোথায়। পাহাড় ছেড়ে সে কোথাও কোনোদিন যায় নি। ভাবে, গ্রামটা বোধহয় অনেক দূরে। পাশে তাকালেই উৎরাই-এর আঁকাবাঁকা সাদা পথটা দেখা যায়। ভাবে ঐ পথ দিয়ে গেলে ছেলেটির গাঁয়ে পৌঁছোনো যায়। উৎরাই-এর দিকে আঙুল দেখিয়ে যুবকটিকে প্রশ্ন করে, 'আপনি

এই পথ দিয়েই এসেছেন ?' জবাব পায়, 'হ্যাঁ'। আবার প্রশ্ন করে, 'আপনার গাঁ কি এখান থেকে অনেক দূরে ?' একটু মুচকি হেসে যুবক উত্তর দেয়, 'হ্যাঁ, একটু দূর তো বটেই।' এরপর কি জিজ্ঞেস করবে নীলা ভেবে পায় না। জলে হাত ডুবিয়ে যুবকটি খেলা করতে থাকে। হাতের ফুলগুলো একটা একটা করে জলে ভাসিয়ে দিতে থাকে। নীলা জলের ওপর ঝুঁকে পড়ে হাত বাড়িয়ে এক গোছা ফুল তুলে নেয়। ফুলের গোছাটা হাতে নিয়ে নীলা ভাবে এক অমূল্য নিধি ও হাতে পেয়েছে। খুশি হয়ে যুবকটিকে দেখে। যুবকটি খেয়াল করে না। আপন মনে জলে হাত-পা ডুবিয়ে খেলছিলো। আস্তে আস্তে গুনগুনিয়ে গান ধরে। নীলার মনে অদ্ভুত এক কৌতূহল জাগে। গান ও খুব ভালোবাসে। দিদিমার শেখানো গান নিজেই সে একাই গায়। এ ছাড়া আর কোনো গানই সে জানে না। আর সে থাকতে পারে না। যুবকটিকে জিজ্ঞেস করে, 'আপনি বুঝি গান জানেন ?' মুচকি হেসে যুবকটি জবাব দেয়, 'গান আমার একেবারে আসে না। আমি গান লিখি, গাই না।' এর কি মানে নীলা বুঝতে পারে না। ওর গান নীলার শুনতে ইচ্ছে করে। থাকতে না পেরে যুবকটিকে বার বার গান গাইতে অনুরোধ করে। যুবকটি কথা কানে নেয় না, উত্তরও দেয় না। উল্টে গুণগুণ করে গান গাওয়াও বন্ধ করে দিলো। নীলা হতাশ হয়। একটু পরেই ছেলেটি প্রশ্ন করে, 'পাহাড়ের চুড়োয় কেউ কি কোনোদিন উঠেছে ?' নীলা চনমনিয়ে ওঠে। কৌতূহলভরে বলে, 'না, ওখানে আমি নিজে উঠতে চাই। কিন্তু একলা যেতে ভয় করে। লোকে বলে, ওখানে কোনো এক যোগী থাকে। আসলে ওখানে যোগী থাকে কি না থাকে, সেটা কারুরই জানা নেই।'

এইবার যুবকের মধ্যে কৌতূহল দেখা যায়।

'আমি আজ ঐ মাথায় ঘুরে আসবো,' ঝোঁকের মাথায় যুবকটি বলে ওঠে। নীলাও ওর উৎসাহ দেখে বলে ওঠে, 'আমিও সঙ্গে যাবো।' নীলা মনে মনে কল্পনা করে নেয়, এতো উঁচু পাহাড়ে যুবকটির সঙ্গে কথা বলতে বলতে উঠতে বেশ মজা লাগবে। ছেলেটি কোনো জবাব দিলো না। 'হ্যাঁ' বা 'না' কিছুই বললো না। ঝর্নার ধার ধরে ওরা উঠতে স্নুরু করলো। অধীর আগ্রহ নিয়ে নীলা ছায়ার মতো ছেলেটির পিছু পিছু চলতে থাকে। ছেলেটি কিন্তু একটিবারও পেছন ফিরে তাকায় না। ফিরেও দেখে না নীলা সঙ্গে আসছে না কি। তাড়াতাড়ি সে উপরে উঠতে থাকে। নীলা আস্তে আস্তে পেছনে চলে।

ছেলেটির সঙ্গে নীলা তাল রেখে চলতে পারে না। খানিক বাদেই ছেলেটি চোখের সামনে থেকে মিলিয়ে যায়। নীলা নিরাশ হয়ে পড়ে। তার দম বন্ধ হয়ে আসে। সে কেঁদে ফেলে। ওখানেই বসে পড়ে। বসে বসে ভাবতে থাকে— 'সে ছেলেটির সঙ্গে ওপরে উঠতে চায় কিন্তু ছেলেটি চায় না। পাহাড়ের চূড়া দেখার সাধ তার অপূর্ণই রয়ে যাবে।' ভেবে দুঃখ হয়। পাহাড়টা যেন শূন্যতায় ভরে গেছে মনে হয়। হঠাৎ ছেলেটির গানের আওয়াজ ভেসে আসে। নীলা চমকে ওঠে। খুশিতে মন ভরে ওঠে। গানের সুর সে শুনতে পায়, কিন্তু কথা স্পষ্ট বুঝতে পারে না। ছেলেটি বোধহয় নিজেই গানটা লিখেছে। বুঝতে চেষ্টা করে এই গানের মানে কি? মন আবার তার উদাসী। একটু পরে পাহাড় থেকে নেমে নীলা বাড়ী ফিরে যায়।

দুপুরবেলা নীলা যুবকটিকে আবার দেখতে পায়। ঝর্নার ধারে

তাকে দেখতে পেয়ে নীলা নিজের দুঃখ ভুলে যায়। খুব উৎসাহ নিয়ে জিজ্ঞেস করে, 'আপনি কি ওপর অবধি গেছিলেন? যোগীর সঙ্গে দেখা হ'লো? উনি কি আপনার সঙ্গে কথা বললেন?' সকালের মতোই কোনোরকম আগ্রহ না দেখিয়ে ছেলেটি জবাব দেয়, 'না, ওপর অবধি যাওয়া হয় নি; খানিক দূরে গিয়ে ফিরে এসেছি।' নীলা নিরাশ হয়। সে অন্যমনস্ক হয়ে উৎরাইটার দিকে তাকিয়ে থাকে। ওখানকার রাস্তা দেখেই ওর বুকটা ছাঁৎ করে ওঠে।

'আজ চলে যাবেন?' কাতর হয়ে নীলা জিজ্ঞেস করে।

'হ্যাঁ, খানিক বাদেই যাবো।' নীলার মুখ ফ্যাকাসে হয়ে যায়। একবার সে ঐ পথ ধরে গিয়েছিলো। সে অনেক দূর যেতে চেয়েছিলো কিন্তু খানিক দূরেই একটা জলভরা দীঘি দেখতে পায়। রোদে জল চিক্‌চিক্ করতে থাকে। সে জলের কাছ বরাবরই যেতে চেয়েছিলো কিন্তু সাহসে কুলোয় নি। ভয়ে আর দ্বিধায় সে এগুতে পারে নি। আস্তে আস্তে ফিরে এসেছিলো। হঠাৎ তার এই-সব কথা মনে পড়ে যায়। সে বলে, 'ঐ পথে খানিক দূরে একটা মস্ত বড় ঝিল আছে, না? তার জল খুব চিক্‌চিক্ করে।' ছেলেটি হেসে ফেলে, বলে, 'ঝিল নেই, কিছুই নেই।' নীলার কিন্তু বিশ্বাস হয় না। নিজের সন্দেহ প্রকাশ করে বলে, 'একবার আমি ঐ-পথে গিয়েছিলাম। দূরে ঝক্‌মক্ করছে জল, আমার ভারি সুন্দর লেগেছিলো। একা ছিলাম বলে কাছে যেতে সাহস হয় নি।' কথা শুনে যুবকটি বলে, 'রোদে ঐ রকমই মনে হয়। ওটা জল নয়, মরীচিকা; দূর থেকে জল মনে হয়। আমরা যত কাছে এগোই, ওটাও তত দূরে সরে যেতে থাকে।' নীলার মন আবার উদাস

হয়ে পড়ে। 'জলে ভরা মনে হয়, কিন্তু আসলে জল নয়।' কথাটা ওর মনে ধরে না। মুষড়ে-পড়া জীবন মনে হয়।

খানিক বাদেই গণপতি এসে হাজির। হাতে একটা থলে। ছেলেটিকে লক্ষ্য করে বলে, 'সন্ধ্যে হবার আগেই আপনাকে এখান থেকে বেরিয়ে পড়তে হবে। আসুন, আপনাকে আমি খানিকদূর এগিয়ে দিয়ে আসি।' বলেই গণপতি ঢিবি থেকে নীচের দিকে নামতে থাকে। ছেলেটি আলিস্যি ভেঙে উঠে দাঁড়ালো। নীলার দিকে তাকিয়ে মুচকি একটু হেসে গণপতির পিছু পিছু চলতে সুরু করলো। নীলা ওখানেই দাঁড়িয়ে তাকে দেখতে থাকে। মনটা ওর খাঁ খাঁ করে ওঠে। ছেলেটি যত দূরে চলে যায় নীলার মন ততই উদাস হয়ে পড়ে। ছেলেটি কিন্তু একবারও পেছন ফিরে তাকালো না। নীলা একদৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে থাকে। খানিকবাদে ছেলেটি হারিয়ে যায়। অজান্তেই নীলা দীর্ঘশ্বাস ফেলে। মাথা নিচু করে নেয়। সন্ধ্যে অবধি সে ওখানেই বসে থাকে। আলোআঁধারে পাহাড়টা ভয়ঙ্কর মনে হয়। ছেলেটির গাওয়া সকালের গানটি তার কানে বাজতে থাকে। গানের কথাগুলো মনে পড়ে যায়; মানে কিন্তু সে কিছুই বুঝতে পারে না। শব্দ-হীন গান, জলহীন ঝিল আর প্রেমহীন মন— সব মিলিয়ে ওকে আরো উদাস করে তোলে। হয়তো ছেলেটি আর ফিরবে না। কিন্তু নীলা ওকে কোনোদিনই ভুলতে পারবে না। তাই নীলার বেদনাও কোনোদিন যাবে না। ক্ষণিকের এই অতিথির জন্যে এ মায়া, এ-মমতা কেন? নিজের মনের এই ব্যথা সে ব্যক্ত করতে পারে না। অন্ধকারে আর বসে থাকতে পারে না। ঘরে ফিরে যায়।

দিদিমা সান্ধ্যপ্রদীপ জ্বালাচ্ছিলেন। নীলা তার কাছে গিয়ে

বসলো। উদাস মনে দিদিমার দিকে তাকিয়ে থাকে। শুধু মনে হয়— কিছুদিন পরে সেও দিদিমা হবে, চুল সাদা হয়ে যাবে। গালের চামড়া কুঁচকে যাবে। হাত কাঁপবে। তখনও কি তার এই ছেলেটির কথা মনে থাকবে। তার সুন্দর চেহারা তখনও কি তার চোখের সামনে ভাসতে থাকবে? ভয় পেয়ে যায়। দিদিমার গলা জড়িয়ে ধরে সে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে। মনের ব্যথা আর সে চেপে রাখতে পারে না। এই ব্যথা তার মনের কোণে বোধহয় অনেকদিন থেকেই লুকিয়ে ছিলো। মনের এই অব্যক্ত বেদনা আজ বাইরে বেরিয়ে এসেছে। দিদিমা আদর করে তার মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে আস্তে আস্তে প্রশ্ন করেন, 'হ্যাঁ মা, কি হয়েছে রে?' দিদিমার অন্তরের মায়া-মমতা নীলার দেহমনকে স্পর্শ করে। নীলা সামলে নেয়। আব্দার করে দিদিমাকে বলে, 'দিদিমা! তুমি মার জন্যে ঐ আমগাছটা লাগিয়েছিলে না! আমি যখন থাকবো না তখন তুমি ঐ পাহাড়ে একটা সাদা ফুলের গাছ পুঁতে দিও। ওতে সবসময় সাদা ফুল ফুটে থাকবে। যতদিন ধরে ফুল ফুটবে ততদিন ধরে আমি ওখানে থাকবো।' দিদিমার বুক হা হা করে ওঠে। ভাবতে থাকেন, 'আমি কি চিরটা কাল এই ভাবেই থাকবো?' কিন্তু মুখে কিছু বললেন না।

নীলা চোখ মুছে ফেলে। দিদিমা খেতে ডাকেন। নীলা বলে, 'না'। দিদিমার দু'টো হাত নিজের গলায় জড়িয়ে নেয়। তার চোখে ঘুম ভেঙে আসে। একনিমেষেই সে ঘুমিয়ে পড়ে।

সকালে উঠে সে আম গাছের তলায় গিয়ে বসলে। গাছের ডালে একটা টিয়া বসে শিষ দিচ্ছিলো। প্রেমভারে নীলার মাথা নুয়ে পড়ে।

নো রুম

জ্যোৎস্নাকে শুকোতে দেওয়া সুজির মতো মনে হয়। সহরটাও অদ্ভুত ঠেকে— শ্বশুরবাড়ীর মতো।

'রুম চাই।'

'সিঙ্গল্ না ডবল্?'

সময়মতো উত্তর না পেয়ে মুখ তুলে তাকায় একাক্ষী মুন্সী।

ঝাপসা নজরে নূকরাজুর বেশভূষা দেখে মনে হয় না হনিমুন করতে বেরোনো বরের মতো। তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা গ্রামের মেয়েটিকে দেখলে কুমারী মনে হয়। ভালো করে নজর করেও তাদের সঙ্গে বাক্স, বিছানা, এমন কি, একটা হ্যাণ্ড ব্যাগও দেখতে পাওয়া গেলো না। তাই বললো,

'নেই।'

'কি নেই?'

'রুম নেই।'

অন্তঃপুরের কাহিনী বাইরে প্রকাশ করে আবার ছোট ঘরের বীরপুরুষকে অন্তঃপুরে যেতে বাধা দেয়, এমন রাজার শালার কথা মনে পড়ে যায় মুন্সীকে দেখলে।

নূকরাজু ভেবে পায় না যে সে এমন কি গোপন কথা প্রকাশ করতে যাচ্ছে। এক মুহূর্ত সে হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো।

খানিকপরে মনে হ'লো মাঝপথে বাধা দেবার এ কে, আর এই ভেবে তার রাগ হ'লো ভীষণ।

কিন্তু ততক্ষণে মুন্সীর চোখ টেবিলে ঝুঁকে পড়ে অঙ্কের হিসেব করতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। নূকরাজু যখন দেখলো তার রুক্ষ চোখের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মুন্সীর তেলাটেকো মাথা থেকে পিছলে যাচ্ছে তখন সে মুন্সীর পাশে বসা দেবুভূর দিকে তাকালো।

দেবুভূর চোখে কোনোরকম তিক্ততা মাখানো নেই। তার পরনের খাকি পোষাক তাই ছেঁড়া আর পুরোনো। ওর কাঁধ ঠিক সেই বুড়ো বলদের মতো; সারাজীবন কাঁধে বোঝা নিয়ে বুড়ো বয়সে কাঁধের দাগগুলো মেলাবার চেষ্টা করছে। মুন্সীর ওপর বেশ রাগ হয়েছিলো, দেবুভূর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে সেটা কৌতূহলে পরিণত হ'লো।

'টক-টক-টক' করে সিঁড়িতে শব্দ করে নূকরাজু রাস্তায় বেরিয়ে পড়লো। ওর সঙ্গে ওর অম্মভূ ছায়ার মতো পিছু পিছু চললো।

'বেটা নতুন রাস্তা বেছে নিয়েছে।'

কারুর সম্বন্ধে কিছু বলার থাকলে সে পিছু ফেরা মাত্রই তা বলে ফেলা মুন্সীর স্বভাব। দেবুভূর মনে হয় ফিরে এসে মারতে না সুরু করে।

'ছোকরাটা কে হে?'

দেবুভূ জানে না। তবুও মুন্সীজীর প্রশ্নের কিছু একটা জবাব দেওয়া তার অভ্যেসে দাঁড়িয়ে গেছে।

'ছেলেটা কে তা বলতে পারবো না। কিন্তু তার সঙ্গে যে মেয়েটি ছিলো ও তার স্ত্রী।'

'তুমি ওদের চেনো?'

'আমি চিনি না। কিন্তু মেয়েটির গলায় যে মঙ্গলসূত্র আছে, তাই বলছি', সে একটু ঢোঁক গেলে।

'মঙ্গলসূত্র তো সব মেয়ের গলাতেই থাকে। কিন্তু কে বলতে পারে যে সেটা ওর পরানো কি না। ওতে নাম লেখা আছে নাকি?'

'তুমি যে পরিয়েছিলে তাতেও কি নাম লেখা ছিলো নাকি?' দেবুভূর ভেতর থেকে প্রশ্নটা বেরিয়ে আসতে চায়; কিন্তু মুখে কিছু না বলে কাঁধে তোয়ালেটা ফেলে উঠে পড়ে।

দেবুভূ যখন খাবার খাওয়ার জন্যে সিঁড়ি বেয়ে নেমে বাইরে এলো তখন সিনেমার প্রথম শো ভেঙেছে। প্রথম শো দেখে যারা বাড়ী ফিরছে আর দ্বিতীয় শো দেখার জন্যে যারা বাড়ী থেকে আসছে তাদের রিকসা, গাড়ী আর বাসের ভীড়ে রাস্তাটা বেশ সরব হয়ে উঠেছে। রাস্তার ওপারে পানের দোকানে পোকার মতো লোকেরা ভাড় করে দাঁড়িয়ে। ঘেঁষাঘেষি কালো ছায়ার মতো লোক আর জ্যোৎস্নার চেয়েও সাদা ইলেকট্রিকের আলো— ঐ ছোকরা ও ছুকরীও ওখানে। অবাক হয়ে ওখানকার ভীড় দেখছে অম্মভূ। নূকরাজুর চোখ এখনও ঐ লজিং হাউসের ওপর। দেবুভূর ওদের দেখে মায়া হয়।

দেবুভূ খাওয়াদাওয়া শেষ করে মুখে চুরুট ধরিয়ে বগলে চাদরটা রেখে আর মাথায় তোয়ালে জড়িয়ে যখন নিজের কুঁড়ের দিকে পা বাড়ায় তার দেড় প্রহর আগেই চার দিক জ্যোৎস্নায় ছেয়ে গেছে। দেবুভূ চারি দিকে একবার নজর বুলিয়ে নেয়— এখন রাত আন্দাজ সাড়ে-দশটা। সারা বছরই দিনে তিনবার বাইরে বেরোতে হয় তাকে তাই সময়টা ঠিকই আন্দাজ করে নেয়; কোথাও ঘড়ি দেখতে পায় তো নিজের আন্দাজটা মিলিয়ে নেয়। বেশির ভাগ সময়ই তার অনুমান মিলে যায়।

কৈরাবী পাহাড়ের তলায় ঝকঝকে সহরটাকে দেখে সে তার অনুমান ঠিক কিনা পরখ করে নেয়। পাহাড়টা গাঁয়ের উত্তর দিকে। কয়েকটা কুঁড়ে ঘর, তার সামনে বাড়ী, আর কোনো বসতি নেই। ওদিকে পশ্চিমে প্রায় এক মাইল দূরে একটা মস্ত বড় ফ্যাক্টরী, তার লাগোয়া একটা ছোট্ট কলোনী। ফ্যাক্টরী থেকে সহরের দিকে যেতে পশ্চিম ও উত্তরের মাঝে রেলওয়ে জংশনের আঁকাবাঁকা যে পথটা গেছে তাতে তুটো লরী— একটা স্টেশনের দিক থেকে আর একটা সহরের দিক থেকে— কখনও পাশাপাশি, কখনও বা দূরে সরে গিয়ে— পাল্লা দিয়ে ছুটে চলেছে। কোনো বাড়ীতেও আলো নেই। সহরটাকে অন্ধকারের মধ্যে সুতো কাটার তকলী আর আলোটাকে সুতোর মতো মনে হচ্ছে।

আস্তে আস্তে দেবুভূ যখন লজিং হাউসের কাছে পৌঁছোবে তখন এগারোটা সওয়া-এগারোটা বেজে যাবে।

হাঁটতে হাঁটতে দেবুভূ সামনে থেকে একটি জুটিকে আসতে দেখলে। দেবুভূ আন্দাজ করে ওরা বোধহয় দক্ষিণ দিকের সিনেমা হল থেকে আসছে। ভদ্রমহিলার কোলে একটি ছোট্ট মেয়ে আর ভদ্রলোকের হাতে একটি তিন বছরের ছেলে। স্ত্রীলোকটি হাসির সিনগুলি মনে করে খুব উৎসাহে সেগুলো বর্ণনা করে যাচ্ছে। এক তো তাড়াতাড়ি হাঁটার ক্লান্তি আর অনর্গল কথা বলে যাওয়ার উৎসাহ— এ তু'য়ে মিলে তাকে পরিশ্রান্ত করে তুলেছে।

'কে জানে সে ছেলেটা আর মেয়েটা কোথায় গেলো?' দেবুভূর মনে চিন্তা দেখা দেয়।

হয়তো অন্য কোনো লজে ঘর পেয়েছে। আর যদি না পেয়েও থাকে, তবে এই সহরের লোক হলে দ্বিতীয় শো দেখে রিকসায়

বসে যাবে। আর যদি অন্য সহরের লোক হয় তো কোনো সরাইখানার দাওয়ায় সারা রাত কাটাবে।

দেবুভূ ভাবে, আজকালকার ছেলেরা পুরোনো কালের আমাদের মতো তো আর বোকা নয়।

দেবুভূ আজকালকার ছেলেদের মধ্যে স্ফূর্তি আর বেঁচে থাকার উৎসাহ দেখে খুব খুশী হয়। পুরো হপ্তা কোনো অয়েল-ইঞ্জিনে কাজ করে বা কোথাও মজুরের কাজ করে, কিন্তু রবিবারে ঠিক ময়লা কাপড় ছেড়ে পরিষ্কার কাপড় পরে নেয়। সেদিন তাদের মাড়োয়ারীর বাচ্চা কিংবা রাজার ছেলের মতো দেখায়। সারাদিন ক্লাবে আড্ডা, খেলাধুলো আর সন্ধ্যে হলেই সিনেমায় মশগুল হয়ে যায়। দু'আনার চার আনার টিকিট যখন পায় না তখন চটপট বলে দেয় ওপরের টিকিট দাও— যেন কালকের জন্যে তার কোনো চিন্তাই নেই।

পোতরাজুর কথা সে আজ বুঝতে পারে।

মজুর পয়সা জড়ো করে বাড়ী তৈরী করবে এ কখনও সম্ভব নয়। কথায় আছে, তাঁতি যতই কাপড় বুনুক না কেন, তাঁতির বউ ছেঁড়া কাপড় পরেই থাকবে। তাই যতটুকু পাওয়া যায় সেটুকু নিয়ে আনন্দ করেই কাটিয়ে দেওয়া ভালো। সব কিছু জেনেও তার মতন লোক এ সব করতে পারে না। পোতরাজুর মতো ছেলেরাই এ সব করতে পারে কেন না তাদের বুকের পাটা আছে।

দেবুভূ যে লজিং হাউসে কাজ করে, পোতবাজু সেই লজিং হাউস তৈরী করেছে, সেও ছিলো মিস্ত্রিদের দলে।

খাতির করে শুধু সবচেয়ে বুড়ো মিস্ত্রিকে; বুড়ো মিস্ত্রিকে

বড় মিস্ত্রি বলা হ'তো, কিন্তু ঠিকভাবে কাজটা হাঁসিল করা আর হুকুমমাফিক কাজ হচ্ছে কিনা সেটা দেখাশোনার ভার ছিল পোতরাজুর।

বয়স তিরিশও হয় নি, যেমন নিজে কাজে হুঁসিয়ার তেমনি অপরের কাছ থেকে কাজ নিতেও ওস্তাদ। দরকার হলে সে মজুরদের দিয়ে হাড়ভাঙা খাটুনি খাটিয়ে নেয়, আবার প্রয়োজনে তাদের প্রত্যেকটা কথা সমর্থন করে। শুধু বড় মিস্ত্রি নয়, কনট্রাকটারও তাকে ভয় পায়। কিন্তু সে কাউকেই ভয় করে না। আসলে এটাই তার নীতি।—এই ছোঁড়াদের আমরা ভয় করবো কেন। একটু ভেবে দেখো, এরা আমাদের ভাত-কাপড়ের ব্যবস্থা করছে না, আমরাই ওদের ভুঁড়ি করছি। এই বাড়ীটাই দেখো ; আমি, আপনি আর কুকুরের বাচ্চা কনট্রাকটার মিলে তৈরী করছি। যখন বাড়ীটা তৈরী হয়ে যাবে তখন আমিই বা কি পাবো আর আপনিই বা কি পাবেন? কনট্রাকটারকে যদি এতো পয়সা রোজগার করতে হয় তো বলো কাকে কার দরকার। আমি আপনি যেমন মজতুর, কনট্রাকটারও তেমনি। যদি ওরা নাও থাকে তবে যে গাধাদের কাজের দরকার তাদের আমাদের কাছেই আসতে হবে, আমরা যারা কাজ জানি আর মাথার ঘাম পায়ে ফেলে কাজ করি। তাই ঐ কুকুরের বাচ্চা আমায় ভয় পাবে!

শুধু এটাই নয়, পোতরাজুর সব কটা যুক্তিই এই ধরনের।

কিন্তু ওর মালিক তুনিয়াটাকে ওর চেয়ে বেশি দেখেছে। সে পোতরাজুর নীতি জেনে তার সঙ্গে একটা লোক দিয়েছে পোতরাজুকে খুশি রাখার জন্যে। চা চাইলে চা, জলখাবার চাইলে জলখাবার, সিগ্রেট খেলে সিগ্রেট, সঙ্গে সঙ্গে এনে দেয়। যখনই আসে

তখনই ছোট-বড় সবারই সামনে পোতরাজুর আর তার কাজের অজস্র প্রশংসা করে।

একবার বাংলোর ওপরের স্কাই-লাইটের ডিজাইন তৈরী করতে করতে সে খাওয়াদাওয়া ভুলে গিয়েছিলো। পোতরাজূর এক রক্ষিতা আছে, খুব চালাক। একবার সে বলেছিলো, 'আচ্ছা মিস্ত্রি, বলো তো তোমার এই চা, জলখাবার, সিগ্রেট তুমি কি করে পাও! তুমি কি জানো?'

'এই চা, জলখাবারের জন্যে আমি এইসব কাজ করছি নাকি। এই কথা যে ভাবে সে যত পাগল, তুমিও সেইরকম নির্বোধ, বোকা বেশ্যা।' এই বলে সে সিগ্রেটে টান দিয়ে তার মুখে ধোঁয়া ছাড়ে।

'মিস্ত্রিকে যে রেট দেয়, সেই রেট হিসেবে আমিও কাজ করে দেখাতে পারি। যদি ইচ্ছে করি তো তার চেয়ে ভালো কাজ করে দেখাতে পারি। আসলে আমার কাজের দাম বুঝে, পয়সা দেবার মত গাধা কেউ নেই। তাই আমি কি করতে পারি— নিজের কারিকুরী গোপনও রাখতে পারি, কিন্তু কালকে যে কুকুররা এই ইমারত দেখতে আসবে, তারা এদেব কঞ্জুষী দেখতে পাবে না, দেখতে পাবে আমার কারিগরী কাজ।'

কাজ যে করে আর যে করায় — এই দুয়ের মধ্যে এটাই তফাৎ।

এই যে ইমারতটা, কালকে এটাকে লজিং হাউস করে দিতে পারি। যদি তুমি কালকে বলো যে সবায়ের চেয়ে আটআনা বেশি দেবো, আমাকে এক রাত্তির এখানে শুতে দিন, তাহলে যতদিন তুমি মজুরী করবে ততদিন তুমি যদি বাবুজীকে তোমার ওজনের সমান পয়সা দাও তো তোমাকে ওখানে পা রাখতে দেবে না।

ওর জিনিস ও তোমার কাছ থেকে লুকিয়ে রাখতে পারে কিন্তু

তুমি তোমার জিনিস ওর কাছ থেকে লুকিয়ে রাখতে পারবে না। যারা খেটে খায় তাদের এই যা এক অসুবিধে।

এইভাবে রক্ত জল করে পোতরাজু তাড়াতাড়ি কাজ করে দেয়। কনট্রাকটারকে ছুটিয়ে, মিস্ত্রিদের বুঝিয়ে-শুনিয়ে বার বার তাদের কাজের প্রশংসা করে দিনরাত হাড়ভাঙা খাটুনি খাটলো। বসন্ত-পঞ্চমীর সময় সন্দেহ ছিলো কাজটা সময়মত শেষ হবে কিনা। কিন্তু সারা লজ সংক্রান্তির মধ্যে তৈরী করে দিয়ে তার গৃহপ্রবেশ করিয়ে তবে ছাড়লো।

যেমন তেমন কাজ নয়, সারা সহরে বাড়ীটার যথেষ্ট প্রশংসা হ'লো। মোজেক-করা ফ্লোর, ভার্নিস পেন্টের চুনকাম, তাতে এনামেল কোটিং, রঙবেরঙের দেওয়াল, খোদাইকরা শ্বেতপাথরের মূর্তি, গামলায় নানা রঙের ফুলের গাছ, গোদরেজের ফার্নিচার, ইউ ফোম গদি, পোর্সিলিনের গামলা, রঙবেরঙের আলো, ছাতে ফুলের বাগান — এই নিয়ে কিছুদিন ধরে বেশ একটা আলোড়ন চললো।

পরে সব পাড়ায় একটা করে লজিং হাউস তৈরী হয়ে গেলো। সম্প্রতি মালিক মারা যাওয়ায় দেখাশোনার সব ভার মুন্সীর ওপর আর বিলিব্যবস্থার ভার শালার হাতে এলো। কিন্তু পুরোনো আদল এত তাড়াতাড়ি কাটবে কি করে? বিজনেস একেবারে ঢিলে পড়ে নি।

দেবুভূর চিন্তা আবার সেই জুটিটিকে নিয়ে। বিজনেস এখনও খুব ভালো হচ্ছে কিনা, তাই মুন্সী এত রোয়াব দেখাচ্ছে। বেচারা ছোকরা যতদূর সম্ভব সেজেগুজেই এসেছিলো। কালো প্যান্ট, তার চেয়ে কালো জুতো, সাদা টেরিলিনের শার্ট আর জামার ওপর দিয়ে ঘড়ি-পরা। চুলও বেশ কায়দা করে আঁচড়েছিলো।

সাজগোজে কোনো ত্রুটি ছিলো না। কিন্তু অন্য কোথাও ত্রুটি থেকে গেছিলো। দু'টোর মধ্যে শুধু একটা চোখ ঠিক থাকা সত্ত্বেও মুন্সী মুহূর্তের মধ্যে সেটা আঁচ করতে পেরেছিলো।

সঙ্গের মেয়েটিও সত্যযুগের মনে হয়। খুব বেশি যদি হয় বছর ষোলো বয়স হবে। কিন্তু তার শাড়ী, টিপ. গয়নাগাটি— কোনোটাই এ যুগের নয়।

সে বোধহয় কখনও এই ধরনের জমকালো কাপড়-জামা পরে নি। দেবুভূর মনে পড়ে, পেদ্দম্মী আর অপ্পায়ম্মা বিয়ের সময় আর শ্বশুরবাড়ী যাবার সময় এই ধরনের সাজগোজ করেছিলো।

পেদ্দম্মী না জানি কার ওপর কর্তৃত্ব করছে আর অপ্পায়ম্মা তো এই দুনিয়ায় নেই।

যে দু'জন এখন তার চোখের সামনে নেই— তাদের কথা ভেবে দেবুভূ এতো ভেঙে পড়লো যেন দুটো লোহার হাত তাকে দু'দিক থেকে চেপে ধরেছে।

না জানি আমরা কোন মুহূর্তে জন্মেছি, নিজের ঘরদোর ছেড়ে যে স্ত্রীলোক আমাদের ঘর করতে এসেছে তাদের বিন্দুমাত্র সুখ দিতে আমরা অক্ষম। অপ্পায়ম্মাকে সেও বেশ কষ্ট দিয়েছে।

ছোটবেলায় খানিকটা না-জেনে-শুনে আর খানিকটা গোঁ করে সে কথায় কথায় তাকে মারতো— 'হ্যাঁ' বললেও বকুনি, 'না' বললেও বকুনি, দাঁড়িয়ে থাকলেও রাগ করতো. বসে থাকলে আরো বেশি রাগ করতো।

একটু যখন বড় হ'লো, তখন সংসারের খরচাও বেড়ে গেলো, আয় কম, যে চার পয়সা কামাতো তাও মদ খেয়ে উড়িয়ে দিতো। কখনও আত্মীয়-স্বজন, কখনও অতিথি-অভ্যাগত, কখনও পথে-ঘাটে

ঝগড়া-ঝাঁটি, কখনও আরো অন্য কোন বিপদ-আপদ, কখনও বা নিজের অসুখ, কখনও আনন্দ, কখনও দুঃখ, কখনও পালা-পার্বণ, কখনও পূর্ণিমা— এই সব কিছু যে মুখ বুজে সহ্য করতো তাকেই সে হাতের কাছে যা পেতো তাই নিয়ে মারধোর করার জন্যে তেড়ে যেতো।

বুড়ো-বুড়ী যদি বাধা না দিতো তা হলে অনেক আগেই সে অক্কা পেতো।

অনেকদিন বাদে তার পরিবর্তন ঘটলো— কবে ঘটলো, কী করে ঘটলো, তা সে নিজেই জানে না।

এক বছরের তফাতে মা-বাবা দু'জনেই মারা গেলো। ওরা মারা যাবার আগে একবার অসুখে পড়েছিলো। তার পরের বছর লোকেরা বললো পেদ্দম্মী পাতকুয়োয় ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করেছে। শ্বশুরবাড়ীর লোকেরা আর তার শত্রুরা প্রচার করে বেড়ালো যে তাকে কেউ ভাগিয়ে নিয়ে গেছে। তারপর অপ্পায়ম্মা অসুস্থ হয়ে পড়লো। সব কিছুই চার-পাঁচ বছরের মধ্যে ঘটে গেলো।

এই সবের পর সে তাকে বকেছে নিশ্চয়ই, কিন্তু মারে নি। যখন অপ্পায়ম্মার বয়স পঁয়ত্রিশ আর তার নিজের চল্লিশের ওপর তখনই জীবনে যা একটু সুখ পেয়েছে; সারা জীবনে ঐটুকু সুখই তার মিলেছে।

সে সুখও অসম্পূর্ণ থেকে গেলো।

দ্বিতীয়বার অসুস্থ হয়ে মারা যাবার আগে কেবল একবারই সে সহবাস করে। সহবাসের পর অপ্পায়ম্মা বলে, 'আমার এক বাসনা আছে। সেটা যদি পূর্ণ হয়ে যায় তো মরে গেলেও আমার কোনো দুঃখ নেই।' কথাগুলো সে খুব আস্তে আস্তে নিজের মনে বলে।

কুঁড়ে ঘরে পর্দার ওপাশে ছোট্ট ল্যাম্পটা টিম্‌টিম্ করে জ্বলছে। ল্যাম্পটা এমনিতেই ছোট, সুবিধে হবে বলে অপ্পায়ম্মা ওর পলতেটাকে আরো ছোট করে দিয়েছিলো। দেবুড়ু তার মুখ দেখতে পাচ্ছিলো না। কিন্তু চোখ দুটো জ্বল জ্বল করছিলো।

'কি রে।' দেবুড়ু যখন পাশ ফিরলো তখন মাটিতে রাখা বাসনগুলো ঝন্‌ঝন্ করে উঠলো। এই রকম সময় একটু আওয়াজ হলে অপ্পায়ম্মা ভীষণ ভয় পেয়ে যেতো। তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে ছেঁড়া পর্দার অন্যদিকে তাকিয়ে দেখলো। ভাগ্যি ভালো, ছেলে-পুলেরা কেউ ওঠে নি।

'কাল বলবো।' বলে সে উঠে পড়ে

চুল উস্কোখুস্কো হয়ে গেছে কিন্তু খোঁপা খোলে নি। ঘামে ভিজে গেছে কিন্তু কপালের টিপ নষ্ট হয় নি। মুখ মোছায় চোখের কাজল যা একটু ছড়িয়ে গেছে।

মুখে আঁচলটা চেপে সে যখন নিজের গায়ের ভেতরের জামাটা পরছিলো তখন দেবুড়ু তার বাঁ হাতটা ধরে নিজের কাছে টেনে নেয়। 'ছাড়ো না,' বলে সে ধপাস করে মাটিতে বসে পড়লো। সে মানতে চাইলো না কিন্তু তার কোমরে নিশ্চয়ই লেগেছিলো।

বার বার জিজ্ঞেস করাতে অবশেষে বললো, 'বাইরে এসো, বলছি।' বলে সে তার কোল থেকে উঠে বাইরে চলে গেলো।

সেদিনকার জ্যোৎস্না আজকের মতো স্নিগ্ধ নয়। সারা জগৎ ঘুমে বিভোর।

কুঁড়ে ঘরের ভেতরে আলোটা বাড়িয়ে দিয়ে, যে পর্দাটা কাজ-চালানোর জন্যে এতোক্ষণ টাঙিয়ে রাখা হয়েছিলো সেটাকে সরিয়ে দিয়ে দেবুড়ুর জন্যে বাইরে আর নিজের জন্যে ভেতরে বিছানা

করে নিলো। বাচ্ছাদের গায়ে যে ছেঁড়া চাদরটা ছিলো সেটা ঠিক করে দিয়ে সে ঘরের দোরগোড়ায় এসে আরাম করে বসলো।

তারা ঘর বেঁধেছে কুড়ি বছরের ওপর। মা-বাবা তু'জনেই একে একে মারা গেছে। বুড়ো বাপ যে কোণেতে বিছানা বিছিয়ে শুতো, সে কোণ খালি পড়ে আছে। ঐ সিঁড়ির তলার কোণটা একটা খাট পাতার পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু বাবার খাট তার সঙ্গেই গেছে। এখন দেবুভূ মেঝেতে শোয়।

তা সত্ত্বেও চট-পাতা বিছানায় আরাম করে পা ছড়িয়ে ছেঁড়া শাড়ীটা চাদরের মতো করে গায়ে দিয়ে দেবুভূ শুয়েছে আর তার মাথার কাছে দরজায় ঠেসান দিয়ে বসে অপ্পায়ম্মা কথা বলছে। হাল্কা মিষ্টি ঘুমের আমেজে দেবুভূর মনটা উড়ে চলেছে। তার মনে হয় জীবনে এ ছাড়া আর কি আছে। কিন্তু এতো সুখের দিন তার জীবনে কখনও-সখনও আসে।

অপ্পায়ম্মা ছারপোকার কামড়ে পিঠ চুলকোতে থাকে। দেবুভূ বলে, 'এইবার বলো'— বলে সে তার দিকে ঝুঁকে পড়ে।

খানিকক্ষণ ছারপোকার বাহানা দিয়ে হেসে হেসে কথাটা ঘোরাবার চেষ্টা করে। কিন্তু তার পরে দ্বিধা সঙ্কোচ ছেড়ে উদাসভাবে বলে,

'এক মুহূর্তের জন্যেও তোমার থেকে আলাদা না হয়ে একবার সারারাত তোমার সঙ্গে শোয়ার ইচ্ছে করে।' অর্ধেকটা কথা দেবুভূ মন দিয়ে শোনে আর বাকীটা সে না শুনেই বুঝে নেয়। এই সব কথার মাঝখানে তার সারা শরীরে একটা বিদ্যুতের শিহরণ খেলে যায়। আর তার চোখের সামনে অনেক ছবি ভেসে ওঠে।

যেদিন থেকে অপ্পায়ম্মা বিয়ে হয়ে দেবুভূর বাড়ী এসেছে সেদিন থেকেই তারা একটা ঘরওয়ালা কুঁড়েতেই আছে। তিনরাত্তির

একসঙ্গে থাকার পর আর কোনোদিন তারা জানতে পারলো না একসঙ্গে একান্তে থাকা কাকে বলে।

আগে ভাইবোন মিলে দশজন ছিলো। তারপর এদের সকলের বাচ্চা হয়ে এখন আরো দশজন বেড়ে গেছে।

ঐ ছোট কুঁড়ের মধ্যে তিন-চারটে জুটি একের পর এক কোনো-মতে কাজ সারতো। এমনও দিন গেছে একটা খাটের তলায় আর-একটা খাট পেতে, আশেপাশে বিছানা পেতে সবাই শুতো কারণ সব সময় বাড়ীতে কারুর জন্ম, কারুর অসুখ, আর কিছু না হলেও ছোট ছেলেপুলেদের চেঁচামেচি। এমন অনেক দিন ও রাত কেটেছে যখন চারপাশে সব শক্ত শক্ত অসুখ, কুঁড়েতে চারদিকে জল থৈ থৈ করছে, কাদা প্যাচ প্যাচ করছে, কোথাও বসবার জায়গা নেই, কাপড় পাল্টাবার একটাও কাপড় নেই।

গায়ে কাপড় আছে কি নেই, তা চিন্তা না করেই সব ঘুমিয়ে পড়তো আর মাঝে মাঝে উঠে চুপচাপ আলোটা নিবিয়ে দিয়ে কিংবা প্রয়োজনবোধে খুব ঢিমে করে চটের পর্দার আড়ালে, শরকাঠির দেওয়ালের পেছনে, খাটের পাশে ভয়ে ভয়ে— অন্য কারো সঙ্গে কোনো ভুল কাজ করছি সেই ধরনের মনোভাব নিয়ে— সব বিরূপ ভাবকে দমন করে— অর্ধেক কামনা আর অর্ধেক আনন্দের সঙ্গে, মশা আর মাছির উপদ্রব সহ্য করে— বাচ্চাদের নোংরামি আর বড়দের রাগকে উপেক্ষা করে— দুর্গন্ধের মধ্যেই তারা জীবনযাপন করে এসেছে।

দেবুভূ কোনোদিন চিন্তাও করে নি যে, যে অপ্পায়ম্মার মন বলে কিছু একটা আছে। ওরও কামনা-বাসনা আছে।

বড় বড় বাড়ী যখন তৈরী হ'তো আপ্পায়ম্মা তাদের সামনে

দাঁড়িয়ে দেখতো। বড় বড় প্রাসাদগুলো দেখতে দেখতে ভাবতো কত বড় বড় বাড়ী। একবার একটা বড় বাড়ীতে চুনকাম করতে গেছিলো, তারপর দশ-পনেরো দিন ধরে শুধু সেই বাড়ীর কথাই বলেছে। বাড়ীতে কতগুলো ঘর, সেগুলো কিভাবে সাজানো, রেশমের মোলায়েম গদী, খুব সুন্দর সুন্দর সব সোফা সেট, এই সব জিনিস পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন যারা করে তারা যে কত সাবধানে সব কাজ করে তারই কথা ভেবে বার বার তাদের তারিফ করেছে।

আর-একবার একটা বড় বাড়ী দেখে সে বলেছিলো, এতো বড় বাড়ী, স্বামী-স্ত্রী আর তাঁদের ছু'টো বাচ্চা ছাড়া থাকার কেউ নেই।

যে বাড়ীতে কেউ থাকে না, সব সময় তালা ঝোলানো থাকে সে বাড়ী সম্বন্ধে সম্ভবত সে কিছু বলে নি। ও বোধহয় ভেবেছিলো ছু'টো ঘরওয়ালা বাড়ী তৈরী করাটা বড় রকমের স্বপ্ন। তাই সেই চিন্তা করাটাও সে ছেড়ে দিয়েছে। এখন শুধু তার একটাই আকাঙ্খা।

দেবুভূ তার ইচ্ছে পূরণ করার জন্যে উপায় খুঁজতে থাকে। কিন্তু অনেক ভেবেচিন্তেও কোনো পথ ঠিক করতে পারে না। কিছুদিন এই আশা নিয়ে তার কাটলো যে একদিন-না-একদিন সুযোগ তার মিলবেই। কিন্তু ইতিমধ্যে একদিন অপ্পায়ম্মা শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলো, চলে গেলো সব ইচ্ছের উর্ধ্বে।

দেবুভূর চোখে জল ভরে এলো কিনা বোঝা গেল না। অপ্পায়ম্মার জন্যে সে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো। 'দারিদ্র্যের চেয়ে খারাপ জিনিস পৃথিবীতে আর নেই।' অপ্পায়ম্মার কথা চিন্তা করে সে ভাবে, 'দারিদ্র্যের চেয়ে খারাপ জিনিস এই ছুনিয়ায় আর কিছু নেই'; দেবুভূ ঐ জুটির কথা চিন্তা করে আবার একই কথা ভাবে।

হাঁটতে হাঁটতে দেবুভূ এখন বড় রাস্তায় এসে পড়ে।

বাজারের রাস্তার ছু'দিকের বাড়ীগুলোকে মনে হয় যেন খুব খেয়ে-দেয়ে আরাম করছে এমন সব ভূতেদের দল। জ্যোৎস্না যেন শুকোতে দেওয়া সুজির মতো। নির্মল আকাশে চাঁদ ঝলমল করছে।

রোজকার মতো সহরের তিনটে থিয়েটারের ভীড় মাঝের চকে খাবারের দোকানগুলোতে জড়ো হচ্ছে। দোকানগুলোর পেট্রোম্যাক্স ল্যাম্পের আলোর সামনে জোৎস্না আর ইলেকট্রিকের আলো ম্লান মনে হয়। এই সোরগোলের মধ্যে লোকেরা আলোর ছায়ার মতো এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে। ক্লান্ত রিক্সাওয়ালারা এদিক ওদিক ঘুরে আবার লাইনে গিয়ে দাঁড়াচ্ছে।

অনেক চেষ্টা করেও নূকরাজু কোথাও কিছু পেলো না। তখন সে দক্ষিণ দিকে হাঁটতে আরম্ভ করলো। জানি না বেরোবার আগে তার মনে কি চিন্তা ছিলো। কিন্তু বেরিয়ে পড়ার এই পৃথিবী আর মানবজাতির প্রতি আক্রোশ যেন ফেটে পড়তে থাকে।

তার জীবনে আগেও ছ'বার এই ধরনের অভিজ্ঞতা হয়েছে।

একবার নেহেরুর জন্মদিনে খেলাধূলার প্রতিযোগিতা হয়েছিলো। সে সময় ও ক্লাশ সেভেনে পড়তো। যে মাস্টার ওকে আঁকতে শেখাতেন তিনি ছিলেন খুব ভালো লোক। নূকরাজু আর ছুটো ছেলেকে তিনি ছবি আঁকার প্রতিযোগিতায় নিয়ে যান। প্রতি-যোগিতায় অংশ নিয়েছিলো অধিকাংশই অফিসারদের ছেলে, পয়সাওয়ালা ঘরের ছুলালরা। ছবি আঁকায় প্রথম পুরস্কার পায় নূকরাজু।

অনুষ্ঠান সুরু হবার আগে যে সব ছেলেমেয়েরা পুরস্কার পাবে তাদের প্রথম লাইনে দাঁড় করানো হ'লো। টেরিলিন সার্টের মধ্যে,

নাইলন মোজার লাইনে, মাখনের মতো মোলায়েম, মোমের পুতুলের মতো দেখতে বাচ্চাদের মধ্যে শ্যামবর্ণ ছেলে, ময়লা প্যাণ্ট আর রঙ-ওঠা ধারিওয়ালা পুরোনো প্যাণ্ট পরে নূকরাজু তাদের মাঝে দাঁড়িয়ে। ওর নিজেরই দৃষ্টিকটু লাগছিলো। সে লাইন ছেড়ে বেরিয়ে আসতে চেয়েছিলো কিন্তু মাস্টারমশায় আসতে দিলেন না।

পুরস্কার বিতরণ সুরু হ'লো। আজ তার মনে নেই সভাপতি কে ছিলো। শুধু মনে আছে যে একজন হোমরা-চোমরা লোক।

যে সব বাচ্চারা পুরস্কার পেয়েছে তাদের মধ্যে কারুর কারুর সঙ্গে সে ছবি তোলাচ্ছিলো। পুরস্কার দেওয়ার আগে ও পরে সে তাদের সঙ্গে হ্যাণ্ড-শেক করছিলো।

নূকরাজুর পালা এলো। তার স্টেজে ওঠার আগে অধ্যক্ষমশায় কারুর সঙ্গে কিছু কথা বলছিলেন আর সেই ভদ্রলোক উত্তর দিচ্ছিলেন। পুরস্কারটা হাতে নিয়ে উৎফুল্ল হয়ে অধ্যক্ষের দিকে তাকালো। অধ্যক্ষের চেহারা হঠাৎ কি রকম বিবর্ণ হয়ে গেলো। নূকরাজু শেক-হ্যাণ্ড করার জন্যে হাত বাড়িয়ে ছিলো। হাতটা পিছু টেনে নিল যেন কোনো ভুল কাজ করেছে। তারপর সাহস সঞ্চয় করে আবার বাড়িয়ে দিলো হাতটা। অধ্যক্ষমশায় তার মনের এই দ্বিধা বুঝতে পারেন। উদার মহাপুরুষের মতন ভাব নিয়ে তিনি দাঁড়িয়ে থাকেন। যিনি নমস্কার করতে শেখান তিনি নমস্কার করে প্রতিনমস্কারের বদলে হেসে পরে পুরস্কারটা দেবার জন্যে হাত বাড়ান। এক বন্ধুর বাড়ীতে দ্বিতীয়বার এই ধরনের ঘটনা ঘটে।

সে তখন তাদের ফুলবল টিমের গোলকীপার। ক্যাপ্টেন ছিলো এক ব্রাহ্মণের ছেলে। একদিন খেলার শেষে দু'জনে গল্প করতে

করতে বাড়ীমুখো হ'লো। নিজের বাড়ীর ফটকের দরজায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ছেলেটি ওকে কিছু বলছিলো। নূকরাজুর ভীষণ তেষ্টা পায়। ছেলেটির ছোট ভাই পাশেই দাঁড়িয়ে ছিলো। ছেলেটি তাকে জল আনতে বললো।

এক মিনিট বাদেই ভেতর থেকে তার মার গলার আওয়াজ পাওয়া গেলো, 'জল কার জন্যে বাবা ?'

জল নূকরাজুর জন্যে জানতে পেরে চেঁচিয়ে বলেন, 'গেলাসটা ওখানে রেখে দে, ঘটিটায় করে নিয়ে যা।'

নূকরাজুর বন্ধু গল্প করছিলো। 'আবার দেখা হবে' বলে নূকরাজু হাঁটা দিলো। পেছনে থেকে 'জল', 'জল' বলে অনেক চেঁচামেচি করা সত্ত্বেও সে একবারও ফিরে তাকালো না।

প্রথম ঘটনাটা ঘটেছিলো অনেক শৈশবে, তার মনে অতটা রেখাপাত করতে পারে নি। একটু বড় হবার পর দ্বিতীয় ঘটনাটা ঘটে, তাতেও সে বিশেষ বিচলিত হয় নি। কিন্তু এখন যেটা ঘটলো, অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও সে সেটা মেনে নিতে পারছে না।

কুঁড়ে ঘরে জন্মালেও তার আলাপ-পরিচয় ও সম্পর্ক সব সময়ই বাংলো বাড়ীর লোকেদের সঙ্গে। পড়াশোনায় মাঝপথে বাধা এলেও এই বছর কিংবা আসছে বছর সে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেবে। তার বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে ক্লাব ও 'সৎসঙ্গে'র সদস্য ছাড়াও আরো অনেকে আছে ভবিষ্যতে যারা নামকরা গুণ্ডা হবে, স্থানীয় রাজনীতিজ্ঞ, হোটেলের প্রোপাইটার, সিনেমার মালিকের ছেলে। ফ্যাকটরীতে যে চাকরিটা সে করে তা ছোট কিন্তু ভালো।

স্ত্রীজাতির প্রতি তার একটা শ্রদ্ধার ভাব আছে। ভারতমাতার নাম শুনলে তার শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠে। গান্ধী ও নেহেরুকে

সে দেবতার মতো মনে করে। নেহেরু, জন কেনেড়ি ও নিকিতা ক্রুশ্চেভের ছয় হাতের তিনটি জুড়ীর আলাদা আলাদা সঞ্চালনের দৃশ্য সে কোনো দিন ভুলতে পারে না।

নূকরাজু সঙ্গীতের ভীষণ অনুরাগী। নিজের হাতখরচের তিন ভাগই সে সিনেমা দেখায় খরচ করে ফেলে। নূকরাজুর এই স্বভাব দেখে পাড়া-পড়শীরা যত আনন্দিত হত, তার মা ঠিক ততটাই আশঙ্কিত হয়ে পড়ে। ওর বাবা ঐ বয়সে খুব মদ খেতো। পঞ্চাশ বছর বয়সে তার মারা যাবার একমাত্র কারণই হ'লো এই নেশা। নূকরাজুর দুই দাদা তাদের বাপের মতো অতটা না খেলেও একটু-আধটু খেতো। কিন্তু নূকরাজুর ওদিকে ঝোঁক নেই দেখে তার মার একটু আশ্চর্যই লাগতো।

ইতিমধ্যে পাকিস্তান, ভারত আক্রমণ করলো। নূকরাজু ক্ষেপে উঠলো। সে রক্তদান, শ্রমদান ও শেষে প্রাণদান করতে এগিয়ে গেলো।

মা একেবারে আশ্চর্য হয়ে গেলো। চোখের জল ফেলতে ফেলতে তার মা প্রতিজ্ঞা করে 'বসলো যে এবার আত্মহত্যা করবে। শেষে নূকরাজু যখন হোম গার্ডে ভর্তি হতে চাইলো তখন তার মা রাজী হ'লো। তারপর নিজের সেজমামার মেয়ে মুনয়ালূর সঙ্গে নূকরাজুর বিয়ে দিয়ে সোয়াস্তির নিশ্বাস ফেললো।

নূকরাজু প্রথমে গাঁয়ের মেয়েকে বিয়ে করতে রাজী ছিলো না। কিন্তু মেয়েকে দেখে, বিশেষ করে তার ডাগর চোখ দেখে সে আর বিশেষ আপত্তি করলো না। বিয়ের ছ মাস পরেই অম্মভু বেশ বড় হয়ে উঠলো। তারপর গৌর্ণার জন্যে আরো ছমাস অপেক্ষা করতে হ'লো।

ইতিমধ্যে পাকিস্তানের লড়াই বন্ধ হয়ে গেছে। হোমগার্ড হবার পর দেশপ্রেম সম্বন্ধে ওর যে ধারণা ছিলো তা পাল্টে গেলো। এখন শুধু ডিউটিতে যাওয়া, বাড়ী ফিরে আসা আর অবসর সময়ে পত্র-পত্রিকা পড়া— এই তার নিত্যকার কাজ। এখন ক্লাবে যাওয়াও বন্ধ হয়ে গেছে। রাতের টিউটোরিয়াল কলেজে পড়ার পরিকল্পনা পয়সার অভাবে শুধু কল্পনারই রয়ে গেলো.

তিন মাস হ'লো তার গৌণা হয়েছে। সেই রাত থেকে— সত্যি করে বলতে কি তার আগেই— কটা দিন আর রাত সে শুধু একটা সুখের কল্পনাতেই কাটিয়ে দেয় আর তা হচ্ছে— অপ্সরা হোটেলের ছ'তলার ঘরে না হ'লেও যে কোনো একটা মামুলি লজিং-হাউসের একটা কোণের ঘরেই না হয়— অম্মভূর সঙ্গে একটা রাত।

এরই জন্যে তিন মাস ধরে সে তার নিজের ছোটোখাটো প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো বাদ দিয়ে পয়সা জমিয়েছে। তিন দিন ধরে অম্মভূকে অনেক বুঝিয়ে সুজিয়ে রাজী করিয়েছে। বড়দের অনেক সত্যিমিথ্যে বলে তাদের একরাতের অনুপস্থিতি ক্ষমা করার জন্যে রাজী করিয়েছে। এতসব করার পরও ফল ওই হ'লো।

গাঁয়ের এক কোণে বটগাছের তলায় মিউনিসিপ্যালিটি হাসপাতালের কাছাকাছি পৌঁছোনোর পর নূকরাজুর সম্বিত ফিরে আসে। চমকে উঠে পাশ ফিরে দেখে অম্মভূ তার পাশেই আছে।

এই সময়ে এই সব জায়গায় স্ত্রী-পুরুষকে একসঙ্গে দেখলে রিক্সাওয়ালারা ঘন্টি বাজায়। প্রথমে সে রেগে ওঠে, পরে বুঝতে পারে ওতে রিক্সাওয়ালার কোনো দোষ নেই। পরে নিজেই রিক্সাতে উঠে বসে।

অম্মভূর গা ঘেঁষে বসবার পর নূকরাজুর পুরো হুঁশ ফিরে আসে।

পেছন দিয়ে ঠেসান দিয়ে বসে বলে, 'ভেঙ্কটেশ্বর টকিজে চলো।'

প্যালেসেও হাউস্ ফুল্ শুধু ভেঙ্কটেশ্বর টকিজ কেন, কণকদূর্গাও।

এক মুহূর্তের জন্যে নূকরাজুর ক্রোধের সীমা থাকে না। কিন্তু রাগ কার ওপর—

'ক্ষিদে পেয়েছে,' অম্মভূকে বলে।

সব লোম খাড়া ক'রে ভালো ক'রে ওকে দেখে নিয়ে অম্মভূ বলে, 'আচ্ছা।'

আবার বুঝিয়ে বলে, 'তুমি যদি চাও তো খেয়ে নাও।'

অম্মভূর চোখে আর্দ্রতা আর চোখে-মুখে ব্যগ্রতা। দেখে নূকরাজুর মন বিচলিত হয়ে ওঠে।

গ্যাসলাইট চকমক করছে ওপ্ন-এয়ার হোটেলের।

'চলো।' বলে সেই দিকে এগিয়ে যায়।

বাসনা ছিল যদি সম্ভব হয় তো উডিপি শ্রীকৃষ্ণবিলাসে এয়ার-কণ্ডিশন ঘরেতে পতি-পত্নী একান্তে বসে খাবে। আর শেষ পর্যন্ত কনকদূর্গা টী স্টলে, নোংরা নালার ধারে, ভাঙচোরা টেরাবেঁকা প্লেটে ওরা জলখাবার খাচ্ছে। বসেছে ধুলোপড়া বেঞ্চিতে, যা ওখানকার একমাত্র বসার জায়গা— জলে ভিজে, রোদে পুড়ে চিড়-খাওয়া ভাঙচোরা পুরোনো টেবিলে যেটা প্রথম শোয়ের লোকেদের খেয়ে যাওয়ার পর জল আর কাদায় ভরা।

একটু দূরে তিন-কাপ চাকে ছ-কাপে ভাগ করে খাচ্ছে কিছু বেকার। এদের দেখে খুব জোরে হেসে ওঠে। কোনো এক ছুতোয় ওদের সঙ্গে ঝগড়া বাধিয়ে জনা দু-তিনকে কিল চড় মারার জন্য নূকরাজুর হাত নিস্‌পিস্ করতে থাকে।

বিল মিটিয়ে বাইরে এসে দাঁড়ায়। বেরোবার সময় ইচ্ছে ক'রে

নূকরাজু ওদের পাশ দিয়ে বেরোয়। 'আসতে দাও হারামজাদাদের ··· তু' একটা তো খতম হয়ে যাবে।' মনে মনে ভাবতে ভাবতে সে এগিয়ে যায়। জানি না কেন লোকগুলো এ জুটির পেছু নিল না।

স্নিগ্ধ জ্যোৎস্না ঠিক রূপোর পাতের মতো। রাস্তার তু'ধারের বাড়ীগুলো যেন ঘুমিয়ে পড়েছে। রাস্তায় নূকরাজু, পিছু পিছু অম্মভূ ছায়ার মতো চলেছে।

এক জায়গায় একটা ছোট দাওয়ায় বেশ কিছু লোক ঘুমোচ্ছে। আর-এক জায়গায় ফুটপাতের ওপর কাতারে কাতারে লোক শুয়ে আছে। সামনের বাড়ীতে এখনও আলো জ্বলছে। নর্দমার ওপরে বসে একটা ভিখিরী ও একটা ভিখিরিণী কথা বলছিলো— এখন চুপ হয়ে গেলো।

'এদের কোনো ঘরবাড়ী নেই, জানি না কি করে বেঁচে থাকে।'

'এইভাবে কুকুরদের মতো।'

নূকরাজু নিজের মনেই চমকে ওঠে।

হাজার হাজার লোক এই শহরে বেঁচে আছে— গাছের তলায় সপরিবারে থাকে, একধারে রান্না করে— বৃষ্টি হলে পাশের ঢাকা বারান্দায় উঠে পড়ে, হাড়কাঁপানো শীতে, মুষলধারে বৃষ্টিতে আর কাঠ-ফাটা রোদে যেখানে একবিন্দু ছায়া নেই— তার মধ্যে এই সব মানুষগুলো ছটফট করছে। ··· 'চলো চলো, দূর হও, এখান থেকে হটো,' বলে লোকেরা এদের কুকুরদের মতো উৎখাত করে। কাদায় নোংরায় আর অন্ধকারে জীবনধারণ করছে একগাদা প্রাণী! গায়ে দেবার চাদর আর পাড়াপড়শীর ক্রুদ্ধ দৃষ্টি ছাড়া নিজেদের ঢেকে রাখবার আর কোনো জিনিস এদের নেই, এই সব পরিবারকে অন্ধকার প্রতিপালন করছে।

নূকরাজুর দয়া হয় না, ক্রোধ হয়। কোনো একটা ছবিতে সে নোংরামি, হিংসে আর অত্যাচারের বিরুদ্ধে লোকেদের বিদ্রোহ করতে দেখেছে। কিন্তু এরা এইভাবে পড়ে থাকবে। শূয়োর কাদা ছেড়ে পালাবে কি করে? নূকরাজু মনে মনে ভাবে।

ঐ রাস্তা দিয়ে একটা লরী খুব জোরে চলে যায়। একটা ফ্যাসনেবল গাড়ী মোড় ঘুরে আস্তে আস্তে চলে গেলো। তাতে সাদা শাড়ী আর লাল ব্লাউজ-পরা একটা ফর্সা মেয়ে কোলে হাত-রেখে বসে আছে। ওর কালো চুলে সাদা মুক্তোর মালা। নিশ্চয়ই ওরা লজে যাচ্ছে, নয়তো লজ থেকে ফিরছে।

দূর থেকে দেখলে তিনটে সিনেমাহলকে একটা উনুনের তিনটে চুলো বলে মনে হয়। নূকরাজু যখন ওখানে গিয়ে পৌঁছোলো, তখন চাঁদ মধ্য গগনে, জ্যোৎস্না ছড়িয়ে দিচ্ছে। এটা নূকরাজুর নিজের গ্রাম না হলেও সিনেমা-থিয়েটার নূকরাজুর কাছে নতুন কিছু নয়। এই তিনটে সিনেমায় সারাক্ষণ লোকের ভীড় লেগেই আছে। পরনে ময়লা কাপড়ের দিকে ওদের কোনো খেয়াল নেই, গা দিয়ে অনর্গল ঘাম ঝরছে, সেদিকে কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই, ছার-পোকার কামড়ে ওদের কোনো চাঞ্চল্য নেই। নিশ্বাসের সঙ্গে যে দুর্গন্ধ ভেতরে যায় তাতেও এরা বিচলিত হয় না।

সামনের পর্দায় বড় বড় বাড়ী— সামনের ছবিগুলোর মতো একেবারে ফাঁপা; অট্টালিকায় সুন্দর সুন্দর সব মেয়েদের মুখভঙ্গি— মেক-আপ না করলে ঐ সব রূপসীদের ওদের স্বামীর ঠাকুমা-দিদিমার মতো দেখাবে; ওদের মুখে মিষ্টি গান— সবাই জানে যে ওরা গাইছে না, তবুও সবাই একটা ভ্রান্তির মধ্যে থাকে, অবাস্তব কথা ও মিথ্যে মায়ামমতা—

পর্দায় যা সব দেখানো হচ্ছে সবই মিথ্যে। মিথ্যে এই সব জিনিসগুলো মিথ্যুকরা আরো অবাস্তব করে দেখায়। দর্শকরা সত্যিকারের বাস্তব অনুভূতি পায় না। এই পাবার ইচ্ছেটা যদি শুধু কল্পনাও হয় তো সেটা খুবই সাংঘাতিক।

বড়রা মিষ্টি কথায় যেন ছোটদের ভুলিয়ে রাখে, নেতারা জনতাকে যেমন মিথ্যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে ধোঁকা দেয়, ঠিক সেইভাবে কিছু লোক মায়ার জাল বুনে সরল প্রকৃতির লোকেদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে। জনতাও ধোঁকা খাবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে থাকে—তার জন্যে তারা ভোট দেয়, প্রয়োজন হলে কালোবাজারের দরে। তাহলে যারা ধোঁকা দেয় তাদের আর দোষ কি?

লোকের মন বলে কিছু নেই। জানছে এরা সত্যিকারের স্বামী-স্ত্রী নয়, এদের মিলনকুঞ্জ মিথ্যে, মিছিমিছিই একজন আর-একজনকে দেখছে ভালোবাসার নজর দিয়ে। লোকের মনই যদি থাকতো, তা হলে এ সব দেখে কি প্রলুব্ধ হ'তো, না শিষ দিতো?

যারা এই সব সিনেমা দেখে, যারা এই সব ফিল্ম তৈরী করে আর যারা তৈরী করায় আর যারা দেখায়— তাদের ওপর নূকরাজুর ক্রোধ যখন বাড়তে থাকে, ঠিক সেই সময় নূকরাজু চৌরঙ্গীতে এসে পোঁছোয়। দেবুভূও পোঁছোয় ঠিক একই সময়ে।

'এই মেয়ে, কোথা থেকে এসেছে?' দেবুভূ প্রশ্ন করে।

নূকরাজুর দিকে তাকিয়ে দেবুভূর মেয়েটিকেই বেশী মিশুকে মনে হয়।

অম্মভূ দেবুভূকে ঠিক চিনতে পারে না।

'কে?' জ্বলজ্বলে চোখ নিয়ে সে প্রশ্ন করে।

'তুমি ···কোন গাঁ থেকে এসেছো?'

নূকরাজুকে আড়চোখে দেখার চেষ্টা করে, কিন্তু সাহসে কুলোয় না।

'আমাদের গাঁয়ের নাম অনকাপল্লী।' এই বলে একটু সন্দিগ্ধ হয়ে জিজ্ঞেস করে, 'আপনার?'

এতক্ষণে নূকরাজু ওদের দিকে তাকায়। এতক্ষণে তার সম্বিৎ ফিরে এসেছে, কিন্তু দেবুভূকে সে চিনতে পারে না।

'আপনারা ঐ লজিং-এ এসেছিলেন না, আমি ঐ লজিং-এ কাজ করি।'

ওর দিকে তাকিয়ে থাকা নূকরাজুকে তার বলতে ইচ্ছে করে— 'আপনারা বোধ হয় ঘর পান নি' কিন্তু অভ্যেসবশত বলে ফেলে— 'এই মেয়েটি আপনার কে হয়?'

এই প্রশ্নের মধ্যে নূকরাজু কোনো সরল স্নেহের ছায়া দেখতে পেলো না, মনে হয় একটা সন্দেহের ছোবল আছে। একাক্ষী মুন্সীর মুখে নয়, চোখে যে প্রশ্নটা ছিলো, সেটা যেন সহস্রকণ্ঠে মুখরিত হয়ে উঠেছে।

'কি গো মেয়ে…' কথা তখনও শেষ হয় নি ; দেবুভূর গালে চটাং চটাং চাঁটির শব্দ পাওয়া গেলো।

'বেটা খান্‌কির ছেলে, আমার বৌয়ের সঙ্গে তোর কথা বলার কি দরকার পড়লো।' এই বলে নূকরাজু আরো উত্তেজিত হয়ে উঠে।

'দুম্ দাম, ধুপ্-ধাপ'—ডাঁইনে-বাঁয়ে কোথায় লাগছে সে সব না দেখে কাণ্ডজ্ঞানশূন্য হয়ে নূকরাজু দেবুভূকে বুটের বাড়ি আচ্ছা করে পিটোয়? দেবুভূ দূরে ছিটকে পড়ে, নূকরাজু তাকে শার্টের কলার ধরে আচ্ছা করে পিটোতে থাকে।

'খানকির ছেলে, মনে করেছিস কি, ভেবেছিস কি?'… এই বলে সে হাঁফাতে থাকে।

দোকানদাররা আর রিক্সাওয়ালারা কিছুক্ষণ অবাক হয়ে দেখতে থাকে। তারপর সবাই এসে জড় হয়।

মেয়েটা কাঁদো কাঁদো গলায় চিৎকার করে উঠে, 'ওরে বাবারে, বুড়ো লোকটাকে আমার স্বামী মেরে ফেললো। বুড়োটা যে মরে যাবে।' বলে সে থরথর করে কাঁপতে থাকে।

যারা এসে জড়ো হয়েছিলো তারা এবার দেবুভূকে নূকরাজুর হাত থেকে বাঁচায়।

নূকরাজুর বাবরি-চুল এলোমেলো; জামা ছেঁড়া। হাত থেকে ঘড়ি খোলা। এই সমস্ত সামলাতে সামলাতে সে চিৎকার করছিলো,

'খানকির ছেলে, আমি তোর রক্ত চুষে নেবো, তোকে মেরে ফেলবো। বিয়ে করা বউ রাস্তায় দাঁড়ালে তাকে আর বেশ্যা বলবি! তোর লজে যারা যায় তারা বেশ্যা। বড়লোকের ছেলেরা সঙ্গে বেশ্যা নিয়ে গেলেও তারা ভদ্রলোক। আর ঘরের স্ত্রী তার স্বামীর সঙ্গে গেলে বেশ্যা হয়ে যায়? তোর লজ বেশ্যাদের লজ— তোকে, তোর কাণা মুন্সীকে আর তোর বেশ্যা-লজের প্রোপাইটারকে আমি একসঙ্গে খতম করে দেবো। শুধু এক ঘুঁষিতে!'

নূকরাজুকে ঘিরে যারা দাঁড়িয়েছিলো তাদের কেন যেন দৃঢ়বিশ্বাস হয়ে গেলো, নূকরাজুর কোনো দোষ নেই। অশত্থগাছের পাতার মতো অম্মভূ কাঁপছিলো আর দূর থেকেই চেঁচাচ্ছিলো, 'আমার কথা শোনো, চলে এসো। ওই বুড়োটার সঙ্গে লড়ে কি হবে। চলো, আমরা বাড়ী যাই!' অম্মভূর কথা শুনে তাদের বিশ্বাস আরো বদ্ধমূল হোলো। কাছাকাছি দেবুভূর পরিচিত কেউ ছিলো না। দু'য়ে মিলে লোকেদের ধারণা হয়ে গেল যে দোষটা/তারই।

'যাগ্ গে দাদা, যা হয়ে গেছে, গেছে— এবার ছেড়ে দিন। বুড়োটাকে আধমরা করেছেন। এবার যে কাজে যাচ্ছিলেন, চলে যান।' একজন মাঝ-বয়েসী লোক বলে ওঠেন।

'বুড়ো কে? ও বুড়ো? ও তো বেশ্যাদের পিছু পিছু ঘুর ঘুর করে। বেটা হারামজাদা।' বলতে বলতে নূকরাজু আরো উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলো। এইবার অম্মভূ সাহস ক'রে তার হাত চেপে ধরলো। ইতিমধ্যে ইনটারভ্যালের ঘণ্টা পড়ায় চারিদিকে ভীড় জড়ো হয়ে যায়। মুহূর্তের মধ্যে ভীড়ের মধ্যে নিজেদের হারিয়ে ফেলে।

তিনটে সিনেমায় পাঁচ-দশ মিনিটের তফাতে ইনটারভ্যালের ঘণ্টি প্রায় একসঙ্গেই বাজে। কখনও আবার এতোটা তফাতও থাকে না। তিনটে হলের লোকেরা একই সঙ্গে দোকানে ভীড় করে। এ রকম সময়ে সোডার বোতলের শব্দ, চাটওয়ালাদের চিৎকার, তেলে-ভাজাওয়ালার হাঁকডাক— চারিদিকে সোরগোল সুরু হয়ে যায়। লজ্জা-ঘেন্না ভুলে জনতা রাস্তাতেই প্রস্রাব করতে সুরু করে দেয়। আর খাওয়া-দাওয়ায় মত্ত হয়ে গিয়ে কখনও অশ্লীল ছবির দিকে অথবা জনতার দিকে ক্ষুধার্ত চোখ নিয়ে দেখে। এই অবস্থায় নিজেদের দেখে নিজেদের প্রতিই সহানুভূতি জেগে ওঠে।

লোকেদের ভীড়ের থেকে একটু দূরে একটা চাতালের ওপর বসে দেবুভূ। মাথা ঘুরছে। রক্ত চলাচল যেন শিথিল হয়ে এসেছে। অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যেন জ্বলছে।

ভীড়টা যখন কমে গেলো তখন কে যেন একজন একটা সোডার বোতল এনে দিলো। দেবুভূ খেয়ে নিলো। আর-একজন তার কাপড় খুঁজে এনে দিলো। দেবুভূ পরে নেয়। এইসব কারণে তার মনে

যে দুঃখ গুমরে গুমরে উঠেছিলো সেটাকে কোনো রকমে চাপা দিয়ে প্রহারের পর প্রহার আর দুঃখের পর দুঃখ সহ্য করা রুক্ষ ও শুষ্ক কাঠের মতো শরীরটাকে টানতে টানতে লজিং হাউসের দিকে চলে।

ভীড় থেকে দূরে একটা খালি রিক্সা দেখতে পেয়ে স্বামী-স্ত্রী দু'জনে গিয়ে উঠে বসলো। অম্মভূর মনে দুঃখ গুমরে ওঠে। নূকরাজু ওকে সান্ত্বনা দেবার কোনো চেষ্টা করে না। এক হাতে তাকে সামলে ধরে অন্য হাতে কেটে যাওয়া ঠোঁটটাকে রুমাল দিয়ে চেপে ধরে। জ্যোৎস্নায় রিক্সা ক্রমশ দূরে চলে যায়।

হাতলওয়ালা চেয়ার

'আচ্ছা, উনি।' একজন অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে।

'হ্যাঁ, উনিই তো।' অন্য একজন জবাব দেয়।

'হ্যাঁ— উনিই, হ্যাঁ, উনিই তো।' সঙ্গে সঙ্গে আরো দু'জন বলে ওঠে।

গাঁয়ের পুব দিকে পুকুরের পারে এক বটগাছের তলায় একটা গাড়ী এসে দাঁড়ালো। গাড়ী থেকে নামলেন ভারিক্কী গোছের এক ভদ্রলোক। তাঁর সম্বন্ধেই লোকেরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করছে। ভীড়ের মধ্যে থেকে একজন বলে উঠলো, 'উনিই তো চেয়ারম্যান।' যারা আগে ওঁকে কখনও দেখে নি তারা ওঁকে দেখে আলোচনা স্বরু করে দেয়। অনেকদিন পরে কাউকে দেখলে মনে যে রকম আনন্দ, গৌরব ও শ্রদ্ধা জাগে, সেই রকম একটা ভাব নিয়েই সবাই কথাবার্তা বলতে থাকে।

'ভদ্রলোককে দেখে তো বেশ ভালোই মনে হয়।' চেয়ারম্যানের হৃষ্টপুষ্ট বলিষ্ঠ দেহের প্রশংসায় একজন পঞ্চমুখ। যে গাড়ী থেকে তিনি নামলেন সেই গাড়ী থেকে সাদা পোষাক পরে আরো কয়েকজন নামলেন। পঞ্চায়েত বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট, গাঁয়ের গণ্যমান্য ব্যক্তিরা আর তাঁদের আশ্রিতজনরা সবাই গাড়ীটার অপেক্ষায় সকাল থেকে দাঁড়িয়েছিলো। বেলা একটার সময় গাড়ীটা এসে পৌঁছোলো; লোকেদের আর আনন্দ ধরে না। চেয়ারম্যানের সঙ্গে কর্তাব্যক্তি গোছের আরো কয়েকজন এলেন। কিন্তু তাঁরা যে কে গাঁয়ের

লোকেরা তা জানে না। কেউ বললো, 'ক্যালেক্টার হবে হয়তো।' কেউ বলে, 'ধ্যাৎ, ক্যালেক্টার নয়।' শুনে অন্যজন বলে, 'তহশীলদারও হতে পারে।' এ উক্তি খণ্ডন ক'রে আর-একজন বলে ওঠে, 'না, না, ও তহশীলদার নয়। তহশীলদারের কপালে একটা দাগ আছে। উনি তো গতবার রেভিনিউ ইন্সপেক্টরের সঙ্গে এসেছিলেন।' বাকী লোকেদের সম্পর্কে কেউ কিছুই বলতে পারছিলো না। সবাই যে যার মতো আন্দাজ কবতে থাকে। গাঁয়ে একটি মাত্র স্কুল। তার একমাত্র শিক্ষক প্রকাশম বলেন, 'কপালের দাগওয়ালা লোকটার জায়গায় টিকোলো নাকওয়ালা লোকটা এই প্রথমবার আসছে। সাদা পোষাকপরা লোকটা হ'লো বি - ডি - ও আর তৃতীয়জন যে সে হ'লো পঞ্চায়েতের কর্তা।'

ওদেব পেছনে একটা বড়ো রকমের ভীড় জমে গেছে। সবার আগে সাদা পোষাকপবা লোকেরা, তার পেছনে রঙীন ও ময়লা কাপড়-পরা লোকেরা, তারপর হাঁটু অবধি কাপড়-পরা লোকেরা, সবার পিছে কিছু পাগড়ী-ধারী লোক— এইভাবে সব শ্রেণীর লোকেরাই চলেছে। মজা পেয়ে ব চ্চারাও চলেছে পিছু পিছু। আর বয়স্করা কর্তাব্যক্তিদের মুখের দিকে তাকিয়ে এগিয়ে চলেছে, ভাবতে ভাবতে যাচ্ছে— এই গুরু বিপদ থেকে কর্তারা আমাদের কিভাবে উদ্ধার করবেন।

গাঁয়ে হাজারের চেয়ে বেশি বসতি। কাল এখানে আগুন লেগেছিলো। অর্ধেক বাড়ী পুড়ে ছাই। গাঁয়ের রাস্তার ওপরে আধপোড়া দেওয়ালগুলোর গায়ে কালো কালো দাগ। নীচে ছাই পড়ে আছে, সঙ্গে আধভাঙা আধপোড়া কাঠ। কিছু বাড়ী তৈরির কাঠ আবার দমকলের ইঞ্জিন টেনে টেনে এনেছে সব মিলিয়ে বাড়ীগুলোকে দেখাচ্ছে ভয়ঙ্কর।

রামমূর্তি ভীড় থেকে একটু দূরে দূরে হাঁটছিলো। সবার সঙ্গে হাঁটতে তার ভালো লাগে না। চারিদিকের অবস্থা দেখে তার মন ভারাক্রান্ত, সবচেয়ে সামনে যে জনতার ভীড় চলেছে তার মাঝে একটা উল্টোকরা চেয়ার দেখা যায়, সেটাকে মাথায় নিয়ে চলেছে— সম্ভবত চেয়ারম্যানসাহেব ওটায় বসবেন! শুধু চারিদিকে পোড়া বাড়ীর দেওয়ালগুলো দাঁড়িয়ে আছে। মড়া নিয়ে বসে যারা কান্নাকাটি করছে, আগুনে পুড়ে মারা গেছে যারা, তাদের ঘিরে যে সব দীন-দুঃখী কাঁদছে— সবাই ঐ চেয়ারের পায়াগুলোই শুধু দেখতে পায়। মাঠের মধ্যে রাখা প্রতিমা যেমন সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে. তেমনি এই চেয়ারটি জেলাপরিষদের চেয়ারম্যান, রেভিনিউ অফিসার, আর তহশীলদারকে উপেক্ষা করে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রছে।

জ্যৈষ্ঠমাস। পুকুরের জল সব বাষ্প হয়ে উড়ে যাচ্ছে। প্রকৃতি লেলিহান জিহ্বা দিয়ে যেন সব গ্রাস করে ফেলছে। ঘটনাটা ঘটেছে এই রকম অবস্থায়। গাঁয়ের অনেক লোকের আশা-আকাঙ্ক্ষা সব ধুয়ে মুছে শেষ হয়ে গেছে; তাদের চেহারা এখন করুণ, নিষ্প্রাণ

যে সব বাড়ী পুড়েছে তাদের এক-আধজন বাসিন্দা— ছাই সরাতে কিংবা জিনিস খুঁজতে ব্যস্ত। নিরাশার চোখের জলে তাদের দৃষ্টি আবছা, তারা পৃথিবীর আর কিছুই দেখতে পায় না, তাদের সবাইকে দেখায় স্তিমিত। আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে সবাই তারা হতবাক, সন্ত্রস্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখছে এদিক ওদিক।

রামমূর্তি ভাবে, যদি দমকল আসতে আর পাঁচ মিনিট দেরী হ'তো তা হলে তার বাড়ীও পুড়ে ছারখার হয়ে যেতো। দমকল আসার পরও প্রায় শখানেক বাড়ী পুড়ে গেছে। ঈশ্বরের দয়ায়

এ যাত্রায় তার বিপদ কেটে গেছে। আগুনের শিখা ক্রমশ যখন এগিয়ে আসছিলো আর দমকলের লোকেরা জলের ফোয়ারা ছুটিয়ে আগুন নেভাবার চেষ্টা করছিলো তখন একদিকে বুকের মধ্যে আর্তনাদ জেগেছে, আবার পুকুর ভরা জল দেখে মনের মধ্যে পেয়েছে সান্ত্বনা— দোটানায় উদ্বেলিত মনকে রামমূর্তি অবশেষে ঈশ্বরের চরণে সমর্পণ করেছে ; যারা বেঁচে গেছিল তাদের সঙ্গে স্বর মিলিয়ে রামমূর্তিও বলেছে, 'ভগবান বাঁচিয়েছেন।'

রামমূর্তি ব্যাকুল হ'য়ে পড়েছিলো। পাঁচ-ছ'শো পরিবার মুহূর্তের মধ্যে ঘরছাড়া হ'য়ে গেলো। লক্ষ শকুনের মতো আগুন বাড়ীগুলোকে গ্রাস করলো আর শুধু কঙ্কালের স্তূপ রেখে নিভে গেলো। প্রচণ্ড রোদের মধ্যে ছাই কুড়োচ্ছে যে সব লোক, তাদের কাতর চেহারার দিকে তাকিয়ে রামমূর্তি ভাবে, আগুনের হাত থেকে তার বাড়ীর বেঁচে যাওয়াটা তার শুভ কপালের চিহ্ন, না পোড়া কপালের। দশ জনের সঙ্গে নরকে গেলেও স্বর্গসুখ পাওয়া যায় কিন্তু একা স্বর্গে গেলে নরক যাতনার চেয়ে কষ্ট কিছু কম বোধ হয় না।

একটা টালি দেওয়া ঘরে দশ, তেরো আর চোদ্দ বছরের তিনটে বাচ্চা— তাদের মধ্যে দু'টো ছেলে আর একটা মেয়ে— ছাদ ভেঙে পুড়ে মারা যায়। টালিতে আগুন লাগবে না ভেবে সবাই ঘরে লুকিয়েছিলো, আগুন বাড়ীটাকে ঘিরে ফেলে, কেউ বেরোতে পারে নি। তাদের কাছে পৌঁছোতেও কেউ পারে নি। ধোঁয়ায় দম বন্ধ হয়েই বোধ হয় ওরা মারা গেছে। পরে ছাদে আগুন লাগে, ছাদ ভেঙে ওদের ওপর পড়ে। সকালেই বাচ্চাগুলোকে বার করা হয়েছিলো। ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের এক-একটি করুণ কাহিনী চেয়ারম্যান সাহেবকে শোনানো হচ্ছিলো।

চারিদিকে ব্যথা-বেদনা ও হাহাকারের ক্রন্দনধ্বনি। রাস্তাটা অনেকগুলো বাঁক নিয়েছে, ফলে পুরো দেখা যেতো না। এখন কিন্তু শুধু এই রাস্তাই নয়, পোড়া দেওয়ালের সঙ্গে অন্য রাস্তাগুলোও পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। এমনিতেই রামমূর্তির বাড়ী থেকে গাঁয়ের গোটা পঁচিশ বাড়ী দেখা যেতো। এখন যেন সমস্ত বাড়ীগুলোই রাস্তার ওপর এসে দাঁড়িয়েছে, নীলাম করার সময় যেমন বাড়ীর আসবাবপত্র রাস্তায় এনে রাখা হয়। কিছু গাছও পুড়ে গেছে, আবার কিছু গাছ আকাশের দিকে এমন তাকিয়ে আছে, যেন অসীম বেদনাকে নিজেদের মধ্যে লুকিয়ে রেখেছে।

'বর্ষার পর কাজে ব্যস্ত থাকবে বলে গাঁয়ের লোকেরা সব ফসল ঝেড়ে বেছে তুলে রেখেছিলো। দেখুন ঐ দিকে, আগুনে পুড়ে যাবার পর চালের ওপর জল পড়ে কেমন সেদ্ধ হয়ে গেছে, দেখতে যেন ঠিক পাখীর বাসা।' প্রেসিডেণ্ট বোঝাতে থাকেন।

ভাত বেশী সেদ্ধ হলেই চড়া গন্ধ বেরোয়। সেই রকম গন্ধে চারিদিক ভরে আছে। দলের সঙ্গে চলতে চলতে সাদা পোষাকপরা সাঙ্গপাঙ্গদের একজন মনে মনে ভাবে দেশের উন্নতির আর কোনো আশা রইলো না। এই বাড়ীগুলো গায়ে গায়ে তোলার কি দরকার ছিলো? এই সব সম্পত্তি বাড়ীর মধ্যে এভাবে কেন ফেলে রাখা হয়? পঞ্চাশ হাজার টাকার নোট পুড়ে গেলে লোকে হার্টফেল ক'রে মারা যায়। এ রকম কেন হয়? ব্যাঙ্কে জমা দিলেই তো ভালো হোতো! এই পয়সা কত কাজে আসতো। নিজের যতটা শস্য দরকার তা রেখে বাকীটা বেচে দিলে কতো না সুবিধে হোতো!

নন্দীর মতো সোনার চেনে নিজেদের গলা বেঁধে না রেখে নিজেদের

স্বাস্থ্য ও শিক্ষাদীক্ষার দিকে সময় দিলে দেশের কত উন্নতি হোতো। হতে পারে তার মনের এই-সব জিজ্ঞাসা অন্ধতা থেকে জেগেছে। বোধ হয় এই-সব সমস্যার সমাধান সে নিজেই বুঝতে পারে না। এই দীনদুঃখী লোকগুলোর দুরবস্থা ও অজ্ঞতা দেখে ওর দয়া হয়। এই প্রশ্নগুলো তাই তাকে বিব্রত করে তোলে। ফুলের মতো কোমল যে সব মেয়েরা হেসে খেলে বেড়াতো আজ তারা খিদের জ্বালায় চোখেমুখে অন্ধকার দেখছে, মাথায় চুবড়ী করে নিয়ে চলেছে পোড়া জঞ্জাল। বোধ হয় স্নান হয় নি, খাবার মতো মনের অবস্থা নেই ওদের। বিপদ ওদের সব আশা, সব শক্তি, একেবারে নিঃশেষ ক'রে দিয়েছে। সমস্ত গ্রামটা একটা পুরোনো বিবর্ণ ছবির মতো।

'বাবু, এখানে একটা গোয়াল ছিলো। এখানে দু'টো বলদ থাকতো, পুড়ে গেছে। কাল-পরশুও বলদ দু'টোকে কেনার জন্যে চারশো টাকা দিতে রাজী ছিলো, আমরা দিই নি। বড় ভালো ছিল বলদ দুটো।'

চেয়ারম্যানের কাছে একজন ছোটগোছের নেতা এই সব ব্যাখ্যা করছিলো:

'ঐ যে বাড়ীটা দেখছেন, ওতে তিরিশ বছর বয়সের এক মহিলা পুড়ে গেছে। বেচারীর দু'টি বাচ্চা, ওদের বাপও নেই।' আরো অনেক খবর সে দেয়— 'বাড়ীর মধ্যে টাকা-পয়সা ছিলো, সেটা আনতে ভেতরে গেছিলো। টাকা-পয়সা নিতে গিয়েই নিজে পুড়ে মরলো। গোড়ায় আগুনের দাপট অত মারাত্মক ছিলো না। হঠাৎ জোরে হাওয়া বইতে সুরু করলো; আগুনের শিখা তাকেও গ্রাস করলো।'

গাঁয়ের অবস্থা কি মর্মান্তিক, জমায়েতের সবারই তা বেশ মালুম

হচ্ছিলো। কাউকে কিছু বলার দরকার নেই। চোখের সামনে যা দেখার আছে সব দৃশ্য যেন নিজের অশ্রুধারায় নিজেই করুণ কাহিনী শোনাচ্ছে।

আগুন লেগেছে গতকাল। কিন্তু সহরের বড় সাহেবদের এখানে আসার ফুরসত হয়েছে আজ। গজরাজকে রক্ষা করতে বৈকুণ্ঠ থেকে নিরস্ত্র ভগবান বিষ্ণু যেমন নেমে এসেছিলেন, চেয়ারম্যানসাহেবও কোনো কিছু ব্যবস্থা না ক'রেই যে অবস্থায় ছিলেন সেই অবস্থায় চলে এসেছেন। হিরোসিমা ও নাগাসাকির মতো এই-সব পথঘাট ওঁর সামনে যেন প্রত্যক্ষ হয়ে উঠছে।

রামমূর্তির দৃষ্টি ঐ চেয়ারটার ওপর। চেয়ারম্যানসাহেব কোথাও থামলেন না, চেয়ারও নামানো হোলো না। মাথায় চেপেই সে চলেছে।

দু'বছর আগের কথা। একদিন খেঁকু ইন্সপেক্টর রামমূর্তির বাড়ীতে এসেছিলেন। ওঁকে বসতে দেবার কিছু না পেয়ে রামমূর্তি একটা মাদুর পেতে দিয়েছিলো। তার ওপর তোষক। কিন্তু ইন্সপেক্টর সাহেবের প্যাণ্টের ক্রীজ নষ্ট হয়ে যাবার ভয়ে সেখানে বসেন নি। সুমুখের রোয়াকে একটা চেয়ার দেখে সেখানেই গিয়ে বসেন। সেদিন রামমূর্তি চেয়ারের মর্যাদা বুঝতে পেরেছিলো। গাঁয়ে অনেক লোকই আসেন যান, তাঁদের আদর-আপ্যায়ন করাও প্রয়োজন। তাই বাড়ীতে একটা চেয়ার থাকা বিশেষ দরকার। চেয়ারের প্রয়োজন বাড়ীর সম্মান রক্ষা করার জন্যে। নিজের মেয়ের জন্যে কেন সে গয়না গড়াচ্ছে? প্রতিবেশীদের নিজের বড়লোকমি দেখিয়ে সমাজে সম্মান পাবার আশায়। আজ তার বাড়াতে একটা চেয়ারও নেই, ইন্সপেক্টর সাহেব তাই সামনে প্রকাশমের বাড়ীর

রোয়াকে রাখা হাতলওয়ালা চেয়ারে গিয়ে বসলেন। রামমূর্তিকেও বাধ্য হ'য়ে ওখানে যেতে হোলো। গিয়ে হাত জোড় করে দাঁড়াতে হোলো। সবাই রামমূর্তিকে দেখলো। শতকরা ৪ টাকা হার সুদের যে যোজনা তাতে রামমূর্তিকে দিতে হবে ৫০০ টাকা। কমপক্ষে ৫০০ টাকা তাকে দিতেই হবে। তা না হলে সুদ বাবদ কুড়ি টাকা দিতে হবে। হিসেবটা রামমূর্তি বুঝে উঠতে পারলো না। সরকারী হুকুমের পরোয়ানা জারী হ'লো। সবায়ের কাছ থেকেই পয়সা আদায় করা হ'লো। রামমূর্তিকেও দিতে হ'লো। সেদিন যদি ইন্সপেক্টর সাহেব রামমূর্তির বাড়ীতে বসতেন, তা হলে সবাই তার বাড়ীর রোয়াকেই এসে জড়ো হোতো।

দিন পনেরোর মধ্যেই সহর থেকে চেয়ার আনানো হ'লো, হাতলওয়ালা চেয়ার। রামমূর্তি অপেক্ষা ক'রে ছিলো যে বড় বড় অফিসার এবার তার গাঁয়ে এলে হয়। তাঁরা গাঁয়ে এলেন কিন্তু তার বাড়ীতে নয়। একবার গাঁয়ে ব্লক ডেভেলপমেণ্ট অফিসারের তরফ থেকে গ্রামনায়কদের শিক্ষা-শিবিরের আয়োজন হয়। সেই সময় এই চেয়ার সেখানে নিয়ে যাওয়া হয়েছিলো। চেয়ার চাইতেই রামমূর্তি মহাখুশি হয়েই চেয়ার দিয়ে দেয়। খানিক বাদেই রামমূর্তির ভাবনা হয়, কেউ হিংসেতে চেয়ারটা ভেঙে না দেয়। কিন্তু ভগবানের কৃপায় চেয়ারটা অক্ষত অবস্থায় ফিরে আসে।

তারপর আর কোনো গণ্যমান্য ব্যক্তির উপস্থিতি ঘটে নি। তাই দু'টো ঘরের দরজার মাঝখানে চেয়ারটা পেতে রামমূর্তি নিজেই তাতে বসতো। চেয়ারটায় বসলে নিজেকে বেশ হোমরাচোমরা মনে হোতো। বাড়ীর চাকরবাকর আর নিজের স্ত্রীর ওপর রামমূর্তি বেশ কিছুটা অধিকারও ফলাতো। সে দেখলো চেয়ারটাতেই বড়

হবার বীজ লুকিয়ে আছে। চেয়ারের জোরেই কালেক্টারের আধিপত্য, চেয়ারের জন্যেই লোকে প্রেসিডেণ্টকে মানে।

কখনও কখনও খেয়াল চাপলে সে তার স্ত্রীকেও জোর ক'রে চেয়ারে বসাতো। স্ত্রী ভীষণ লজ্জা পেতো। এত লজ্জা পেতো যে খানিক বাদেই চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়তো। 'লক্ষ্মী! চেয়ারে বসারও যোগ্যতা থাকা দরকার।' এই বলে নিজের স্ত্রীকে যোগ্যতা সম্বন্ধে যে ইঙ্গিত রামমূর্তি দিতো তাতে তার স্ত্রীও খুব গর্ব অনুভব করতো। সত্যি বলতে কি, এই গর্ববোধ ছাড়া যোগ্যতা আর কি হতে পারে? তাই লক্ষ্মী আরো লজ্জিত হয়ে পড়তো। বলতো, 'চেয়ারে বসা আর চাকরী করা পুরুষদেরই সাজে, মেয়েদের নয়।'

চেয়ারটা রোজই এইভাবে ব্যবহার হ'তো। রামমূর্তির বাড়ী তারপর আর কেউ আসেও নি, চেয়ারেও বসে নি।

এক বছর আগে রামমূর্তির বাবা-মা মারা যায়। কিছু সুদ আর টাকার সঙ্গে কিছু সম্পত্তিও পায় সে। ধার দেনা বা ঐ ধরনের কোনো দায়-দায়িত্ব ছিলো না। শুধু দুটি কাজ— খেত দেখা আর বিশ্রাম করা। দু'বছরের ওপর হ'লো বিয়ে হয়েছে। বিশ্রামের সময় নববধূর মতো স্ত্রীর সঙ্গে আনন্দ করা— এই ছিলো রামমূর্তির রোজকার কাজ। তাস খেলা কিংবা এর-ওর বাড়ী গিয়ে ঝগড়া-ঝাঁটি করা— এ জাতীয় বদ-অভ্যাস তার ছিলো না। এই ব্যাপারে তার স্ত্রী ছিলো খুব নিশ্চিন্ত। বাপের বাড়ী গেলে তার মাকে সে এই কথাটা একবার শুনিয়ে আসতো।

সেই চেয়ারটার আজ আবার তলব পড়েছে।

মনে হয় চেয়ারম্যানসাহেব কোথাও দাঁড়ান নি। চেয়ারটাও তাই মাথা থেকে নামানো হয় নি। ওটাকে মাথায় করে নিয়ে যে

লোকটা চলেছে, তার যে হাত ব্যথা করছে এমনও মনে হয় না। ভীড়ের মধ্যে সারাক্ষণ তাকে পরিষ্কার দেখতে পাওয়া যায়। রাস্তা-ঘাটও পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। অর্ধেকটা গ্রামও দেখা যাচ্ছে। দক্ষিণদিকের রাস্তাগুলো একটু নিচু। তাই কালো কালো পাঁচিল যেগুলো খাড়া হয়ে আছে তার গায়ে রঙিন পাগড়ীগুলোও দেখা যাচ্ছে। উপুড় হয়ে শুয়ে থাকা জানোয়ারের মতো ঐ হাতলওয়ালা চেয়ারটাকে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে।

রামমূর্তি হাঁফিয়ে ওঠে। কতক্ষণ ধরে সে দেখছে, চেয়ারম্যান-সাহেব বসার নামও করেন না। বেচারা কতক্ষণ ধরে চেয়ারটা মাথায় করে এখান ওখান ঘুরবে। যখন বসবেই না তখন চেয়ারটা সঙ্গে নিয়ে ঘুরে বেড়াবার কি দরকার। এখন চাই না। ব্যাস্, এইটুকু বললেই তো আর হয়রানি হয় না। আসলে চাইবার সঙ্গে সঙ্গে চেয়ারটা দিয়েই সে ভুল করেছে। যে কোনো জিনিসই বার বার চাইবার পর দেওয়া উচিত। তা হলেই জিনিসের কদর বাড়ে। যারা চায় তারাও তার মূল্য দিতে শেখে। যে দেয় সেও খুশি হয়। দু-চারটে মৌমাছির হুল ফোটানোর জ্বালা না পেলে মধুর আসল স্বাদ বুঝতে পারা যায় না। কিন্তু রামমূর্তি তা করে নি। চেয়ারম্যানসাহেব আসবেন বলে ওর কাছে চেয়ার চাইতেই ও দিয়ে দিয়েছে। এখন তো দশজনের সামনে রামমূর্তিরই বেইজ্জত হচ্ছে।

প্রায় আধঘণ্টা চারদিক ঘুরে-ফিরে শেষে পুব দিকের পুকুরের ঢাল বেয়ে সবাই অশত্থ গাছের তলায় জড়ো হ'লো। যে লোকটা চেয়ার নিয়ে যাচ্ছিলো সে এবার চেয়ারটা নামিয়ে রাখলো। মনে হয় সে একটা সোয়াস্তির নিঃশ্বাস ফেললো। ইতিমধ্যে প্রেসিডেন্ট নাইডু, প্রকাশম ও অন্য সবাই ও তাঁর সঙ্গী-সাথীদের নেমতন্ন

খাওয়াতে নিয়ে গেলো। চেয়ারম্যানসাহেব অনেক দিন বাদে এসেছেন। তাই যথারীতি তাঁর আদর-আপ্যায়ণ না করে কি তাঁকে ফিরে যেতে দেওয়া যায়? সব সময় কোনো না কোনো কাজে তাঁর কাছে যেতে হয়। এত উঁচুতে আছেন যিনি তাঁর সম্মান রক্ষা করাটা তো একান্তই জরুরী ব্যাপার। সমস্ত ভীড়টা অশথগাছের তলায় এসে থেমে যায়। ইন-সার্টওয়ালা গ্রামনেতা ও চেয়ারম্যানসাহেব নেমতন্ন খেতে চলে গেলেন।

'সারা গাঁ পুড়ে ছারখার, গাঁয়ের লোকেরা খিদে আর তেষ্টায় ছটফট্ করছে। আর এদের নেমতন্ন খেয়ে স্ফূর্তি করার সময় এটা!' রামমূর্তি মনে মনে ভাবতে থাকে। সবাই মনে আশা নিয়ে আছে যে এঁরা এসে তাদের সাহায্য করবেন। লোকে বলে চেয়ারম্যান-সাহেব নির্বাচনে এক লক্ষ টাকার বেশি খরচ করেছেন। এই ধরনের লোক গাঁয়ে পা দিলেই গাঁয়ের লোকের অবস্থা ফিরবে। চেয়ার-ম্যানসাহেবের উদার স্বভাব ও অমায়িক ব্যবহার নিয়ে সবাই আলোচনা করে। চেয়ারম্যান এক বছরও হয় নি গদিতে বসেছেন; কিন্তু কাজ যেভাবে চালাচ্ছেন তা বেশ আশাপ্রদ। তাই অসহায় গ্রামবাসীরা খুব আশা নিয়ে অপেক্ষা করছে, দেখবে নেমতন্ন খেয়ে এসে তিনি কি বলেন— কি দেখেন!

কিছু লোকের সন্দেহ হয়, উনি বোধহয় প্রেসিডেন্টের হাতে কিছু দিয়ে চলে যাবেন। এই রকম যদি কিছু হয় তা হলে বিরুদ্ধ দলের প্রতি অন্যায় করা হবে। 'ঠিক আছে, দেখা যাক না কি হয়,' বলে কিছু লোক নিজেদের সন্দেহ প্রকাশও করে ফেলে।

রামমূর্তি দেখে—

অশথগাছের তলায় চেয়ারটা রেখে দেওয়া হয়েছে। কারুরই

সেদিকে লক্ষ্য নেই। নেমতন্ন বাড়ীতে নেমতন্ন খেতে গেলে লোকেরা মুখের দিকে না তাকালে যে অবস্থা হয়, চেয়ারটার অবস্থা অনেকটা সেই রকম।

অশথ গাছের তলায় মোটর গাড়ীটা। তার পাশ দিয়ে একটা গরুর গাড়ী ছটা বস্তা নিয়ে রামমূর্তির বাড়ীর সামনে এসে দাঁড়ালো।

রামমূর্তি জিজ্ঞেস করে, 'কি আছে?'

ঠিকেদার সাহেব চাল পাঠিয়েচেন। সাইকেলে করে উনি পিছু পিছু আসছেন।'

প্রেসিডেন্টের গলার আওয়াজ। কারুর হাসির শব্দ, কারুর ঢেঁকুরের শব্দ, কারুর বা গলা-খাঁকারি দিয়ে কাশি, কারুব জুতোর মচ্‌মচ্‌ শব্দ, আবার কারুর হাঁচি— বাইরে দাঁড়িয়ে রামমূর্তি সব শুনতে পায়।

'গাড়ীটা রোদে দাঁড় করিয়েছো কেন? নিমগাছের তলায় নিয়ে যাও। বলদ দু'টোও একটু আরাম পাবে।' রামমূর্তি বলে।

ঐ দিক থেকে চেয়ারম্যানসাহেব নিজের লটবহর নিয়ে আসছেন। এদিক থেকে গরুর গাড়ীটা যাচ্ছিলো। গাড়ীটা দেখে লোকেদের আবার খানিকটা কৌতূহল দেখা দেয়। কিছু লোক আনন্দ প্রকাশ করে, কিছু লোক অবাক হয়ে যায়।

অশথ গাছের ছায়ায়—

একদিকে গাড়ী—

অন্যদিকে চেয়ার—

বিদায় নেবার আগে আশ্বাসবাণী—

ইতিমধ্যে প্রেসিডেন্টের ছোট ভাই—যে চাকরীর খোঁজে ঘুরছে—সই করানোর জন্যে এসে হাজির হ'লো। সই করার জন্যে

আবেদন-পত্রের নীচে শক্ত কিছু ছিলো না তাই ডান পা-টা চেয়ারের ওপর তুলে দিয়ে আবেদনপত্রটা হাঁটুর ওপর রেখে যেখানে যেখানে সই করার ছিলো চেয়ারম্যান সেখানে সই করে দিলেন। তারপর এতোটা উপকার করেছেন বলে নিজে প্রসন্ন হয়ে একটু হাসলেন। আর ছেলেটির মুখে প্রসন্নভাব দেখে গাড়ীর পেছনের সীটে গিয়ে বসে পড়লেন।

তাঁর দলের বাকা লোকেরাও গাড়ীতে গিয়ে উঠে বসলো। ইঞ্জিন স্টার্ট নিলো। হর্ন বাজলো। গাড়ী যায় যায় বলে।

'তা'লে কি ঠিক হ'লো। ওরা টাকা পাঠিয়ে দেবে?' একজন প্রশ্ন করে।

'হ্যাঁ ভাই, এখন তো ওঁরা এসে সব ভালো করে দেখে ক্ষয়-ক্ষতির হিসেব নিয়ে গেলেন। ওখানে ফিরে গিয়ে সব দেখেশুনে পাঠিয়ে দেবেন।' একজন সবজান্তা গোছের লোক বলে ওঠে।

'চেয়ারম্যান নিজে কিছু দেবেন না?' আর-একজন প্রশ্ন করে বসে।

'ওঁর কাছেও টাকাকড়ি আছে?'

'সরকারের টাকা বিতরণের জন্যে ওঁর এতদূর আসার কি দরকার ছিলো? তহশীলদার দেখে গেলে কি হ'তো না?' আইনকানুন জানে এই রকম একজনের গলার স্বর।

'নির্বাচনের জন্যে এরা তো লাখ টাকা ফুঁকে দেয়। কিন্তু দান-ধ্যানের বেলায় এক পয়সাও হাত থেকে গলে না। এদের কাছ থেকে কিছু আশা করাই ভুল। যে যার কপালে খায়। ও যদি কিছু দেয় তা হলেই কি আমাদের পেট ভরবে? জগতে যদি দান-ধ্যানের রেওয়াজ থাকতো তা হলে ভাবনার আর কি ছিলো? এতো

ঘোর কলি বাছা, ঘোর কলি। এই কথাটাই সবাই ভুলে যায়। এটা মনে রাখতে হবে, যেটা আমাদের সামনে আছে, সেটা আমাদের নয়। তা না হলে অগ্নিদেবতা আমাদের ওপর ক্ষুব্ধ হলেন কেন? যা কিছু ছিলো সবই ঈশ্বর উড়িয়ে দিলেন, পুড়িয়ে দিলেন। এবার কে দেবে আর কোথা থেকেই বা দেবে?' হতাশায় ভেঙে পড়ে একজন বৃদ্ধ ধরা গলায় বললেন।

চেয়ারম্যানকে অশ্লীল গালিগালাজ দিয়ে একজন বললো, 'এরা আমাদের জান নিতে আসে, আমাদের সাহায্য করতে আসে না। আজকের ব্যাপারটাই দেখো না, এই গুষ্ঠিকে গেলানোর জন্যে আমাকে ছাব্বিশ টাকা দিতে হয়েছে।' এতো টাকা খরচ হয়ে যাওয়ায় তাকে বেশ মর্মাহত মনে হ'লো।

যতক্ষণ কর্তাব্যক্তিদের সঙ্গে থাকেন ততক্ষণ তাঁদের গায়ে তেল মাখাতে আর পরে জনতাকে খোসামোদ করাতে প্রেসিডেণ্ট সিদ্ধহস্ত। তিনি বলেন, 'ছাব্বিশটা টাকা যদি থাকতো তো দশ ঠেলা কাঠ কেনা যেতো আর দশটা বাড়ী উঠে যেতো। কিন্তু এসব হ'লো ভদ্রতা। যদি এ সব না করা হ'তো…' এসব বলে তিনি জনতার প্রতি তাঁর সমবেদনা জানান। তাঁর নিজের বাড়ী পোড়ে নি, তাই এতোটা বলার মতো বুকের জোর তাঁর আছে বৈকি।

রামমূর্তির কানে এসব কথা পোঁছোয় না। তার বাড়ী থেকে অশত্থ গাছটা কুড়ি-পঁচিশ গজ দূরে। সবাই ওখান থেকে চলে গেছে। কিন্তু চেয়ারটা পরাজিত শত্রুর মৃতদেহের মতো উপেক্ষিত হয়ে পড়ে আছে।

চেয়ারটা যখন রামমূর্তির কাছে ছিলো, তখন রামমূর্তির মনে যে আনন্দ তৃপ্তি আর গর্ব ছিলো, তার লেশমাত্র আজ নেই। আলোতে ঝলমল করে যে রঙ আর প্রকৃতির যে সৌন্দর্য, অন্ধকারে তা

একেবারে ম্লান হয়ে যায়, রামমূর্তির মনে স্ফূর্তিও সেই রকম ম্লান হয়ে গেছে। বাইরে মার খেয়ে আসা ছেলেকে যে মন নিয়ে বাবা আবার বাড়ীতে পিটোয় রামমূর্তির মনের অবস্থা এখন ঠিক সেই রকম। আত্মাভিমানী লোক সমাজে অপমান সওয়ার চেয়ে মৃত্যুকে শ্রেয় মনে করে। রামমূর্তিও ভাবে, কতো ভালো হতো যদি চেয়ারটা আগুনে পুড়ে যেতো! তার জন্যে বাড়ীটাও যদি জ্বলে যেতো, তাতেও তার দুঃখ হ'তো না।

বাইরে থেকে আনা মসনদ, সম্মান হিসাবে পাওয়া পদবী, কিংবা যশ ও আত্মগৌরবের মতো আজ আর চেয়ারটাকে মনে হয় না। শুধু মনে হয় একটা নিষ্ঠুর অধিকার, আত্মম্ভরিতা, অজ্ঞতা আর সংকীর্ণ স্বার্থের মাদকতা ও লালসা।

ভাবে চেয়ারটা আর ফিরিয়ে নিয়ে যাবে না। যদি কেউ পোঁছে দেয় তো ভেঙেচুরে উনুনে পুড়িয়ে দেবে। ভেবে ভেবে মন আরো কঠিন হয়ে ওঠে। আর সে বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না।

বাড়ী ফিরতেই স্ত্রী জিজ্ঞেস করে, 'তোমাকে এতো মনমরা দেখাচ্ছে কেন?' সবসময় হাসিখুশিতে ভরে থাকে সে, এহেন তার চেহারা আজ একেবারে পাল্টে গেছে। স্ত্রী বুঝতে পারে। একটু ভয়ও হয়। স্বামীর এই পরিবর্তন দেখে আশ্চর্য হয়ে যায়।

রামমূর্তি মনের ব্যথা মুখে বোঝাতে পারে না। গলা দিয়ে কোনো স্বর বেরোয় না।

বিকেলবেলা একজন তার রোয়াকে চেয়ারটা রেখে বললো, 'এই রইলো তোমার চেয়ার।' কোনোদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে রামমূর্তি রোয়াকে চেয়ারটা ছুঁড়ে ফেলে। চেয়ারটা ভাঙলো না। রাগে, আক্রোশে আর ক্রোধে অন্ধ হয়ে রোয়াক থেকে ওটাকে তুলে নিয়ে

মাটিতে ছুঁড়ে মারে। তবুও চেয়ার ভাঙে না। অপমানের চিন্তায় লজ্জিত হয়ে পড়ে রামমূর্তি। আবার জোরে ছুঁড়ে মারে। চেয়ারের একটা টুকরো ভেঙে ছিটকে এসে তার পায়ের হাড়েতে লাগে। বেশ যন্ত্রণা হয়। বউ রান্নাঘরে কাজ করছিলো। আওয়াজ শুনে ভাবে বাড়ীতে একটা কিছু অঘটন ঘটেছে। বাইরে এসে দেখে একদিকে খুনীর মতো স্বামী দাঁড়িয়ে আর অন্যদিকে চেয়ারটা ভেঙে পড়ে আছে। কিন্তু তার ছায়াটা তখনও রয়েছে, সেই ছায়াটাও গত সন্ধ্যার ছায়ায় মতো অন্ধকারের রূপ ধারণ করে।

সবকটা টুকরো জড়ো করে সে উনুনে দিয়ে দেয়।

রামমূর্তির চিন্তাকে আমরা ঠিক অনুশোচনা বলতে পারি না; ব্যথায় ভরা অনুশোচনা বলা উচিত। ওর ব্যথা ঠিক ঠিক উপলব্ধি করতে হ'লে সেদিন যে সব ঘটনা ঘটে গেছে তার প্রতিটি ঘটনাকে যথাযথভাবে বুঝতে হবে।

যে ক্ষত হয়েছে তা আস্তে আস্তে মিলিয়ে যাবে। সময়ই আস্তে আস্তে সব ঠিক করে দেবে।

কিছুদিন বাদে রামমূর্তি নিজেকেই নিজে প্রশ্ন করে, 'সেদিন আমার অনুভূতির সঙ্গে চেয়ারটা ভেঙে ফেলার কি সম্পর্ক ছিলো? গদিওয়ালাদের ওপর যদি আমার রাগ হয়েই থাকে, তো চেয়ারটা কি দোষ করেছিলো?'

যখন বড়দের বিরুদ্ধে বলার সাহস হয় না, তখন ছোটদের ওপর নিজের শক্তি জাহির করাটা তো মামুলী ব্যাপার। রামমূর্তি বুঝতে পারে বড়দের দোষের খেসারত ছোটদের কেন দিতে হয়।

চেয়ারটা নির্জীব, রামমূর্তি সেটাকে জড়পদার্থই ভেবেছিলো।

কিন্তু এখন মনে হয় চেয়ারটা যেন কাঁদছে।

কাজের খোঁজে

ওরা চলে গেলো। একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ি, মনটা ভারী হয়ে আসে। চোখে জল। পাথরের মতো দরজায় দাঁড়িয়ে রইলাম। যাবার সময়ে যে কথাগুলো বলে গেলো, কানে সে গুলোই বারবার বাজতে থাকে।

'মা তোমায় ডাকছে,' বিট্টু এসে বললো।

আমাকে চোখ মুছতে দেখে জিজ্ঞেস করে, 'কাঁদছো?'

জীবনে আমি হাসি কখনও দেখি নি। জানি না আমার বাবা কে, মার কোলও কি, তাও জানি না। ওঁরা কিভাবে থাকতেন তাও জানা নেই।

কখনও কখনও ভাবি— যে দেবীর মতো মার মমতা আর দেবতার মতো বাপের আদর পেয়েছে সেই হাসতে পারে। আমার কপালে তো তা লেখা নেই।

দাদা আছেন— কিন্তু তিনি কোনোদিন আমার হাসার সুযোগ দিলেন না। বৌদি আছেন কিন্তু তিনি মার স্থান নিতে পারেন নি, আর কোনোদিন তা নিতেও পারবেন না। এঁদের কাছেই আমি মানুষ হয়েছি।

আমাকে লালনপালন করেছেন দাদা, সমাজে সবাই তাঁকে সম্মানের চোখে দেখে। বৌদিকেও সবাই সম্মান করে। সংসারকে ধাপ্পা দিতে তারা দু'জনেই ওস্তাদ। হৃদয়ে প্রেম না থাকলেও ওপরে প্রেমের ভাব দেখাতে তাঁরা পটু।

অনেক কথাই আমার মনে আছে। দাদার কাছে বোন থাকতো, বড় দীনহীন দশায় তার দিন কেটেছে। আমি পুরুষ, সহ্য আমায় করতেই হবে, তাই অনাদরেও ওঁদের আশ্রয়ে থাকতাম।

বোনের পর মার আরো চারটে সন্তান হয়। তারা সবাই ভাগ্যবান; তাই পরলোকে পাড়ি দিয়েছে। সবার শেষে আমি জন্মাই, জন্মাবার পরেই মাকে, আর কিছুদিন পরে বাবাকে এই দুনিয়া থেকে বিদায় দি। দাদা তাই আমার ওপর বিরূপ।

কিন্তু বোনকে এতো ঘেন্নার চোখে কেন দেখতেন তা আমি বুঝতে পারতাম না।

যাকে সে ভালোবাসতো, তাকে বিয়ে করার সঙ্কল্প নির্ভীকভাবে প্রকাশ করাটাই বোধহয় ওর দোষ হয়েছিলো। আমার চোখের সামনে দাদা বোনকে গলা ধাক্কা দিয়ে বাড়ী থেকে বার করে দিয়ে দরজা বন্ধ করে দেন। আমি অসহায়ের মতো কেঁদেছিলাম; তাই আমার মুখ বন্ধ করে আমাকে টানতে টানতে ঘরের মধ্যে নিয়ে যান।

সেই থেকে আমার মুখ একেবারে বন্ধ। আমার ইচ্ছা তাই সব সময় অপূর্ণ রয়েই গেছে। আমি যে একেবারে বেকার আর অকর্মণ্য। তা না হলে বোনের ঘোর অপমান দেখেও চুপ করে ছিলাম কি করে?

যেদিন বোন এই নরককুণ্ড থেকে প্রাণ বাঁচিয়ে চলে গেছে সেদিন থেকে আমার কাজের ভারও বেড়ে গেছে। ঘরের যাবতীয় কাজ নিজেকে করতে হয়। বৌদির সব সময় অসুখ লেগেই আছে। বৌদিকে দাদা প্রাণের চেয়ে বেশি ভালবাসতেন। বৌদির মাথা ধরলে আমার নিঃশ্বাস ফেলারও সময় থাকতো না। ওষুধ আনতে যাওয়া, দাদাকে অফিস পাঠানো, সবই আমার দায়িত্ব; তাই অন্য-

দিনের চেয়ে আরো একঘণ্টা আগে থেকে নানা রকম কাজে লেগে পড়তাম। দাদা-বৌদি আমাকে একটা হতভাগা ভাবতেন। আমার হাতের রান্নাও তাই আমার কপালের মতো তাঁদের রুক্ষ-সূক্ষ্ম মনে হ'তো। কিন্তু মাসের কুড়িদিন তাঁদের আমার রান্নার ওপর ভরসা করতে হ'তো। তাঁদের দু'জনের মতো রান্না করে রেখে আমি দু'মুঠো খেয়ে স্কুলে চলে যেতাম। স্কুল থেকে ফিরেই আবার সেই হুকুম তামিল, সেই ফরমাস আর গালিগালাজ!

আমার আশা-আকাঙ্খা সবকিছুই যাঁরা টুঁটি টিপে মেরে ফেলেছেন সেই দাদা-বৌদিই আমার এই বেকার জীবনের জন্যে দায়ী।

লেখাপড়া শিখে ভবিষ্যতে জীবনে উন্নতি করার জন্যে আমি ব্যাকুল। আমি নিজেকে কি করে শেষ করে দিতে পারি? এটা ঠিকই যে পরিস্থিতি প্রতিকূল থাকায় আমি পড়াশুনোয় ঠিকমতো মনোযোগ দিতে পারি নি। কিন্তু এই পরিস্থিতির জন্যে কে দায়ী?

দাদা এ নিয়ে কোনোদিনও মাথা ঘামান নি। পরীক্ষায় পাশ করতে পারি নি বলে লেখাপড়াই বন্ধ করে দিলেন। হাইস্কুলে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমার জীবনের সব আশা মিটে গেছে।

স্কুল বন্ধ থাকা অবধি আমি মুখ খুলি নি। দাদা-বৌদির দৌরাত্ম্য সহ্য করে মুখটি বন্ধ করে ওঁদের কথা শুনতাম। ওঁদের শূলের মতো তীক্ষ্ণ বাক্যবাণ মনের গভীরে লুকিয়ে রাখি। কিন্তু স্কুল খোলার ঠিক আগের দিন আমার ইচ্ছের কথা ওঁদের বলবো বলে ঠিক করি। ঠোঁট অবধি এসেও আটকে যায়। শুধু বললাম:

'দাদা, আমি পড়তে চাই।'

দাদা তো রেগেই আগুন।

'এইভাবে প্রত্যেক বছরে তো ফেল করবে। তামাকে মানুষ

করার জন্যে আমার বাড়ীতে তো আর সোনার খনি নেই। এ বংশের মেয়ে যেভাবে আমাদের উদ্ধার করেছে, আমাদের হাল তার চেয়ে বেশি বেহাল করার জন্যে তুমি তৈরি হচ্ছো।' বৌদি খাটে বসেই বলে উঠলেন।

সেই সময় আমি কি যেন এক ভাবের ঘোরে ছিলাম। দাদা এও বললেন আমি যেন মুখ সামলে কথা বলি। আমি তো শুধু বলেছিলাম,— 'পরীক্ষায় আমি কেন পাশ করতে পারি নি। এ বাড়ীর যাবতীয় ফাইফরমাস আর আপনাদের চাকরগিরি করার জন্যেই তো।'

দাদা আমায় মারধোর করলেন। বৌদি কেঁদে ফেললেন— দাদা আমায় মেরেছেন বলে নয়, আমি মুখের ওপর কথা বলেছি বলে।

রাগ, দুঃখ আর নিজের অসহায় ভাব মনের মধ্যেই গুমরোতে থাকে।

সেদিন থেকে এ বাড়ীতে থাকা আরো দুর্বহ হয়ে উঠলো, অবস্থা আরো শোচনীয় হয়ে দাঁড়ালো। কথায় কথায় অভিযোগ, এর চেয়ে ভিক্ষে করে খাওয়া ভালো। রাতে রিক্সা চালিয়ে দিনে পড়াশোনা করা যেতে পারে। অনেক কিছুই ভাবতে থাকি, কিন্তু কি করবো ভেবে ঠিক করতে পারলাম না।

একদিন বৌদির প্ররোচনায় দাদা বললেন, 'এইভাবে কতদিন আর বাড়ীতে বসে ভেরেণ্ডা ভাজবে? কাজকর্মের একটু খোঁজখবর কর না?'

কাজ! আমি কি চাকরী পাবো? আমায় কে চাকরী দেবে? আমি কালেক্টার হতে চাই না, পাখার তলায় বসে দশটা লোককে হুকুম করবো সেরকম কোনো সাধও আমার নেই। সাধারণ মামুলী একটা চাকরী হলেই যথেষ্ট।

কিন্তু আমার কাছে সব কিছুই স্বপ্ন। দাদা খুব সহজভাবেই বললেন, 'কোথাও একটা কাজ খুঁজে নাও।' কিন্তু উনি ভালোভাবেই জানেন যে আমি চাকরী খোঁজারও উপযুক্ত নই।

সময় কারুর জন্যেই অপেক্ষা করে না। তাই আমার ঘোর দুর্দিনও কেটে গেলো। অনেকদিন ধৈর্য ধরার পর ঠাকুর আমার কথা শুনলেন। হায়দ্রাবাদ থেকে চিঠি এলো। পথভোলা পথিক যেমন পাহাড় দেখলে বল পায় তেমনি মামার চিঠি পেয়ে আমি যেন হাজার হাতীর বল পেলাম।

উনি লিখেছেন যে ওখানে কোনো না কোনো একটা চাকরী তিনি জোগাড় করে দেবেন, আর সে ভার তার নিজের। দাদাকে নির্দেশ দিয়েছেন, আমাকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব যেন হায়দ্রাবাদে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। সেই সময় আমার স্বপ্ন যা মরে ভূত হয়ে গিয়েছিলো সেও এক মুহূর্তের জন্যে বেঁচে ওঠে। মনে আশা আর রঙবেরঙের স্বপ্ন জেগে ওঠে।

এখন আমি কাজ পেয়েছি। কাজ করার সঙ্গে পড়াশোনা করার সুযোগও পেয়েছি। ভাবি, লেখাপড়া শিখে আমি মানুষ হয়ে উঠেছি।

পরনে সাদা সার্ট, সাদা প্যাণ্ট ; বাঁ হাতে সুন্দর এক ঘড়ি ; কালো কালো বাব্‌রি করা চুল, চুল থেকে দামী তেলের সুগন্ধ ভেসে এসে মনকে স্নিগ্ধতায় ভরে দেয়। রাস্তা দিয়ে দাদার চেয়েও বেশি ভারিক্কি চালে হেঁটে যাই, হাতে থাকে অফিসের ফাইল। যেতে যেতে নোংরা একটা জায়গায় হঠাৎ থেমে যাই। কে ? ও কে ?

বোন ?

বোনের কথা মনে হতেই আমার সব স্বপ্ন ভেঙে চূরমার হয়ে

যায়— ভেবেছিলাম, চাকরী পাবার পর বোনের খোঁজ করে তার পায়ে পড়বো আর বলবো, দিদি, আমি বেঁচে আছি, তোমার আর কোনো ভয় নেই। ছোটবেলায় আমি অকর্মণ্য আর নির্বোধ ছিলাম, আমার জন্যে তোমাকে ঘর ছাড়তে হয়েছিলো, তোমাকে দাদা তাড়িয়ে দিয়েছিলে।। এখন আমি মানুষের মতো হয়েছি। মামার দৌলতে চাকরীও পেয়েছি। নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছি। অনেক পড়াশুনো করে বড় চাকরী পেয়ে মেরু পর্বতের মতো এখন তোমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছি। তুমি কি আমায় চিন্তে পারছো না! আমি তোমার ছোট ভাই চিট্টি (খোকন)।

মনটা ভারী হয়ে ওঠে। মামার চিঠিটা বুকে চেপে ধরি। এই চিঠিই আমার সৌভাগ্যের কারণ। দাদা এসে পড়লেন—

'বোকচন্দ্রের মতো কি ভাবছো? দিনদুপুরে কি স্বপ্ন দেখছো? ঠিক আছে; এখানে যদি এতোই কষ্ট মনে হয় তো ওখানকার অবস্থা একবার দেখে এসো।' বেশ বিরক্ত হয়ে বলে ওঠেন।

দাদা-বৌদি আমার হাত থেকে রেহাই পেয়ে খুশীই হয়ে থাকবেন। চাকরের বেয়াদপি সহ্য হয়; কিন্তু যে চাকর অধিকার, কর্তব্য আর আইনকানুনের প্রশ্ন তোলে, তাকে কোনো মালিকই সহ্য করতে পারে না। তাই মনে হয় তাঁরা খুশীই হয়ে থাকবেন। রেলগাড়ীতে চড়ার সময়ও দাদার ব্যবহারে এতটুকু পার্থক্য দেখলাম না। হায়দ্রাবাদ পৌছলাম। অমরাবতীর মতো সুন্দর অট্টালিকাতে ঢুকতেই আমার ভয় করছিলো। এতো ঐশ্বর্য আর এতো সম্মান। সেই মামা আমায় আশ্রয় দিয়েছেন। কি ভাবে আমাকে চলতে হবে তাই ভাবছিলাম।

মামা যেন দেবতা। ভয়ে থরথর করে কাঁপতে দেখে বললেন,

'এ বাড়ীও তোমার।' সহজ সরল হাসি। মনে হ'লো আমি এ বাড়ীরই একজন।

মামীমা বিশেষ কথাবার্তা বলতেন না। বেনুদাদা আর সুগুণম্মা আমার সঙ্গে খুব মেলামেশা করতো। বেনুদাদা ডাক্তারী পড়া শেষ করেছে, সুগুণম্মা কলেজে পড়ে।

দু'জনকেই দেখতে সুন্দর, শরীরের গঠনও খুব চমৎকার। আলাপ-ব্যবহারে বেশ বনেদীয়ানা।

ওদের কাছে আমি যেন কিছুই নই। কিন্তু ওদের আদর আর ভালোবাসা আমাকে সব কিছু ভুলিয়ে দেয়। আমাকে যেন এক অদৃশ্য শক্তি এই পরিবেশে আত্মবিভোর করে রাখে। সেই অদৃশ্য শক্তিকে স্মরণ করি আর করজোড়ে প্রণাম জানাই।

হায়দ্রাবাদে এসেও দু'মাস কাটলো।

মামা অষ্টপ্রহরই কোনো না কোনো কাজে ব্যস্ত। তাঁর কাছে চাকরীর ব্যাপারে কথা বলার সাহস আমার হ'লো না।

একদিন বেনুদাদা বললো, 'তুমি ভারি সুন্দর কফি তৈরি করো।' আমি লজ্জায় লাল হয়ে উঠি।

'সত্যি বলছি ··· এতো ভালো করে রান্নার কাজ শিখতে কত সময় লাগে? তোমাকে কে শিখিয়েছে? পরশু তুমি যে বেগুনের তরকারী রেঁধেছিলে 'রিয়েলি' 'লভলি' হয়েছিলো। কতবারই ভাবলাম তোমাকে বলবো, কিন্তু একেবারে ভুলে গেছি। সত্যি বলছি, মাও এত ভালো রাঁধতে পারে না।' আমার চোখে চোখ রেখে বেনুদাদা কথাগুলো বলে গেলো।

'দাদার ওখানে আমিই রোজ রান্না করতাম। ওরা কিন্তু কোনো-দিনও ভালো বলে নি।'

'ওরা আবার স্বাদের মর্ম কি বুঝবে?'

বেনুদাদা আমাকে গাছে তুলছেন বুঝলাম। তা বুঝে আমিও আমার কথাটা বলে ফেলি।

'মামাবাবু এখনও আমাকে কোথাও কাজে লাগালেন না। তুমি যদি তাঁর কাছে আমার চাকরীর ব্যাপারে একটু বলো তো বড় ভালো হয়। আমি নিজেই তাঁকে বলবো ভাবি, কিন্তু ভয় করে।'

বেনুদাদা হো হো করে হেসে উঠলো।

'আরে ভয়ের কি আছে? বাবা তো আর বাঘ-ভাল্লুক নয় যে তোমায় খেয়ে ফেলবেন। আচ্ছা, ঠিক আছে, আমিই বাবাকে বলবোখন।'

ফেরার সময় সুগুণম্মার ঘরে খিলখিল করে হাসির আওয়াজ পেলাম। সুগুণম্মার দু'জন বান্ধবী তার সঙ্গে গল্প করছে। মনের আনন্দে আমি রান্নাঘরের দিকে যাচ্ছিলাম। সুগুণম্মা হঠাৎ পেছন থেকে ডাক দিলো। ওঘরে মেয়েদের সামনে যেতে আমার একটু বাধো বাধো ঠেকে।

'ইনিই আমাদের রাজা নল। এখুনি তোরা যে কফির এতো প্রশংসা করছিলি তা ইনিই তৈরি করেছেন। ইনি আমার মামাতো ভাই। আমার চেয়ে পড়াশোনায় কম আর বয়সে ছোট, তা না হলে আমি এঁকে বিয়ে করতে রাজী হয়ে যেতুম। 'বাওয়া'[১], এরা আমার বান্ধবী।' সুগুণম্মা ঠাট্টা করে বলে।

বান্ধবীরা খিলখিল করে হেসে ওঠে। আমি ঘর থেকে বেরিয়ে আসি। সুগুণম্মার কথা এখনও কানে বাজচে।— 'বয়সে আর

১ মামাতো ভাইকে তেলুগুতে বাওয়া বলে, তার সঙ্গে বিয়েও হতে পারে।

লেখাপড়ায়' আমি ছোট। আর কোনো বিষয়ে নয়। এই যথেষ্ট। সুগুণম্মার অন্তরে আমার প্রতি কোনো বিরূপ মনোভাব নেই এখানে আমার ভেতর প্রাণসঞ্চার করার লোক আছে।

পরের দিন বেনুদাদার জন্মদিন।

এলাহিভাবে জন্মদিন পালন করা হ'লো। সেদিন সকালবেলা থেকেই আমি কাজে ব্যস্ত। দম ফেলারও ফুরসত নেই।

সন্ধ্যেবেলায় বেনুদাদার সব বন্ধুবান্ধবরা এসে হাজির। অর্ধেকের বেশী মেয়ে। যা যা রান্না করেছিলাম তা পরিবেশন করলাম সবাই বেশ সেজেছে, নিজে ওদের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছি দেখে বেশ আনন্দ হচ্ছিলো। বাড়ীটাও সুন্দর করে আজ সাজানো হয়েছে। যাঁরা এসেছেন তাঁদের কথায় আর হাসিতে আমি এক নতুন আমেজ অনুভব করতে থাকি।

চশমাপরা এক ভদ্রলোক আমার বিষয় দাদাকে কিছু বলছিলেন—

'আচ্ছা, বেনু! তোমাদের নায়র কোথায় গেলো? মনে হচ্ছে কোনো নতুন লোক রেখেছো?'

'ও তো রাগ করে গ্রামে চলে গেছে। একে আমাদের গ্রাম থেকে আনানো হয়েছে।' বেনুদাদা উত্তর দেয়।

'ভালই হয়েছে। এ তো ওর চেয়ে বেশি কাজের লোক।'

চশমাপরা ভদ্রলোকের প্রশংসায় আমি বিশেষ খুশি হলাম না। আমার বিষয় সকলকার সামনে বেনুদাদার এভাবে বলায় ভীষণ দুঃখ পাই। তা হলে আমি কি এদের বাড়ী বামুনঠাকুরের কাজ করতে এসেছি? এই সহরে বড় চাকরী পাবার যে কথা হয়েছিলো সেকি এই? তাড়াতাড়ি একটা কোণায় সরে গিয়ে চোখের জল মুছি। কাঁধের ওপর কে যেন হাত রাখলো, আমি চমকে উঠি।

ভাস্করমদা।

ভাস্কর বেনুদার বন্ধু। ছু'জনে একসঙ্গে লেখাপড়া করেছেন। প্রায়ই এখানে আসেন। এলে পরেই আমার সঙ্গে ছু'চারটে কথা বলেন। আজ তিনি শুধু কথা বলতেই আসেন নি, উপদেশ দিয়েও গেলেন। একথা তিনি নিজেই আমাকে বললেন।

'আমি জানতাম তোমার একদিন এই দশাই হবে। বড়লোকেদের সামনে তুমি নিজে বড় ছোট হয়ে যাও। এখানে এসে তুমি বড় ভুল করেছো। আজ তোমায় যে অপমান করেছে তাতে ছুঃখ পেও না, ধৈর্য ধরতে হবে। এখানে থেকেই নিজের উন্নতির চেষ্টা করতে থাকো। কোনো সাহায্যের দরকার হলে আমার কাছে এসো। কিন্তু কোরো না।'

এই বলে উনি চলে গেলেন।

ছুঃখে অপমানে ভেঙে পড়ি।

সাহস করে সেদিন রাতেই মামাবাবুকে গিয়ে বললাম,

'আমি চাকরী করতে চাই।'

বেশ আশ্চর্য হয়ে গেলেন মামাবাবু। আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'চাকরী না থাকায় তোমার কোনো জিনিসের কি অভাব হচ্ছে?'

'অভাবের কথা বলছি না আমি, চাকরীর জন্যে আমি এখানে এসেছি।'

'ঠিকই বলছিস্ বাবা! বল্‌তো, লোকে চাকরী করে কেন? পেট চালানোর জন্যেই তো? চাকরী না করেই তো খাওয়াপরা ঠিক চলছে। তা হলে এত চিন্তার কি? আমাদের সঙ্গে এখানেই থাক্। আমরা যা খাচ্ছি তুইও তাই খা। ব্যস, আর কি?'

মামাবাবুর কথার ইঙ্গিত আমি বেশ ভালোভাবেই বুঝতে পারলাম। কি উত্তর দেবো বুঝে উঠতে পারি না।

'এর জন্যে দাদার বাড়ী ছেড়ে এখানে আসার কি দরকার ছিলো। পেট তো ওখানেও ভরতো। মামাবাবু, আপনাদের সকলের গোলামী করবো, আমি তা ভেবে আসি নি। আমার জীবনেও আশা-আকাঙ্খা আছে। তাই নিয়ে আমি বেঁচে আছি। আমাকে বাঁচতে দিন মামাবাবু, আমাকে বাঁচতে দিন।'

মামাবাবু চটে উঠলেন। 'হ্রস্বই দীর্ঘই জ্ঞান নেই, কি যা তা বকে যাচ্ছিস? সেদিন তোর বোনও এইরকম আজেবাজে কথা বলে মাথার ওপর বিপদ টেনে এনেছে। এখন ওর স্বামী মরতে বসেছে। এখন পয়সা চাই, ওষুধ চাই ইত্যাদি লক্ষ কথা লিখে পাঠাচ্ছে। সেদিন তার আমার কথা ভালো লাগে নি; তোর দাদার কথাও না। এই নে, এই চিঠিখানা পরে দেখ্। ওর অবস্থা বুঝতে পারলে তোর চোখ খুলবে। তা না হলে তোরও ওর মতোই সর্বনাশ হবে। এখন যা··· কাল এই সময় কি স্থির করলি, আমায় জানাস্।'

ছলনা, কপটতা, ধোঁকাবাজি, অন্যায়!

আমার মতামত এতোক্ষণে মামাবাবু জানতে পেরেছেন নিশ্চয়।

জামাইবাবুর অবস্থা দেখে বুক কেঁপে ওঠে। বিছানায় শরীর মিশে গেছে। দিনে দিনে তাঁর অবস্থা খারাপের দিকে চলেছে।

দিদির চোখে আজ আর সে চমক নেই, কথায় সেই আনন্দ আর নেই, প্রাণ নেই। এই পরিবর্তনের কারণ যে জামাইবাবুর অসুখ সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। অষ্টপ্রহর জামাইবাবুর সেবা করছে। তার ওপর ছোটুর হৈ-হুল্লোড়।

এই দিদির সংসার।

এ বাড়ীতে পা ফেলার পর থেকে নিঃশ্বাস নেবারও ফুরসৎ নেই। রান্না, বাচ্চাকে দেখা, ওষুধপত্র নিয়ে আসা— সবই ঘাড়ে পড়েছে।

কিন্তু অনেক তফাৎ। অন্য ছ'বাড়ীতে আমি ব্যাগার খেটেছি। নিজের আত্মসম্মান জলাঞ্জলি দিয়ে, কিছুটা ভয়ে আর কিছুটা লোভে পড়ে ঐ ছ'বাড়ীতে আমি চাকরের কাজ করেছি।

কিন্তু এখানকার কথা আলাদা।

এ যে আমার প্রাণের চেয়ে প্রিয় বোনের বাড়ী। আমার সেবা-শুশ্রূষায় জামাইবাবু যদি ভালো হয়ে ওঠে, সেই আশায় আমি সব কিছু ত্যাগ করতে রাজি। পড়াশোনা করে বড় চাকরী পেয়ে আমি কাকে আনন্দ দেবো? বোনের সেবা যতই করি না কেন তাতে আমার ক্লান্তি আসবে না। আমার আত্মাভিমানে ঘা লাগবে না। বরঞ্চ মনে একটা অদ্ভুত শান্তি পাবো। দরকারের সময় বোনের আমি কাজে লেগেছি, সেই আনন্দই আমাকে চিরকাল পূর্ণ করে রাখবে।

কিন্তু ভাস্করদা এসব কথা কেন বুঝতে পারলেন না। আমায় তিনি খুবই ভালোবাসেন। কিন্তু তাঁর কথা আমায় যে কত আঘাত করলো তা তিনি কল্পনা করতে পারলেন না।

এ গ্রামেই তাঁর সঙ্গে আমার দেখা। জামাইবাবুর ওষুধ আনতে গিয়েছিলাম, ওনার সঙ্গে দেখা। তাড়াতাড়ি আমার কাছে এগিয়ে এসে বললেন, 'ওখান থেকে চলে আসার আগে আমাকে জানিয়ে এলে পারতে।'

আমি চুপ করে রইলাম।

'আচ্ছা। এখানে কি কাজ পেলে? বোনের বাড়ী ব্যাগার খাটছো, এই তো?'

'ডাক্তারবাবু!'

আমি চিৎকার করে উঠি। আমার চোখের দিকে তাকিয়ে তিনি চুপ করে যান। লজ্জায় মরে যাই।

'ক্ষমা করবেন। আপনি একবার আমার জামাইবাবুকে দেখতে চলুন। আমাদের বাড়ী খুব কাছেই। আমার বোনের সঙ্গেও আলাপ হবে। সব দেখেশুনে আপনার যা খুশি বলবেন। আমি এতোটুকু দুঃখ পাবো না। আসুন ডাক্তারবাবু।'

অন্য কেউ হলে আমি নিজের মনের কথা এতো খুলে বলতে পারতাম না; আর বলার দরকারও হোতো না। উনি খুব উদার-চেতা। তাই আমি চাই না যে উনি ভালো লোকেদের ভুল বোঝেন। তাই তাঁকে বাড়ী নিয়ে এলাম। পাশে বসিয়ে সব বোঝালাম।

জানি না উনি কি বুঝলেন, আমাকে কিছুই বললেন না। জামাই-বাবুকে পরীক্ষা করে দেখলেন। ছোট বাচ্চাটার গাল টিপে আদর করে হাত দোলাতে দোলাতে বেরিয়ে গেলেন। আমিও পিছু পিছু চললাম।

'তুমি অনেকবার বলেছো যে তুমি আরো পড়াশুনা করতে চাও। তোমার জন্যে তাই দুঃখ হয়। অনেক কথাই বলার আছে কিন্তু আমি কিছুই বলতে চাই না। তোমার পড়াশোনার ব্যবস্থা আমি ঠিক করে ফেলেছি। তোমাকে কথাটা বলবো ভাবছিলাম, ইতিমধ্যে তুমি এসেই পড়লে। এখন ··· ' উনি আরো কিছু বলতে যাচ্ছিলেন। তাঁর কথার মাঝেই আমি বলে উঠি, 'না ডাক্তারবাবু! পড়াশোনা করার আর আমার ইচ্ছে নেই। এখন শুধু আমি দিদিকে সুখী দেখতে চাই। জামাইবাবুর অবস্থা আপনি দেখলেন। আপনার

যতটুকু করা সম্ভব, আপনি করুন। জামাইবাবুকে বাঁচিয়ে তুলুন। তা হলেই আমি খুশি। আমি আর কিছু চাই না।'

যেতে যেতে আমার পিঠ চাপড়ে তিনি বললেন, 'এ দুনিয়ায় কিছু হতভাগা জন্মায়। তাদের সুখী করা সম্ভব নয়।'

ওঁর এই শেষ কথাগুলোর কি ইঙ্গিত? আমার দুর্ভাগ্যকে ইঙ্গিত করেই কি বলেছিলেন? না জামাইবাবুর সঙ্গীন অবস্থা দেখে?

হে ঈশ্বর! বলে দাও এই ইঙ্গিত কি আমার প্রতি। আমি অভাগা, আমি···।

বাংলো বাড়ী

'এলে বরষায়··· '

'আরে আহম্মুক— তেলেগু গান বাজা !'

'তুমি চুপ করো বালম্মা··· '

'চুপ করবো কেন ! টাকাকড়ি তো ঐ নিষ্কর্মাকে দিয়ে এসেছো। তেলেগু গান বাজা !'

রাজয়্য়া রেকর্ড পাল্টে তেলেগু গান দেয়—

'রাদে চেলি নম্ম, রাদে চেলি' রেকর্ডটা বাজায়।

এক হপ্তা হ'লো আমি এখানে এসেছি। বিকেল ছটা বাজতে না বাজতেই এ রেকর্ড বাজানো সুরু হয়। আমাদের বাড়ীর সামনে খড়ের ছাউনী দেওয়া একটা বাড়ী, বাড়ীর সামনে মাটির ছোট ছোট দাওয়া, গোবর দিয়ে ল্যাপা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন উঠোনে পুরোনো ছেঁড়া একটা কম্বল বিছিয়ে রাজয়্য়া রোজ গ্রামোফোন বাজায়। মাটির দাওয়ায় বসে বালম্মা চাল বাছে। খাঁচার মুরগীগুলো সন্ধ্যেবেলা ছাড়া পায়, মনের আনন্দে তারা রাজয়্য়া আর বালম্মার চারিদিকে চড়ে বেড়ায়।

একহপ্তা ধরে রোজই আমি এই সব দেখছি। দিদি যখন নীচে রান্নাবান্না করেন তখন আমি ছাদে উঠে ঠাণ্ডা হাওয়ায় পড়াশোনা করার চেষ্টা করি। বইয়ের একটা পাতাও উল্টোতে পারি না। রাজয়্য়া বার বার সেই এক গান 'এলে বরষায়··· ' বাজাতে

থাকে। গানটা যতই ভালো হোক না কেন, কতবার আর শোনা যায়।

রাজয়্যার বাজানো রেকর্ড, এর সঙ্গে মুরগীদের ডাক; আর এই দুইকে ছাপিয়ে বালম্মার গালিগালাজ— সবমিলিয়ে আমার পড়া মোটেই এগোয় না। কখনও রাজয়্যাকে কখনও বা অন্য কাউকে বালম্মা অনর্গল গালিগালাজ করতে থাকে।

বাংলো বাড়ীর ছাদে দাঁড়ালে দূরে বঁনজারা হিলসের বড় বড় অট্টালিকার দীপমালা দেখা যায়। আমাদের বাংলো বাড়ীর কাছেই বড় বড় পাথর, একটা আর-একটার গায়ে লেগে আছে, কিন্তু দেখায় যেন ছাড়া ছাড়া। পাথরগুলো দেখে আমি ভয় পেতাম। পাথরগুলোর মধ্যে একটা যদি এদিক-ওদিক হয়ে যায় তো আমাদের বাড়ীর ওপর এসে পড়তে পারে। লোকে বলে পাথরগুলো ঠিক ঐ জায়গায় ঐ ভাবেই গত পঞ্চাশ বছর ধরে আছে। এদিকে এই ভূতের মত কালো পাথর আর অন্যদিকে কান ফাটানো 'এলে বরনায়…' গান। পড়া হবে কী করে? এই গালাগালি আর চেঁচামেচির মধ্যে পাহাড়ের আড়ালে লুকিয়ে থাকা সূর্যকে আমি ঠিকভাবে দেখতে পেতাম না।

জামাইবাবু হায়দ্রাবাদে ট্রান্সফার হয়েছেন, বারবার আমাকে আসার জন্যে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। ছ'মাস ধরে ডাকার পর শেষে গত ডিসেম্বরে আমি হায়দ্রাবাদে এসেই গেলাম। ওঁর বাড়ী খৈরতাবাদের একটা ছোট্ট গলির মধ্যে। বাড়ীটা বাংলো প্যাটার্নের, আর গলির একেবারে শেষ প্রান্তে। সরু গলির মধ্যে বাড়ীটাই শুধু যা একটু বড়। চারিদিকে ছোট ছোট কুঁড়ে ঘর থাকা সত্ত্বেও দিদির বাড়ীটায় সবরকমের সুখসুবিধে আছে। ঘরদোর পরিষ্কার, বাসন

মাজা, ঝাঁট দেওয়া ; সবকাজই সামনের কুঁড়ের ঐ রাজয়্য়া কিংবা বালম্মা করে দিতো। রাজয়্য়া ভোর চারটের সময় উঠে বাইরের আঙিনাটা গোবর দিয়ে লেপে সিমেণ্টের মতো পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে দিতো, সাজিয়ে গুছিয়ে রাখতো। রাজয়্য়া প্রতিদিন সকালে সব কটা ঘরই ঝাড়ু দিতো খুব সন্তর্পণে··· খুব সাবধানে ··· এতো সুন্দর-ভাবে ঝাড়ু দিতো যে মনে হ'তো না যে ঝাঁট দিচ্ছে। তারা দু'জনেই ঘরদোরের কাজ করতো। দিদি ও জামাইবাবু তাদের খুব সম্মানের চোখে দেখতেন। দিদি-জামাইবাবু ওদের একটু ভয়ও করতেন। একদিন সকালের একটা ঘটনা থেকে আমি এটা আঁচ করি।

সকালে কফি খাওয়ার পর্ব চুকলে, আমি পেরেক ও হাতুড়ি নিয়ে গতদিনের প্রদর্শনীতে কেনা রবীন্দ্রনাথের একটা ছবি ড্রয়িং-রুমের দেওয়ালে টাঙাচ্ছিলাম আর জামাইবাবুকে বলেছিলাম এটা আপনার ঘরে বেশ মানাবে। হঠাৎ রাজয়্য়া কোথা থেকে ঝড়ের বেগে ছুটে এলো।

'কিসের শব্দ দিদিমণি।' আমার দিকে তাকিয়ে বেশ রাগ দেখিয়ে বললো।

'কিছু নয়।' ওর দিকে না তাকিয়েই জবাব দি। আর মনে মনে ভাবি আমাকে প্রশ্ন করার তুমি কে হে।

'এ কি করছো, দেওয়ালটা নষ্ট করছো, ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও,' বেশ আদেশের স্বরে সে বলে।

'তোমার তাতে কি? যাও এখান থেকে।' রাগের মাথায় এই কথা বলতে যাচ্ছিলাম। দেখি রান্নাঘর থেকে দিদি আর বাথরুম থেকে জামাইবাবু ছুটে এলেন। ভেবেছেন আমি একটা কিছু গণ্ডগোল বাধিয়েছি।

'কি হয়েছে রে?' দিদি আমায় জিজ্ঞেস করেন।

'কিছুই হয় নি। আমি দেওয়ালে পেরেক পুঁতছি। ও আমাকে বারণ করার কে?'

'দেখুন তো, আমি দিদিমণিকে বারণ করছি পেরেক পুঁততে। কিন্তু উনি আমার কথা শুনছেন না। বাড়ী নষ্ট হয়ে যাবে।' দাদাবাবু জামাইবাবুকে রাজয়্যা বলে।

'আমি বারণ করে দিচ্ছি। তুমি বাড়ী যাও রাজয়্যা!' বলে জামাইবাবু সেদিন আর আমাকে পেরেক পুঁততে দিলেন না।

অনেক মাথা ঘামিয়েও বুঝতে পারলাম না দিদি জামাইবাবু রাজয়্যার কথাগুলোর এতো গুরুত্ব দিলেন কেন? দেওয়ালে পেরেক পোঁতা নিয়ে বাড়ীওয়ালার চেঁচামেচি আর ভাড়াটের ভয়-ভীতি প্রায়ই দেখা যায়। কিন্তু চাকরকে এই রকম ভয় পাওয়া, এর আগে আমি আর কখনও দেখি নি।

চতুর্থ দিন বিকেলে আমি ছাদে দাঁড়িয়েছিলাম, দিদি রান্নাঘরের কাজে ব্যস্ত ছিলেন। জামাইবাবু তখনও আফিস থেকে ফেরেন নি। সামনে প্রতিদিনের মতো আজও সেই একই দৃশ্য। কিন্তু গ্রামোফোনের আওয়াজ শোনা যাচ্ছিলো না। রাজয়্যা চুরুট মুখে দিয়ে দাওয়ায় বসে ছিলো। বালম্মা ফটকের কাছে বসে আপন মনে কাউকে গালাগালি দিতে দিতে চাল বাচ্ছিলো আর মাঝে মাঝে চোখের জল ফেলছিলো।

দূরে অর্থাৎ গলির ও মোড়ে আমি জামাইবাবুর মাথায় হ্যাটটা দেখতে পেলাম। ওঁকে 'ওয়েভ' করে আমি ছাদের পাঁচিলের ওপর ঝুঁকে দাঁড়ালাম। রাজয়্যা চুরুট ফেলে দিয়ে হাত জোড় করে নম্রভাবে দাঁড়িয়ে উঠলো। রাজয়্যা খুবই রোগা পাতলা, ঠিক

প্যাঁকাটির মতো। দেখলে মনে হয় বয়স পঞ্চাশের বেশি। ধুতি সবসময় হাঁটুর ওপরই থাকে। মাথায় ধাবীদার পাগড়ী বেঁধে নীল রঙের জামা পরে দাঁড়িয়ে রাজয়্যা। বালম্মার গলার স্বরের মতো তার দেহের গঠনও বেশ ভরা ভরা। কালো রঙ, একটু মোটা ও বেঁটে। চৌকোড়ুরে শাড়ী, পেছনে কাছা দিয়ে পরা। হাতে ঝকমকে চুড়ি, কপালে সিকি মাপের একটা টিপ। বয়স চল্লিশের ওপরই হবে। আঁচলটা মাথায় দিয়ে চালের পাত্রটা দরজার কাছে রেখে সে দরজার কাছে দাঁড়ালো।

জামাইবাবু দরজার কাছে পৌঁছোতে না পৌঁছোতে রাজয়্যা জিজ্ঞেস করে, 'বাবুজী, ওর পয়সা মিটিয়ে দিয়েছেন?'

'হ্যাঁ, রাজু, দিয়ে দিয়েছি।'

'কত দিলেন?' রাজয়্যা প্রশ্ন করে।

'প্রত্যেকবারের মতো এবারেও পঁচাত্তর টাকাই দিয়েছি।' এই বলে জামাইবাবু ওপরে চলে এলেন।

রাজয়্যা আবার একটা চুরুট ধরিয়ে বাড়ীর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে। পেছনে দাঁড়িয়ে বালম্মা আরম্ভ করে— 'পয়সাও ওর গহ্বরে যাচ্ছে, বাড়ীটাও ওর হয়ে গেলো— তোমার সঙ্গে আমিও একেবারে বিকিয়ে গেলাম, আমার সোনাও মাটি হয়ে গেলো।' এই বলে বালম্মা চিৎকার করে কান্না জুড়ে দেয়। খানিকক্ষণ রাজয়্যা তাকে বোঝাবার চেষ্টা করে, তারপর দুটো চড় কসিয়ে দেয়। চড় খেয়ে বালাম্মা আরো জোরে কাঁদতে লাগলো।

হালকা চাঁদের আলো আমাদের বাড়ীর পাশে পাথরগুলোর ওপর পড়ে ঝিলমিল করছিলো। পাথরের ওপর ঘুঁটেগুলো বেশ মজার দেখাচ্ছিলো। স্নিগ্ধ জ্যোৎস্না, জামাইবাবু চিন্তায় বিভোর হয়ে

আকাশের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। দিদি পরের দিন রান্নার জন্যে সিম ছাড়াচ্ছিলেন। বাইরের কান্না থেমে আবার 'এলে বরষায়' রেকর্ড বাজতে শুরু করলো। গানটা শুনেই আমার মাথায় রক্ত চড়ে গেলো। আমি বললাম, 'আমার কথা শুনুন, রাজয়্যাকে দুটো রেকর্ড কিনে দিন, অন্তত কিছু ভ্যারাইটি তো হবে।'

জামাইবাবু মনে মনে হাসলেন কিন্তু মুখে কিছু বললেন না।

'রাজয়্যা টাকাপয়সার কথা কিছু বলছিলো।' জামাইবাবুর সঙ্গে কথা বলার অছিলায় আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'আজ সম্ভবত দু'তারিখ। আমি তো ভুলেই গেছিলাম। আজকের তারিখটা আমার চেয়ে রাজয়্যাই বিশেষ করে মনে রাখে।' দিদি জামাইবাবুকে বললেন।

'এর মধ্যে এমন কি রহস্য আছে যে আমাকে বলা যায় না?' জামাইবাবুকে জিজ্ঞেস করি।

'রাজয়্যার মতো যারা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে রোজগার করে তাদের মাসের দু'তারিখ মনে রাখারই কথা। আমাদের মতো যারা বসে বসে আরামে খায় তাদের দু'তারিখও যা, বিশ তারিখও তাই।' জামাইবাবু দিদিকে বললেন।

'মাথার ঘাম পায়ে ফেলে খাটলো তো, কিন্তু লাভ কি হ'লো তাতে? সবই তো মাটিতে মিশে গেলো। এখন বাড়ীর কথা ভেবে লাভটাই বা কি?' সিমের বীচিগুলো বাটিতে রাখতে রাখতে দিদি জবাব দিলেন।

'লাভ কিছুই নেই। দশ বছরের উপযুক্ত একটা ছেলেকে হারিয়ে মা-বাবা তার জন্যে চোখের জল ফেলবে না? মার প্রাণ তো, কাঁদবেই। বেচারা রাজয়্যার ব্যথাও অনেকটা সেই রকম। প্রাণের

চেয়ে প্রিয় তার যে বাড়ী সেটা পরের হাতে চলে গেলো, দুঃখ তার হবে না? মায়া এমনই জিনিস! মাস গেলে পাঁচশো করে টাকা তুমি পাও, ওদের ব্যথা তুমি কি বুঝবে?' জামাইবাবু দিদিকে কথাগুলো একটু কটাক্ষ করেই বললেন।

'আসল ব্যাপারটা কি?' দিদিকে জিজ্ঞেস করলাম।

'ওঁকে জিজ্ঞেস করো, উনিই সব কথা বলবেন।'

জামাইবাবু আরম্ভ করলেন:

'এই ঘষা রেকর্ডের আড়ালে ওর ভাঙা মন আমরা আর দেখতে পাই না। আসলে অন্যদের ব্যথা বোঝবার মতো মনের অবস্থা আমাদের নেই। রাজয়ুয়া ঘরদোর ঝাঁট দেয় আর বালম্মা দিনরাত গালিগালাজ করে। এটাই শুধু আমরা দেখি। আমাদের এই বাড়ীর ভিতে এদের দুটো জীবন একেবারে মিশে আছে। ওদের হাড়ভাঙা পরিশ্রম দিয়ে এই বাড়ীর দেওয়াল তৈরি হয়েছে।' জামাইবাবু খুব ভাবের ঘোরে কথাগুলো বলে ফেলেন।

'তাজমহল তৈরি করার সময়ও মজুরদের দরকার হয়েছিলো। সেটা রাজারাজড়াদের কাজ নয়। তাই এ বাড়ীটা তুমি আমি তৈরি করি নি।'

'রাজয়ুয়ার মতোই মজুররা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে বাড়ী তৈরি করে। এমন কোনো বাড়ী আছে যার ভিত মজুরদের ঘামে সিক্ত হয় নি?' আমি নিজের যুক্তির অখণ্ডতা প্রমাণ করার জন্যেই কথাটা বললাম।

'যদি রাজয়ুয়াই শুধু মজুরীর লোভে এ বাড়ীটা তুলে থাকতো তা হলে কারুরই দুঃখ করার ছিলো না। আমার মনে হয় সেও তা হলে এতো কাঁদতো না। আসল ব্যাপারটা কি, শোনো। সে

প্রাণপাত করে নিজের রোজগারের পয়সা আর পরিশ্রম দিয়ে এ বাড়াটা তৈরি করে। প্রত্যেকটা ইঁট তার নিজের হাতে গাঁথা। এক বছর আগেও দশ হাজার টাকা মূল্যের এই বাড়ীটা রাজয়্যারই ছিলো। আজ সেই রাজয়্যাই এই সামনের কুঁড়ে ঘরে থাকে। এখন ওটাই শুধু তার একমাত্তর সম্পত্তি।' জামাইবাবু আস্তে আস্তে বলেন।

আমার আশ্চর্য লাগে। ঝাড়ুদার এই রাজয়্যা এতো বড় বাড়ী কি করে তৈরি করলো? আর যদি নিজের মেহনত দিয়ে তৈরি করে থাকে তো সেটা হারালোই বা কি করে? রাজয়্যার ঘর থেকে আবার সেই গানের আওয়াজ— 'রাদে চেল্লি নম্ম, রাদে চেলি' — সেই তেলেগু গান।

জামাইবাবু বলে চলেন :

রাজয়্যার নিজের সংসার ছিলো। মিস্ত্রীর কাজ করতো। বালম্মার স্বামী ছিলো, কোনো ছেলেপুলে ছিলো না। বালম্মার বাড়ীর সামনের রাস্তা মেরামতের সময় রাজয়্যার সঙ্গে বালম্মার আলাপ হয়। আলাপ ভালোবাসায় পরিণত হয়। বালম্মা পঁচিশ তোলা সোনা নিয়ে রাজয়্যার কাছে চলে আসে। দু'বছর দু'জনে তিন টাকা ভাড়ার একটা ছোট্ট কুঁড়েতে থাকে। বালম্মা মুটেগিরি করতো আর রাজয়্যা মিস্ত্রীর কাজ। দু'জনে রোজগার করে আটশো টাকা জমায়। সেই টাকা থেকে পাঁচশো টাকা দিয়ে এই জমিটা কিনেছিলো। বালম্মার গয়না বেচে প্রায় তিন হাজার টাকা পায়। সেই টাকা দিয়ে জানলা দরজার জন্যে দরকারী লোহা, কাঠ, চূণ, পাথর কিনে বাড়ীর কাজ আরম্ভ করে দেয়।

'প্রতিদিন রাত্তিরে রাজয়্যা আর বালম্মা ভিতের জন্যে মাটি

খুঁড়তো। দিনের বেলায় অন্য কোথাও কাজ করতো। রাজয়্যা মাসে পঞ্চাশ টাকা পেতো আর বালম্মা তিরিশ। এর থেকে মাত্তর কুড়ি টাকা নিজেদের খাওয়া পরায় খরচ করতো। বাকীটা বাড়ীর জন্যে রেখে দিতো।

'চূণ-সুরকীর দোকানদারের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে রাজয়্যা নিজে ঠেলাগাড়ী করে চূণ-সুরকী আনতো, যাতে ঠেলাভাড়াটা বেঁচে যায়। টাকা বাঁচাবার জন্যে মাঝরাতে তারা গলির মোড় থেকে ইঁট-পাথর বয়ে নিয়ে আসতো।

'এইভাবে যখন বাড়ীর অর্ধেকটা উঠেছে, তখন তাদের পয়সা ফুরিয়ে যায়। দেওয়াল অর্ধেক উঠেছে, এখনও লোহার কাজ সব বাকী, দরজাও লাগানো হয় নি। শেঠজীর কাছে টাকা ধার করতে হয়। প্রত্যেক মাসে যাট টাকা যা বাঁচতো তা বাড়ীর পেছনেই ঢালতো আর মজুরীর টাকাও বাঁচাবার চেষ্টা করতো। এইভাবে এক বছরের মধ্যে চার হাজার টাকা দেনা করে বাড়ীর কাজ শেষ হ'লো। রান্নাঘরে একটা কল, বাথরুমে আর-একটা কল, পেছনের উঠোনে একদিকে এক নালী, শোবার জন্যে আলাদা ঘর, সামনে হলঘর, স্টোর রুম, সবকটা ঘরেই বড় বড় আলমারী, ইলেকট্রিক লাইটের ব্যবস্থা— বাড়ীর সবকিছুই তৈরি হয়ে গিয়েছিল। ছু'মাস ধরে রাজয়্যা আর বালম্মা কোনো তৃতীয় ব্যক্তির সাহায্য না নিয়ে খেটে ঘরের চূণকাম, রঙ ও ঘরদোর সাজানোর কাজ শেষ করে।

'যখন বাড়ী শেষ হ'লো তখন চার হাজার টাকা ওদের দেনা। ধারটা বাড়ী বাঁধা দিয়ে নিয়েছিলো। শেঠজী দেনাশোধের ছু'টো উপায় ওদের বলেছিলেন। একটা বাজারে যেমন টাকা ধার পাওয়া যায় সেইরকম সুদের ব্যাপারে আর দ্বিতীয়টা বাড়ী বাঁধা রেখে।

দ্বিতীয়টাতে সুদ খুবই কম লাগতো। চার বছরে চার হাজার টাকায় মাত্তর আটশো টাকা সুদ হয়। তার মানে প্রত্যেক ছ'মাসে রাজয়্যাকে দুশো টাকা করে ধার শোধ করতে হ'তো। একবার যদি তা না দিতে পারে তো বাড়ী বাজেয়াপ্ত হয়ে যাবে। সরল প্রকৃতির রাজয়্যা কম সুদের প্রস্তাবটাই মেনে নেয়। ও ভেবেছিলো যে যখন এতো পরিশ্রম করে বাড়ী তুলেছি তখন কি আর ছ'মাসে দুশো টাকা শোধ দিতে পারবো না!

'রাজয়্যা পঁচাত্তর টাকায় বাড়ীটা ভাড়া দিয়ে দিলো। ভাড়াটে শেঠজীর দপ্তরে প্রত্যেক মাসে ভাড়াটা জমা করে দিতো। সুদের দেড়শো টাকা, রাজয়্যা পেট মেরে একটা একটা করে পয়সা বাঁচিয়ে ধার শোধ করতো। বেশি রোজগারের আশায় বালম্মা এই বাড়ীতে ঝিয়ের কাজ করতে রাজী হয়ে গেলো। আর রাজয়্যা পাশের গলিতে কারুর বাড়ীতে মালীর কাজ করতে লাগলো। এইভাবে প্রত্যেকটা পয়সার হিসেব করে তারা বাড়ীর ধার চুকোতে থাকে।

'ভোর তিনটের সময় উঠে খাবার তৈরি করে বাংলো বাড়ীতে ঝাঁটপাট দিয়ে খাবার খেয়ে দুপুরের খাবার বেঁধে নিয়ে দু'জনে কাজে বেরিয়ে যেতো। সন্ধ্যেবেলা বাড়ী ফিরেই রাজয়্যা বাগানের কাছে লেগে যেতো আর বালম্মা বাংলো বাড়ীর কাজে জুটে যেতো। কোথাও চূণ খসে গেলে চূণকাম করা, দরজায় বাচ্চারা কিছু আঁক-জোক কাটলে ভিজে কাপড় দিয়ে সেটা তুলে ফেলা, ছোট্ট আঙিনায় গাছ পোঁতা— এই ধরনের কাজে রাত দশটা অবধি তারা দু'জনে ব্যস্ত থাকতো।

'প্রথম দু'বছর শেঠজীর দেনা শোধ করতে তাদের কোনো অসুবিধে হয় নি। পাঁচ কিস্তি শোধ করতে পারলেই বাড়ী ওদের হয়ে যাবে,

তারপর ওদের দিন ভালোভাবেই কাটবে— এই ধরনের মধুর স্বপ্ন ওরা দেখতে থাকে। একদিন একটা মজুর রাস্তা খুঁড়ছিলো, রাজয়্যা পাশে দাঁড়িয়েছিলো। ভুল করে লোহার কোদাল রাজয়্যার পায়ে পড়ে। রাজয়্যার পা ফুলে ওঠে। বেচারা তিন মাস শয্যাশায়ী হয়ে পড়লো। রাজয়্যার দেখাশোনা, ওষুধপত্তর ও সেবাশুশ্রূষার জন্যে বালম্মাকেও কাজ ছাড়তে হয়, ঠিক সেই সময় ভাড়াটেরাও অন্য কোথাও ট্রান্সফার হয়ে চলে চলে যায়। দু'মাস বাড়ী খালি পড়ে থাকে। সবকটা বিপদই একসঙ্গে দেখা দেয়। ছ'নম্বর কিস্তি সে মেটাতে পারলো না। এই মওকার অপেক্ষায় শেঠজী বসেছিলো। পনেরো দিনের নোটিশ দিয়ে বাড়ীটা বাজেয়াপ্ত করে নিলো। রাজয়্যাকে কৃপা করে বারোশো টাকা দিয়েছিলো।

'রাজয়্যা ভেঙে পড়ে। বালম্মা মাথা খোঁড়ে আর কাঁদে। গাল-মন্দ করতে থাকে। রাজয়্যার হাতে লেখা দলিলটা শেঠজী দশজনকে দেখায়। দলিলটা পড়ে সবাই বলে 'শেঠজী বড় দয়ালু, তাই বারোশো টাকা নিজের পকেট থেকে দিয়ে দিয়েছে।'

'কিন্তু রাজয়্যার মনের জ্বালা কে বুঝবে? প্রতিটি পাথর আর প্রতিটি পেরেক সে বেছে বেছে লাগিয়েছে। আঠারশো টাকা কম হওয়ার দরুন তার নিজে হাতে তৈরি করা বাড়ী নিজের হাত থেকে বেরিয়ে গেলো। এটাই কি বিচার? ঐ বারোশো টাকা দিয়ে ওরা আমাদের বাংলো বাড়ীর সামনের এই কুঁড়েটা কিনেছে। রাজয়্যা আর মিস্ত্রীর কাজ করে না। দু'জনে মুটেগিরি করে তিরিশ তিরিশ ষাট টাকা কামায়। রাজয়্যা এই বাংলোটাকে, এই জায়গাটাকে ছেড়ে যেতে পারে না। সে জানে এ বাংলো তার নয়। রাজয়্যা ভালো করেই জানে যে এই বাড়ীর ভাড়াটেরা দেওয়ালে পেরেক

পুঁতলে তার বারণ করার অধিকার নেই। তবুও দেওয়ালে যখন পেরেক পোঁতা হচ্ছিলো তখন সে আর স্থির থাকতে পারে নি তার আত্মা কেঁদে ওঠে। রাজয়্যার আত্মা এই বাড়ীটার ও তার চারিপাশে ঘুরে বেড়ায়।

দূর্গাপূজার সময় এই বাড়ীর চূণকা'ম করানোর কথা। রাজয়্যা ও বালম্মা আর কোনো মজুর ডাকতে দিলো না। অন্যদের চেয়ে কম পয়সা নিয়ে এই বাড়ীটা চূণকাম করলো। ওদের ধারণা বাইরের মিস্ত্রীরা ঠিকমতো কাজ করে না। তাই এই কাজটা তারা নিজেরা করলো। প্রতিমাসেই দু'তারিখে রাজয়্যা জিজ্ঞেস করে, আমি বাড়ী ভাড়া দিয়েছি কিনা। নিজের মাইনে সে কোনোদিনও চায় না। শেঠজীকে যে বাড়ীভাড়া দেওয়া হয় সেটার ব্যাপারে সে খুব হুঁশিয়ার। কখনও কখনও এই বাড়ীর প্রতি ওর মায়া আর মমতা দেখে আমি বিরক্ত হয়ে পড়ি। কিন্তু যখন সে করুণ ও কাতরভাবে জিজ্ঞাসা করে 'পয়সা মিটিয়ে দিয়েছো বাবুজী', তখন আমি কি করে ওর ওপর রাগ করে থাকি।

'যে বাড়ী তাদের রক্ত চুষে খেয়েছে, সেই বাড়ীর প্রতি এদের মমতা দেখে আমার দুঃখ হয়। তাকিয়ে দেখো. বালম্মা উঠোনটা কি সুন্দরভাবে পরিষ্কার করেছে। এমনভাবে ধুয়ে-মুছে পরিষ্কার করে যে আমরা নিজেদের ছায়া দেখতে পাই। জীবনে তাদের আর কোনো আশা নেই। এই সংসারে ঐ ছোট্ট কুঁড়ে ঘরটা ছাড়া তাদের আর কোনো সম্পত্তি নেই। যে বাংলোর স্বপ্ন তারা দেখেছে, সেটা তাদের হাত থেকে বেরিয়ে গেছে। কিন্তু এরা, বেচারারা বাংলোর ছায়াতে যদি জীবনের শেষ কটা দিনও কাটাতে পারে··· প্রত্যেকটা জীবনই একটা দীর্ঘ কাহিনী।

'রাজয়ুয়াকে যদি বলি যে এ বাড়ীতে আমি পেরেক পুঁতলে তোমার কি, তুমি তোমার গ্রামোফোন নিয়ে থাকো, তা হলে ও কত দুঃখ পাবে! এই বাংলোর ছায়া আর গ্রামোফোনের গান— ব্যস, এই দুটো জিনিসই ওদের জীবনের সম্বল।'

জামাইবাবু আর কিছু বলতে পারলেন না। আমার দু'চোখ জলে ভরে এলো। রাজয়ুয়া আর বালম্মার কপাল মন্দ। তাদের জীবনে 'বরষা' নেই; ঐ 'বরষা' শুধু তাদের গ্রামোফোন রেকর্ডে আছে।

আপনি কি এটা গল্প মনে করেছেন? না। এ বাস্তব ঘটনা। খৈরতাবাদ স্টেশন থেকে 'আকাশবাণী'র দিকে যে রাস্তাটা গেছে তার তৃতীয় গলিতে ঢুকে যান। আজও আপনি 'এলে বরষার…' গানটা আর বালম্মার গালিগালাজ শুনতে পাবেন। যদি আমার কথায় বিশ্বাস না-হয় তো একবার নিজে গিয়ে বাংলো বাড়ীটা দেখে আসুন।

আমরা আবার বরযাত্রী

'ওঠো বাবু ওঠো,··· আমাদের পৌঁছোতে সকাল হয়ে যাবে।' কথাটা কানে এলো। আধো ঘুমের ঘোরটা কেটে গেছে। একটা দালানে শুয়েছিলাম। পাশের প্যাণ্ডেলটায় কয়েকজন পাশ ফিরে শুলো। আরাম-কেদারায় শঙ্করম বসেছিলো, সেও উঠে পড়লো। উঠে আড়মোড়া ভাঙলো। কাছেই একটা প্রদীপ ছিলো, তার আলোয় ওর চেহারাটা অস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। হাত-পা নেড়ে অবসাদ দূর করছিলো। আমি কি রকম একটা অস্বস্তিবোধ করছিলাম, যেন কেউ মুঠোর মধ্যে চেপে ধরেছে।

সকলে উঠে পড়লো। এক ঘণ্টার মধ্যে সবাই তৈরি। দু'টো গাড়ী করে রওনা হলাম। ঐ ছোট গাঁয়ে সুমিত্রার দাদুর বাড়ীতে বিয়ে হবে। সুমিত্রা চিঠিতে অনুরোধ জানিয়েছিলো। শঙ্করমও চিঠি দেয়। এদের অনুরোধ এড়াতে না পেরে বিয়েতে উপস্থিত থাকতে বাধ্য হয়েছি। গায়ে চাদরটা জড়িয়ে বাইরে তাকালাম। দেখি, সামনের গাড়ীতে তিনজন চলেছে। শঙ্করমও তাদের মধ্যে একজন।

হাল্কা বাদামী রঙের মতো সুন্দর জ্যোৎস্না। আমার মাথার বেলফুল, পাশে ঝুড়িতে রাখা সদ্যোফোটা ফুল— দু'য়ে মিলে এক সুন্দর পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। থেকে থেকে আমি একটা বেদনা অনুভব করছিলাম। দূর থেকে কাকের করুণ ডাক ভেসে আসছে। ফসলহীন জমি মাঠের মতো দিগন্ত বিছিয়ে আছে। রাস্তার দু'ধারে

পাতাঝরা গাছগুলো ডালপালা নিয়ে রেখার মতো অস্পষ্টভাবে দাঁড়িয়ে। মনে গভীর এক বেদনার অনুভূতি, চোখ বন্ধ করলাম।

চার বছর আগে এই জ্যোৎস্না রাতই কত সুন্দর ছিলো! আপন স্নিগ্ধ রমণীয় শোভায় সমস্ত সংসার আপ্লুত করে দিয়েছিলো, এ সেই জ্যোৎস্না! সেদিন রাতে এই রাস্তা, এই মাঠঘাট, এই খাল রেশমী জরি লাগানো এক ঝালরের মধ্যে দিয়ে যেন উঁকি মারছিলো। সারাটা রাত পড়েছিলো, জ্যোৎস্না রূপোর মতো ঝলমল করছিলো। প্রত্যেকটি গাছকে শান্ত মনে হয়েছিলো।

সেদিনও শঙ্করম সামনের গাড়ীতেই বসে গান গেয়েছিলো। মনে আছে ঘুমে চোখ জড়িয়ে যাচ্ছিলো। বলদগুলোর খুরের শব্দ, গাড়ীর চাকায় শুকনো মাটির ঢেলাগুলো গুঁড়িয়ে যাওয়ার চুরচুর শব্দ, বলদের গলায় বাঁধা ঘুঙুরের ঝুমঝুম— সব শব্দ মিলেমিশে স্নিগ্ধ শীতল নয়নমুগ্ধকর চন্দ্রিকার প্রশান্ত বায়ুমণ্ডলে লীন হয়ে যাচ্ছিলো। মাঝে মাঝে শঙ্করমের গানও শুনতে পাচ্ছিলাম।

এরই এক মাস আগে এসব কথা শঙ্করম কেন আমায় বলেছিলে জানি না। সত্যিই কি ও আমার পরামর্শ চেয়েছিলো? কলেজ ছাড়ার পর আমি ছাড়াও বোধ হয় নিজের মনের কথা বলার আর কোনো বন্ধু পায় নি! কিংবা হয়তো মনে মনে ঠিকই করেছিলো সুশীলাকে ও বিয়ে করবে। শুধু আমার মৌখিক সম্মতি চাইছিলো? তাই বোধ হয়। বলদের গলার ঘুঙুরের ঝুমঝুম শব্দও যেন এই কথাই বলছিলো।

টেলিফোনে সেদিন শঙ্করমের কথা শুনতে পেলাম। 'আজ দুপুরে এসেছি, কাল ইনটারভিউ।' আমি ওকে হোস্টেলে দেখা করতে বললাম।

'আজ তো আমি আসতে পারবো না। এটাও তো একটা পরীক্ষা, কাল সন্ধ্যেবেলা আসবো, দু'জনে বেড়াতে যাবো, পারমিশান নিয়ে নিস।'

'বেশ, তাই হবে,' বলে আমি রিসিভার রেখে দিলাম। ছোট-বেলায় বিশেষ আলাপ ছিলো না। বেনারস থেকে ফিরে আসার পর ওর সঙ্গে আমার আলাপ-পরিচয় হয় গতবারে গ্রামের ছুটিতে আমি গ্রামে গিয়েছিলাম। পথে শঙ্করমের বাড়ীতে দশ-পনেরো দিন থাকি। ঐ সময় আমাদের বন্ধুত্ব জমে ওঠে আর স্নেহের বন্ধনে দু'জনে বাঁধা পড়ি।

পরের দিন সন্ধ্যেবেলা আমি হেসে প্রশ্ন করলাম, 'পরীক্ষা হয়ে গেলো ?'

'হ্যাঁ, হ'লো। চল, বেড়িয়ে আসি' এই চৌহদ্দির মধ্যে যেন দম আটকে যাচ্ছে।'

মিনিট পনেরোর মধ্যেই আমরা সমুদ্রের ধারে এসে হাজির হলাম। বালির ওপর দিয়ে আস্তে আস্তে এগিয়ে চললাম। পকেট থেকে রুমালটা বার করে শঙ্করম চশমাটা পুঁছে পরে নেয়। রুমালটা জামার কলারের নীচে লাগিয়ে নিয়ে বললো, 'বসবে, না বেড়াতে বেড়াতে কথা বলবে ?'

'যা তোমার ইচ্ছে।' আমি বললাম। ও ওখানেই বসে পড়লো। আশেপাশে ছেলে-মেয়েরা ফানুস ধরবার জন্যে ছুটোছুটি করছে।

'আসলে তোমায় কয়েকটা কথা জিজ্ঞেস করার ছিলো।' অদ্ভুত কি একটা গাম্ভীর্য যেন গলার স্বরে। জানি না কেন সব কিছুই আমার কাছে একটু অদ্ভুত লাগছিলো। কাল টেলিফোনে ওর কথা শোনার পর থেকেই সবকিছুই আমার কেমন যেন একটু খাপছাড়া

মনে হচ্ছিলো। বললাম, 'বলো।' কিছুক্ষণ চুপ করে রইলো। তারপর বললো, 'তুমি বোধহয় জানো আমার মা আর বাবা আমার বিয়ে দিয়ে তাড়াতাড়ি আমায় সংসারী করতে চান।'

আমি ঘাড় নেড়ে মাথা নীচু করে বালির ওপর আঙুল দিয়ে আঁকতে থাকি। আবার সে চুপ করে যায়। আমার কাছ থেকে ও কি জানতে চায় সেই কথাই মনের মধ্যে তোলপাড় করছিলাম। ও যা বলতে চায় তা শোনার মতো মনোবল আমি কিছুতেই যেন সঞ্চয় করতে পাচ্ছিলাম না।

'সুশীলাকে তোমার কেমন লাগে?'

এক মুহূর্তের জন্যে মনে হ'লো, আমি যেন তটে এসে ভেঙে যাওয়া ঢেউ। ঢেউয়ের ফেনা যেমন চারদিকে আস্তে আস্তে ছড়িয়ে পড়ে তেমনি আমার বিচারবোধও আস্তে আস্তে বিকশিত হতে থাকে।

ঠিক এক হপ্তা আগে তোমার মামা আমার সঙ্গে এ ব্যাপার নিয়ে কথা বলেছিলেন। লোকেদের বলতে শুনেছি সুশীলা খুব সরল মেয়ে। শুধু ভাবছি আমার মতো নিরস লোকের সঙ্গে ও কি করে মানিয়ে চলবে।' কথাটা বলতে বলতে ও শুধু একটু হাসলো। আমিও হাসলাম। বললাম, 'ভাববার কি আছে, জুটি মিলবে ভালোই।'

অন্ধকার হয়ে এলো, আমরা ওখানেই বসে রইলাম। আরো অনেক কিছুই ও বললো। ওর মনের কি ভাব, কি কি ও ভাবছে সব। সব উত্তরই আমি 'হ্যাঁ', 'আচ্ছা' বলে সংক্ষেপে সারলাম। এটা সেদিনের কথা।

তারপর সুশীলা আর শঙ্করমের বিয়ের বরযাত্রী হয়ে অনেকেই গিয়েছিলো। আমিও গিয়েছিলাম। শঙ্করম সংসারী হ'লো।

—চারটে বছর স্বপ্নের মতো মনে হয়। এরমধ্যে অনেক কিছুই ঘটেছে। হঠাৎ একদিন সুমিত্রার টেলিফোন। বিকেলে আমাদের বাড়ী আসবে? সিনেমা যাবো। এই ছিল ওর প্রস্তাব। বললাম, 'ঠিক আছে।'

হলে গিয়ে বসবার দশ মিনিট পরেই ও আমার দিকে ঘুরে বসে বললো, 'তোমায় একটা কথা জিজ্ঞেস ক'রবো বলে এ প্রোগ্রাম করেছি।'

'এখানেই?'

'হ্যাঁ, এই অন্ধকারে ভালো করে কথা বলতে পারবো বলে।' ও উত্তর দেয়।

সংবাদ-চিত্র সুরু হ'লো আমার হাতটা নিজের হাত দিয়ে চেপে ধরে বলতে থাকে, 'সুশীলার দাদা ও বৌদি আমাদের বাড়ী এসেছিলো। সুশীলা মারা যাবার পর ছেলেটা ওদের কাছেই আছে।' ওর এইভাবে কথা বলার ধরন দেখে আমার একটু অদ্ভুত ঠেকে। আসলে ও যা বলতে চাইছিলো, অন্ধকারে সেটা জোনাকির আলোর মতো ঝিলমিল করে ওঠে। বেশ খানিকক্ষণ কেটে গেল, দু'জনেই চুপচাপ। যে ছবি দেখছিলাম তার কিছুই বুঝতে পারছিলাম না। শঙ্করমই বা কে আর আমিই বা কে। এর মধ্যে আমি কি করে জড়িয়ে পড়লাম।

'ওর বৌদি আমায় ওর ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেছিলো; আমি বলেছিলাম, সুশীলার মৃত্যু তো এখনও এক বছরও হয় নি; এতো তাড়াতাড়ি কিসের?' বলতে বলতে সুমিত্রা চুপ করে যায়। মাথা নিচু করে হাত দিয়ে চোখ বন্ধ করে ফেলে।

'কিন্তু ভেবে দেখলে ওর এখুনিই তো খুব একা একা মনে হবে।

সত্যি ···ওর সমস্যাটা তো এখনকারই। ওর ব্যাপারে তোমার কি মনে হয়?'

তক্ষুণি উত্তর দিতে পারলাম না। একটু পরে বললাম, 'তুমিও তো ওকে চেনো? আমি আর কি বলবো।'

'না, না, আমার তো শুধু মুখ চেনা। তোমার আত্মীয়, তোমার বন্ধুও বটে, তাই আমার মনের কথা তুমিই বুঝতে পারবে।' ওর গলা কেঁপে ওঠে।

'সে তো বেশ ভালো লোক, সুমিত্রা! ভালবাসবার ক্ষমতা ওর আছে।' এই কথাটাই বলার ছিলো, তাই বলে ফেললাম।

তাই আবার আমরা শঙ্করম আর সুমিত্রার বিয়ের বরযাত্রী হয়েছি। জ্যোৎস্না সারা আকাশ ছড়িয়ে পড়েছে কিন্তু তেমন যেন স্নিগ্ধ রাত নয়। ভোরের আলো আঁধারের দোটানায় নিস্প্রভ জোৎস্না যেন অতি কষ্টে নিঃশ্বাস নিচ্ছে।

··· চোখ বুজলাম। পাহাড় আর গাছের মধ্যে দিয়ে বয়ে যাওয়া ঝর্নার হাল্‌কা একটা শব্দ ভেসে আসে পেছন থেকে। ঠিক যেন আমার দিকে বয়ে যাচ্ছে, আমায় স্পর্শ করছে। শান্তভাবে একটু জল ছিটিয়ে গেলো। আমার পাশেই একটা ছোট্ট খাল, ধীরে ধীরে বয়ে যাচ্ছে। অনেক দূরে ঐ ঝর্নার সঙ্গে মিশে গেছে।

শুধু আবছা জ্যোৎস্নায় আমি নিঃসঙ্গ।

ছেঁড়া চাদর

গাঁ-টা যেন অন্ধকারে ছেঁড়া চাদরে মুড়ি দিলো। তার ছিদ্র দিয়ে প্রদীপের আলো টিম্‌টিম্ করতে থাকে। ন'টাও তখন বাজে নি, সারা গাঁ নিঝুম, নিস্তব্ধ। এদিকে ওদিকে দু'চার জন রোয়াকে বসে তামাক খেতে খেতে গল্প করছে। চুরুটের আগুন ঠিক জোনাকির মতো টিম্‌টিম্ করে জ্বলছে।

কুঁড়ে ঘরের সামনে উঠোনের রোয়াকে বসে বৈরাগী রামস্বামী একতারাটা নিয়ে ভক্ত রামদাসের গান ধরেছে। বৈরাগীর গলা ভয়ঙ্কর। কিন্তু রামদাসের গীত গাইছিলো বলে পাড়াপড়শী আর কোনো আপত্তি করে নি। গাঁয়ের লোকেরা রাতে কুকুরের 'ঘেউ' 'ঘেউ' আর তার সঙ্গে এই গান শুনতে শুনতে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। ভাগ্নে সত্যম্ রাতের আহার সেরে ঢেঁকুর তুলতে তুলতে বাইরে বেরিয়ে আসে।

'কি মামা, রোয়াকে মাদুর বিছিয়ে হ্যারিকেনটা কি রেখে দেবো?' এই বলে সে বৈরাগীর গান গাওয়ায় বাধ সাধে। বৈরাগী একতারাটা নামিয়ে রেখে রেগেমেগে বলে ওঠে, 'রেখে দে-না! এক কথা রোজ জিজ্ঞেস করার কি আছে?'

'আসলে ব্যাপারটা কি জানো, মামা! কালেক্টারের চাপরাসী বলছিলো, গত দু'দিন ধরে পুলিশের কড়াকড়ি বড্ড বেড়েছে। তাই জিজ্ঞেস করছিলাম।'

'ঐ এক আচ্ছা হতভাগা জুটেছে তোর। ও নিজেকেও কালেক্টার মনে করে। আরে সত্যম্, আমাকে পুলিশের কথা কি শোনাচ্ছিস! আমি কি কিছু জানি না। ছ'বার জেল ঘুরে এসেছি। এরা এ রকমই মিছিমিছি গুজব রটায় আর লোকেদের ভয় দেখায়। ব্যাপারটা এ ছাড়া আর কিছু নয়।'

মামার সব কীর্তিই সত্যম্ জানে। সময় অসময় বৈরাগী নিজের আত্মকাহিনী বেশ গর্বের সঙ্গে সত্যম্‌কে শোনায়। বৈরাগী লিখতে জানে না তাই, নয়তো নিজেই আত্মকাহিনী লিখে ফেলতো।

আত্মবিশ্বাস আর অহঙ্কার রামুর জন্মগত। ছোটবেলা থেকেই শরীরচর্চা করতো। তাই যৌবনে পা দেওয়ার আগেই তার দেহ বেশ হৃষ্টপুষ্ট, মাংশপেশীগুলো নিটোল, যেন ঠিক ঘোড়ার মতো। চব্বিশ ঘণ্টা শরীরচর্চা নিয়েই মেতে থাকতো। কোনোদিনই পরিশ্রমের কাজ করার কথা চিন্তাও করে নি। যে মেয়েটাকে ও বিয়ে করতে চাইলো, বাবার সঙ্গে ঝগড়া করে তাকেই বিয়ে করলো। শ্বশুরবাড়ীকেই নিজের ঘর করে নিল। শ্বশুর-শাশুড়ীর অনেক বলাকওয়াতে শেষে নাচার হয়ে কখনও তাস খেলে কিংবা কখনও পকেট মেরে সে বাড়ীতে দু'চার পয়সা রোজগার করে নিয়ে আসতো। একবার ধরা পড়ে ছমাস জেল খাটে। জেল খেটে বাড়ী ফেরার আগেই তার স্ত্রী এক কন্যার জন্ম দিয়ে মারা যায়। মেয়ের খাওয়া পরার টাকা সে চুরি করে জোগাড় করতো। এইভাবে নানা গাঁ ঘুরে জেল খেটে পনেরোটা বছর সে বাড়ীর বাইরে কাটিয়ে দেয়। পনেরো বছর পরে বাড়ী ফিরে দেখে শ্বশুর-শাশুড়ী গত। মেয়ের দেখাশোনার পুরো দায়িত্ব এখন তার। মেয়ে বড় হয়েছে, একা ঘরে রেখে বাইরে যাওয়া মুশকিল। গাঁয়ে তাই একটা কুঁড়ে বানিয়ে

সে বাস করতে লাগলো। এখন বয়স হয়েছে, শরীরও ভেঙে পড়েছে। অতীতের ওপর অনেক বিতৃষ্ণা, তাই নতুনভাবে জীবন স্মুরু করে। গেরুয়া পরে সন্ন্যাসী হ'লো। একতারাটা এখন তার এক মাত্তর সাথী। রামু এখন রামস্বামী। কিন্তু পেট চলবে কি করে? বাড়ীতে এক ভাগ্নে আছে, সেও এক নম্বরের কুঁড়ে; একটা পয়সা রোজগার করার মুরোদ নেই। বাড়ীর উঠোনে বসে যারা তাস পিটোয় তাদের জন্যে মাতুর আর আলোর ব্যবস্থা করে দিয়ে সামান্য কিছু ভাড়া আদায় করে। মাতুর পাতা, আলো জ্বালানো আর বাইরে দাঁড়িয়ে পুলিশ আসতে দেখলে ভেতরে খবর পাঠানো—এই হ'লো ভাগ্নের ডিউটি। খবর পেলেই বৈরাগী আলোটা নিভিয়ে দেয় আর সবাই যে যার বাড়ীর পথ ধরে।

ভাগ্নে একেবারে মামাব নকল। বাঁধা বলিষ্ঠ শরীর, কোঁকড়ান চুলে তাকে বেশ স্মুন্দর দেখায়। মামার চেয়ে বেশি সমঝদার, লেখাপড়াও জানে। শুধু যা কোমর বেঁধে কাজ করতে পারে না। বৈরাগীর ভাগ্নেব ওপর তাই রাগ।

বৈরাগীব মেয়ে গৌবম্মা ঘর থেকে ছিলিম আর তামাক নিয়ে আসে। বৈরাগী ছিলিম সেজে আগুন লাগাতে লাগাতে বলে, 'মা! আজ তোব মামার চিঠি এসেছে। লিখেছে ওর ছেলের মুন্সেফ কোর্টে চাপরাশীর একটা চাকরী হয়ে গেছে।'

গৌরম্মা সত্যমের দিকে তাকিয়ে মুচকে হাসে। গৌরম্মাকে হাসতে দেখে সত্যমের সারাদেহে পুলক জাগে। গৌবম্মার রূপ অন্ধকারেও প্রদীপের মতো জ্বলজ্বল করে। তার অপরূপ রূপের মায়ায় সবাই মুগ্ধ হয়ে পড়ে। গৌরম্মার হাসির কারণ শুধু সত্যম্‌ই জানে গৌরম্মা সত্যম্‌কে দিয়ে লুকিয়ে চিঠিটা পড়িয়ে নিয়েছে।

মামার ইচ্ছে গৌরম্মার বিয়ে তার ছেলের সঙ্গে হোক। বৈরাগীরও তাই ইচ্ছে।

'একটু যা মুশকিল। ওর সঙ্গে তোর বিয়ে হয়ে গেলে আমি একলা রয়ে যাবো। তা না হলে আমাকেও তোর সঙ্গে ওখানে যেতে হবে।' বৈরাগীর মনে এই সব তোলপাড় হতে থাকে। আর সত্যি বলতে কি বৈরাগী মেয়েকে ছেড়ে এক মুহূর্তও থাকতে পারে না। মেয়েকে ও বড্ড ভালোবাসে।

'ঠিক আছে, তাই হবে। এতো ভালো ঘর পরে আর পাওয়া যাবে না। এখানকার বাঁধন ছিঁড়ে ঐখানেই গিয়ে থাকবো।' বৈরাগী মনোস্থির করে ফেলে।

'থাক-না বাবা, এতো তাড়াইবা কিসের?' গৌরম্মা বলে।

'তাড়া করবো না কেন মা?'

'আমি ওকে বিয়ে করবো না বাবা! একেবারে কসায়ের প্রাণ ওর, না আছে মন প্রাণ, না আছে দয়ামায়া।'

'তুই কি বলছিস মা! তাই তো সে মাসে একশো টাকা রোজগার করে। মাইনে বাদে উপরিও আছে। দয়ালু আর দিলদরিয়া লোক এক পয়সাও রোজগার করতে পারে না পাগলী। মন বস্তুটা আমার মতো বৈরাগীর থাকে, যে রোজগার করে তার নয়। কিন্তু মা, এ সুযোগ হাত ছাড়া করা চলবে না! তাছাড়া আমি কথাও দিয়েছি।'

মেয়ে এখন বড় হয়েছে। কিন্তু বৈরাগী ভাবে সে এখনও তেমনি ছোট। বৈরাগী মেয়ের কথা ধর্তব্যের মধ্যে নেয় না। ভালো ঘরে পড়লে ওর জীবনটা সুখে কাটবে, বৈরাগীরও আর রোজগারের চিন্তা করতে হবে না। বাকী দিনকটা ভগবানের নাম জপ করতে করতে

কাটিয়ে দেবে। গৌরম্মা বাপের মনের ভাব বুঝতে পারে। তাই আর কিছু বলে না।

সত্যম্ বৈরাগীকে রোয়াকে ডেকে আনে। বাইরের রোয়াকে তখন জনাদশেক লোক বসে। এক কোণে হ্যারিকেন জ্বলছিল। একজন তাসগুলো ঠিক করছিলো; বৈরাগী এক কোণে গিয়ে দাঁড়ায়।

'কি বৈরাগী, হ্যারিকেনটা টিম্‌টিম্ করছে কেন? তেল নেই বুঝি?'

'তেল থাকবে না কেন? এই মাত্তর চার আনার তেল কিনে ওটায় ঢালা হয়েছে। হাওয়ার জন্যে এই রকম হচ্ছে। বৃষ্টিও হতে পারে মনে হচ্ছে। তাড়াতাড়ি খেলা শেষ করুন।'

'বৃষ্টি এলেই বা কি? খেলার কোনো অসুবিধে হবে না। পুলিশের হয়রানি থেকে বাঁচা যাবে।'

'ভালো কথা। শ্রীরামচন্দ্রের নাম করে খেলা সুরু করুন, নিশ্চয়ই জিতবেন। কিন্তু এক বাজী খেলা শেষ হলেই যে দল জিতবে তারা আমাকে টাকায় এক আনা করে ভাড়া দেবে। সকলে যে যার ভাড়া দিয়ে যাবে ভেবে কাল আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, এক টাকা লোকসান হয়ে গেলো।'

'আহা, বেচারার লোকসান হয়ে গেছে? বৈরাগী! মাত্তর একটিবার তোমার মুখ থেকে আমরা সত্যি কথা শুনতে চাই। খেলাটা বেশ যখন জমে ওঠে তুমি তখন 'পুলিশ' 'পুলিশ' রব তুলে বাতিটা নিভিয়ে দাও। আর এই হট্টগোলের মাঝে আমাদের পয়সাও গায়েব করো। এ রকম কবার করেছো সত্যি করে বলো।'

'রাম! রাম! এতো নীচ কাজ আমি কখনও করি নি। কে জানে, অন্ধকারে কে কার পয়সা মেরে নেয়? আমি বৈরাগী মানুষ, পয়সায় আমার কি হবে?'

'ঠিক আছে ভাই, তুমি ঠিকই বলছো। হাত জোড় করে তাই তোমায় বলছি যে তুমি এখানে থেকো না। যদি চাও তো তোমার ভাগ্নেকে পাঠিয়ে দাও। তুমি বরঞ্চ একতারা বাজাও।'

'ঠিক আছে। সবাই সৎ হলে কারুরই আর দরকার হয় না। ভাড়ার পয়সা আলাদা রেখে দিও।'

'ন্যায্য যা পাওনা, সেটা তুমি নিয়ে নিও। আমরা না করবো না। কিন্তু খেলার মধ্যে পুলিশের ভয় দেখিয়ে আলো নিভিয়ে পয়সা লুট করলে আগেই বলে দিচ্ছি পেঁদিয়ে বৃন্দাবন দেখিয়ে দেবো।' এক তাসের জুয়াড়ী বৈরাগীকে সাবধান করে দেয়।

খেলা শুরু হয়। আরম্ভ হয়েই খেলাটা বেশ জমে ওঠে। খেলা দেখতে দেখতে বৈরাগী ওখানেই বসে পড়ে।

বাইরে রাস্তায় সত্যম্ আর গৌরম্মা কথা বলছে।

'আরে পাগলী! তুই এতো উতলা হয়ে পড়ছিস কেন? দু'তি দিনের মধ্যেই তোর বাবার রাগ পড়ে যাবে। তারপর আবারন এখানেই ফিরে আসবে। মাড়ওয়ারী আমার কথা খুব শোনে। যখন বলবো তখনই চাকরী দিয়ে দেবে। আরাম করে থাকবো।' সত্যম্ বলে চলে।

বৈরাগী দেখে বাইরে গৌরম্মার সঙ্গে তার ভাগ্নে কথা বলছে। উঠে গিয়ে ভাগ্নেকে সে বারান্দায় পাঠিয়ে দিলো। মেয়েকে ভেতরে গিয়ে শুয়ে পড়তে বলে; রাস্তার ধারে রোয়াকে বসে নিজে ছিলিম টানতে থাকে।

বৈরাগী মেয়ের বিয়ের কথাই ভাবছিলো। বিয়ের জন্যে পাঁচশো টাকা যোগাড় করে রেখেছে। গয়নাগাঁটি বাবদ দুশো টাকা আলাদা করে রাখা আছে। বৈরাগীর ইচ্ছে মেয়ের বিয়েটা বেশ ধুমধাম করে

হোক। লোকেদের প্রায়ই বলতে শুনেছে, কাঙাল বৈরাগী আবার মেয়ের বিয়ে দেবে কি করে? বিয়ের জাঁকজমক দেখে সবাই হতভম্ব হয়ে বলবে 'বৈরাগী কি অদ্ভুত লোক।' কোনো ব্যাপারে কাউকেই সে ত্রুটি ধরার সুযোগ দেবে না।

ছিলিমটা পাশে রেখে বৈরাগী শুয়ে পড়ে। হালকা ঘুমের ঘোরে সে স্বপ্ন দেখে। দেখে, জামাই ওকে খুব সম্মান করে, নিজের কাছে থাকবার জন্যে ডেকে পাঠায়।

জানা নেই রাত কত হয়েছে। হঠাৎ বারান্দায় সবাই চেঁচামেচি করে উঠে পড়লো। বৈরাগীও চমকে উঠে পড়ে। বারান্দায় আলো নেই। সবাই যে যার বাড়ী মুখো চলেছে।

'কি হয়েছে রে?' বৈরাগী চোখ রগ্‌ড়াতে রগ্‌ড়াতে জিজ্ঞেস করে।

'সত্যি সত্যি পুলিশের বাঁশীর আওয়াজ। হয়তো পাশের গলিটায় আছে।' বলতে বলতে একজন জুয়াড়ী ছুটে পালায়।

ছিলিম হাতে করে বৈরাগী ঘরের ভেতরে ঢোকে। চারদিক অন্ধকার। দেশলাই দিয়ে আলো জ্বালায়। মাদুরের ওপর একটা পয়সাও ছিলো না।

'হ্যাঁরে সত্যম্? পয়সা কোথায়?' বৈরাগী চিৎকার করে। হ্যারিকেনের পলতেটা বাড়িয়ে নিয়ে সে ভেতরে যায়। কোথাও সত্যম্‌কে সে দেখতে পায় না। 'বেটা বদমাইস, আলো নিভিয়ে পয়সা নিয়ে গেছে।' 'গৌরী মা' বলে এক ডাক দেয়। তাকেও কোথাও দেখতে পেলো না।

'তালে কি গৌরীমা আমাকে ছেড়ে চলে গেলো?' ভাবতে ভাবতে বৈরাগী পাগল হয়ে যায়। মাথায় হাত দিয়ে মাটিতে বসে

পড়ে। আলো-আঁধারের চোখ বেঁধে যে বৈরাগী এতোকাল লুকোচুরি খেলে এসেছে আজ সে চোখে আর কিছু দেখতে পায় না। হ্যারিকেনটা যেখানেই থাকুক না কেন, এই অন্ধকার গুহা থেকে বেরুবার কোনো পথই সে খুঁজে পায় না। আজ জীবনটা সত্যিই বিষাক্ত হয়ে উঠলো।

বটের ছায়া ও বেলফুলের গাছ

এয়োস্ত্রির কপালে বড় টিপের মতো সূর্য পশ্চিম আকাশে ঢলে পড়লো। দেবত্ব-সম্পত্তির ভাগীদার রামস্বামী ঘড়া থেকে জল ঢালছে। গত দু'বছর ধরে যে জমিটা জঙ্গল হয়ে পড়েছিল সেটা এখন ওর হাতে এসেছে। দু'বছরে রামস্বামী জমিটাকে উর্বর করে ফসল ফলিয়েছে। শাকসবজি আর ফুলের কেয়ারী বানিয়ে ও এতে প্রাণ দিয়েছে। শাকসবজিতে সমস্ত জমিটা সবুজ; প্রথম ফসল কাটার জন্যে তৈরি। ফসলের দিকে তাকালেই টাটকা সবে-মাত্তর-দোওয়া দুধের পূর্ণপাত্রের মতো তার চোখ দুটো আনন্দে ভরে ওঠে। জল-দেওয়া হলেই সব্জী কাটা, ভোরবেলায় মন্ডীতে নিয়ে যাওয়া আর বিনিময়ে ট্যাঁকে গুঁজে পয়সা আনা। এই চিন্তায় বিভোর রামস্বামী পাতকুয়োর পাশেই কলাগাছে আটা দেখতে পায়। ওপরের কাঁদিটা পেকে তৈরি।

'বাবা, আমায় একটা কলা দাও না?' পাঁচ বছরের মেয়ে হেমা আব্দার করে।

'হ্যাঁ, মা, এই পুরো কাঁদিটাই তো তোর। কাল ভালোভাবে পেকে যাবে। কাল খেও।' রামস্বামী তাকে বুঝিয়ে বলে।

'না, বাবা! তুমি রোজই আসছে কালের কথা বলো।' এই বলতে বলতে হেমা বেলফুলের গাছটা মাটি খুঁড়ে তুলে নেয়। সেটা নিয়ে বটগাছের দিকে ছুটে যায়। মেয়েকে দেখে রামস্বামীর নিজের

বৌ-এর কথা মনে পড়ে! স্ত্রী মারা গেছে। মেয়ে জন্মাবার পর এই সবে সুদিনের মুখ দেখছে, কিন্তু লাভ কি? এই সুদিন দেখার কপাল করে তো সে আসে নি।

পাতকুয়োর পাড়ে কাঠের পাঠানির আওয়াজ। একধারে কাঁটাগাছের ডালে কাঠবেড়ালীরা সন্তর্পণে ঘুরে বেড়াচ্ছে। হাতীরা শুঁড়ে করে যেমনভাবে জল ভেতরে নেয় তেমনি তার মনেও চিন্তা-ধারা এঁকে বেঁকে চলেছে।

ধর্মাবতারের দয়ায় রামস্বামী এই জমিটার ভাগ পেয়েছে। তিনিই ওর মেয়ের নাম দিয়েছেন হেমা। তিনি রামস্বামী আর হেমাকে অসম্ভব ভালোবাসেন। রামস্বামীর দেহ থেকে যে সোনা বেরিয়েছে, তা হ'লো হেমা আর হাতের কঠোর পরিশ্রমে যে সোনা ফলেছে তা হ'লো খেতের ফসল। এ সবই ঐ ধর্মাবতারের দয়া! তাঁর নাম করে রামস্বামী মনে মনে তাঁকে প্রণাম করে। ওঁর নামে প্রদীপ জ্বালাতে হবে। গ্রামে ধর্মাবতারের আর মন্দিরে ভগবানের কৃপা হলেই যথেষ্ট। হেমার পড়াশোনার ব্যবস্থা উনিই করবেন। লেখাপড়া জানা ছেলের সঙ্গে হেমার বিয়ে হবে। এই সব চিন্তায় রামস্বামী বিভোর। কানে সানায়ের সুর ভেসে আসে। চোখ জলে ভরে আসে; জ্যোৎস্নার মতো চোখ জ্বলজ্বল করে। নারকেলগাছের পাতাগুলো হাওয়ায় দুলে ওঠে। তার শব্দে রামস্বামী চমকে ওঠে। পেছনে ফিরে তাকায়, দেখে, সামনে ধর্মাবতার দাঁড়িয়ে। হেমার পিঠ চাপড়ে হাসছেন। এতো হাঁকডাক যে মানুষটার, সে একটা ছোট্ট চারাগাছের মতো চঞ্চল।

'হুজুর। পেন্নাম হই!' বলে রামস্বামী জল দেবার চামড়ার থলেটা ওখানে ফেলে রেখে বটগাছের দিকে ছুটলো।

'দেখেছো রামস্বামী, ছোট্ট হেমার বিড়ম্বনা দেখেছো। বটগাছের ছায়ায় যেখানে একটা ঘাসও বাঁচতে পারে না সেখানে এই বেল-ফুলের চারাটা কি করে বাঁচবে?' রামস্বামীকে উদ্দেশ্য করে বললেন।

'আজ্ঞে, হুজুর। ও তো শিশু, ও কি করে জানবে, বলুন?' রামস্বামী হাত কচলাতে থাকে। ধর্মাবতার হেমার হাত ধরে পাতকুয়োর দিকে এগিয়ে যান। রামস্বামী কি করবে কিছুই বুঝতে পারে না।

'রামস্বামী, বাগানটা বড় সুন্দর লাগছে। বেগুন, ট্যাড়স, ঝিঙে, কুমড়ো— বেশ ফসল হয়েছে দেখছি।'

'আজ্ঞে হুজুর, সবই আপনার কৃপায়।'

'আমি আবার কি করলাম? সবই তো, বেনুগোপালের কৃপা। আমি শুধু নিমিত্তমাত্র।'

'ও কথা বলবেন না, হুজুর। এই গাঁয়ে আমি এক আগন্তুক, গাঁয়ে এতো লোক থাকতে জমির পাটা আপনি আমাকে দেওয়ালেন। আপনার দয়া না হ'লে আমার যে কি অবস্থা হ'তো!' বিনয়ে রামস্বামী মাটিতে নুয়ে পড়ে।

'এ সব বলে শুধু শুধু আমার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হ'য়ো না রামস্বামী। একটা কথা বলো তো দেখি। গাঁয়ের লোকেরা আমার নামে কি বলে? ওদিকে যাওয়ার সময়ই বা তোমার কোথায়?'

'আজ্ঞে হুজুর, কয়েকদিন আগে গাঁয়ের দিকে গেছিলাম।'

'লোকেরা বলে আমরা নাকি দু'জনে এক থালায় খাই, এক খাটে শুই। আমাদের দু'জনকে ওরা হরিহর-আত্মা মনে করে।'

'হুজুর, কোথায় আপনি আর কোথায় আমি?'

'এ কথা আমি শুনতে ভালোবাসি না। আমাদের মধ্যে ছোট-

বড়র বালাই যেন না থাকে। পাঁচজনের বলার কি দরকার। সত্যিই তো আমরা বন্ধু। তুমি কি এ কথা মানো না? বলো?'

'একি কথা বলছেন হুজুর, একি কথা বলছেন?'

'তুমি তো জানো রামস্বামী, আমি কারুর বাড়ীর চৌকাঠ মাড়াই না। শুধু মন্দিরে যাই আর তোমার কাছে আসি। আরে··· কলাও পেকে তৈরি, সাবাস্।'

'হ্যাঁ, হুজুর।'

'এইবার মনে পড়েছে, কাল রাতে এই নিয়ে বৌয়ের সঙ্গে তুমুল এক ঝগড়া হয়ে গেলো।'

'কি হয়েছিলো, হুজুর?'

'ওর নালিশ, আমি নাকি মোটেই তোমার হেমার দেখাশোনা করি না।'

'বাবু, মাঠাকুরুন তো সাক্ষাত দেবী ভগবতী!'

'আসল কথাটা তো তোমায় এখন বলাও হয় নি। বাড়ীর কথা আমি কাউকেই বলি না। এখন তো তোমার মা ঠাকুরুন মা হতে চলেছে, সবে তিন মাস।'

'বড় সুখবর শোনালেন হুজুর। পেয়ারার মতো আপনার ছেলে হবে, আমার মন বলছে।'

'আমার মনের কথা তুমি ঠিকই ধরেছো। আমাদের দু'জনের একই মন, একই চিন্তা।'

'আজ্ঞে, হুজুর, তাই।'

ভোরবেলায় গাঁয়ে যাবো, তোমার মাঠাকরুনও আমার সঙ্গে যাবে। তুমি তো এসব আর বুঝলে না রামস্বামী, তুমি সত্যিই ভাগ্যবান। তোমার দায়-দায়িত্ব বলতে তো কিছু নেই। আমার

ছয় .শালী, সবচেয়ে ছোটর বিয়ে। খালি হাতে গেলে লোকে হাসবে। সোনা-জহরত আমার সাধ্যের বাইরে। কিছু না কিছু তো দেবে। গিন্নি বলছিলো বিয়েতে কি ফলমূল নিয়ে যাবে। আমি বললাম, খুব ভালো কথা। বলে তো খালাস, এখন পাই কোথায়? কাকেই বা বলি। হয় তোমাকে বলতে হবে, না-হয়তো অন্যের কাছে যেতে হবে। গিন্নীকে বললাম, ও কাজ আমার দ্বারা হবে না। দেখো রামস্বামী··· ও আমাকে তিক্ত-বিরক্ত করে মারলো··· এখন আবার ও গর্ভবতী, কিছু বিশেষ বলতেও পারি না।'

ধর্মাবতারের বিপদের কথা শুনে রামস্বামীর মন গলে যায়।

'কেন হুজুর, আপনি এ কথা কেন বলছেন! মাঠাকরুনের কথা তো রাখতেই হবে। এ বাগান তো আপনারই! আপনার কিসের অভাব?'

'আমি জানতুম তুমি এই কথাই বলবে। এ ভরসাতেই তো এসেছি। আমি এও জানি আমার পয়সা দেওয়াটা ভালো দেখাবে না, তোমার নেওয়াটাও উচিত হবে না। তা হলে কি উপায় হবে?'

'পয়সার কথা আপনি মুখেই আনবেন না হুজুর!'

বার বার বারণ করা সত্বেও ধর্মাবতার রামস্বামীর সঙ্গে খেতে সব্জী কাটতে লাগলেন। কথা বলতে বলতে ধর্মাবতারকে সব্জী কাটতে দেখে রামস্বামী মনে মনে খুশি হয়। কুঁড়ে থেকে রামস্বামী একটা বস্তা নিয়ে আসে। বৃষ্টির সময় ঐ বস্তাটাই তার ছাতার কাজ দেয়। বস্তাটা তরিতরকারীতে ভরে মুখটা ভালো করে বেঁধে দেয়।

'এক কথায় তুমি সব্জীতে বস্তাটা ভরে মুখ বেঁধে দিলে। আমার সব দুশ্চিন্তা দূর হ'লো। এখন তোমার মাঠাকরুন খুব খুশি হবেন। এবার ওঁর কোলও ভরবে! মানে··· ঐ কলার কাঁদি ···'

'দাঁড়ান বাবু; কলাও নোবো।'

ধর্মাবতারের একটু সঙ্কোচ হয়। কোনো কিছু বলার আগেই রামস্বামী কলার কাঁদিটা তাঁর সামনে এনে হাজির করে। ধর্মাবতার ভাবেন, সত্যিকারের ভালোবাসার এই তো নমুনা। রামস্বামী সব্জীর বস্তাটা মাথায় তুলে নেয় আর কলার কাঁদিটা বগলে। ধর্মাবতারের পেছনে পেছনে চলতে সুরু করলো। ধর্মরাজের স্বর্গারোহণের সময় তাঁর পেছনে কুকুরের যাওয়ার কথা ধর্মাবতারের মনে পড়ে যায়। কিন্তু মুখে তিনি কিছু বললেন না।

কিছুক্ষণ আগে ফলে আর সব্জীতে বাগানটা হাসছিলো। এখন সেটা এক বৃদ্ধের নিরস মুখের মতো দেখায়। সন্ধ্যের পরই রামস্বামীর কুঁড়ে অন্ধকারে ঢাকা পড়ে যায়।

ধর্মাবতারের বাংলো বাড়ীতে আলো জ্বলছিলো। রামস্বামী কাঁধ থেকে বোঝা নামিয়ে ঘাম মুছে নেয়। ধর্মাবতারের দয়া হয়। তাড়াতাড়ি একঘটি জল এনে দেন। জল খেয়ে রামস্বামীর ক্লান্তি দূর হয়। ক্ষীণ আলোয় দুজনকেই প্রসন্ন দেখায়।

'এতো অন্ধকারে ও পেছনের ঘরে, রামস্বামী, একটু দেখো তো।'

ওদিকে যাবার আগে রামস্বামী একবার কলার কাঁদিটার দিকে তাকায়। পুরুষ্ট কলাগুলো দেখে তার মেয়ের কথা মনে পড়ে যায়। ওদিক থেকে নজর সরিয়ে নিয়ে পেছনের দিকে এগোয়। ধর্মাবতার কাঁদি থেকে তিন-চারটে কলা ছিঁড়ে নিয়ে খেলেন। স্ত্রী মঁগম্মাও এসে গেলেন।

'আমি স্বপ্নেও ভাবি নি কলাগুলো এতো মিষ্টি। নতুন খাদ পড়ার আগেই বোধহয় ও এগুলো ফলিয়েছে। কি সুন্দর, কি রকম সুস্বাদু।'
স্বামীর কথা শুনে মঁগম্মাও দু'টো কলা ছিঁড়ে খেয়ে দেখলেন।

'রামস্বামী কোথায় ?'

'পেছনের দিকটা গোবর আর জঞ্জালে একাকার হয়ে আছে, ওকে একটু পরিষ্কার করে দিতে বলেছি। এই এলো বলে।'

'ওকে দেখেই তোমার অমনি কাজের কথা মনে পড়লো, আর অমনি ওকে কাজে লাগিয়ে দিলে। ও তো আমাদের জন্যে প্রাণপাত করতেও রাজি। নিজের পেটের চিন্তা না করেই সে বেগার খেটে মরে। মরুক গে— এদিকে সব্জীগুলো দেখ। তোমার বোনের বিয়ের জলুস কি রকম বাড়বে।'

'তা বটে! তোমার শালীও বুঝবে যে তার জামাইবাবু তাকে কত ভালোবাসে। এছাড়া আর কি!'

স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই মহাখুশি। রামস্বামী ঘরে ঢুকতে না ঢুকতেই ধর্মাবতার কৃত্রিম রাগে ফেটে পড়লেন, 'দেখো রামস্বামী, তুমি আমাদের ভালোবাসতে পারো, কিন্তু নিজেকে এভাবে অবহেলা কোরো না।'

মালিককে রাগতে দেখে বেচারী রামস্বামী ভয় পেয়ে যায়। তার এহেন অবস্থা দেখে ধর্মাবতার পিঠ চাপড়ে স্নেহভরে বললেন, 'তুমি এখানে এতো দেরী করলে তোমার বাগান আর হেমার কি অবস্থা হবে ভেবে দেখেছো? যাও, আর দেরী কোরো না। তাড়াতাড়ি বাড়ী যাও। হেমার তো আমাদের মতো এইরকম বাড়ীতে থাকার কথা। ভালো কথা— এবার তুমি যাও। কাজের কথা শুনলেই তুমি প্রাণপাত করতে বসো। রাতদিনের খেয়াল করো না; হাড়ভাঙা খাটুনি খাটো।' মালিকের এই মৃদু ভর্ৎসনায় রামস্বামীর মন এক পসলা বৃষ্টির মতো ধু'য়ে মুছে পরিষ্কার হয়ে যায়। মেয়ের কথা মনে হওয়ায় আনন্দে আত্মহারা হয়ে যায়।

'হেমা বলতেই আমার মেয়ে। আসলে আপনার ছায়াতেই ও মানুষ হবে। আপনার কৃপায় ও পড়াশোনা করে বড় হবে।'

'রামস্বামী, হেমার কপাল খুব ভালো। আমার কথা বিশ্বাস করো, বাগানে জন্মেও সে দুর্গের মধ্যে ফুটে উঠবে। আচ্ছা, এবার এসো। আমাদের কথা বলতে বলতে ভোর হয়ে যাবে, বুঝতেও পারবে না। হ্যাঁ শোনো— যাওয়ার পথে টাঙ্গাওয়ালাকে একটা খবর দিয়ে যেও। কাল সূর্য ওঠার আগেই যেন এসে হাজির হয়।' এই কথা বলে ধর্মাবতার রামস্বামীকে বিদায় দেন।

'এই তো আমাকে বকছিলে যে ওকে দেখলেই আমি কাজ করতে বলি। এখন নিজেও তো সেই কাজ করলে।' মঁগম্মা অনুযোগ করে।

'দেখো, তুমি ওকে কোনো কাজ করতে বলো তো আমার দয়া হওয়া উচিত আর আমি কিছু করতে বললে তোমার হওয়া উচিত। বুঝলে, মানুষের মনের কথাটা বুঝতে পারাটাই মানুষের মহত্ত্ব। সকলকে বোঝাতেই আমার চুল সাদা হয়ে গেলো।'

'তুমি কত সুন্দর করে বুঝিয়ে দাও, বলো তো— যেন খোসাটা ছাড়িয়ে কলাটা মুখে পুরে দিলে।' মঁগম্মা মনে মনে খুশি হয়ে মিষ্টি সুর ভাঁজতে থাকেন। 'বেচারা রামস্বামী বড় সাদাসিদে।' নিজের অন্তর থেকে সে বলে ফেলে— ভাবখানা এই যেন হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ে গেছে। 'এবার বুঝতে পেরেছো তুমি! সব মুক্তো একই জায়গায় জড়ো হয়। মানে সব ভালো লোকই এক জায়গায় এসে জোটে। এই কথাটা তোমার বোঝা উচিত। থাক এসব কথা। বেশি ভাবলে তোমার চিন্তা বাড়বে। এখন তুমি গর্ভবতী।'

সন্ধ্যেবেলার যুঁইফুলের মতো মঁগম্মা লজ্জায় নুয়ে পড়লেন। শালীর বিয়ে থেকে ফিরে এসে ধর্মাবতার রোজই রামস্বামীর কাছে যান।

রামস্বামীর বাগানের তরিতরকারীর স্বাদ বরযাত্রীদের যে কত ভালো লেগেছিলো, কত আনন্দ করে তারা খেয়েছিলো, এইসব কথাই ধর্মাবতার দশদিন ধরে বারবার নানাভাবে বলতে থাকেন। রামস্বামী আনন্দে আটখানা। বড় বড় ভুট্টার দানা সেঁকে রামস্বামী ধর্মাবতারকে খাওয়ায়, মহানন্দে তিনি তা খান। ধর্মাবতারের বাড়ীতে সব্জীর বস্তা নিয়মিত পৌঁছোতে থাকে। রামস্বামীও রোজ তাঁর উঠোনের গোবর আর জঞ্জাল পরিষ্কার করে এক কোণে জড়ো করে রাখে। দিন কেটে যায়, দেখতে দেখতে মাসও চলে যায়। ক্রমে ধর্মাবতার রামস্বামীর সঙ্গে বাবলাগাছের আঠার মতো এঁটে গেছেন। ঠিক যেন গঙ্গার এঁটেল মাটি আর দেওয়ালে আটকানো টিকটিকি। দু'জনের স্নেহ এতো গভীর হয়ে পড়লো যে আলাদা করা অসম্ভব।

নতুন কোনো ফসল ফলাবার ক্ষমতা জমির আর রইলো না। বাগানের মতো হেমারও অবস্থা। মনের সকল কামনা-বাসনা শুকিয়ে গেছে।

রামস্বামীর বুদ্ধির মতো কালচক্রও ঘুরতে লাগলো। গ্রীষ্ম এসে পড়ে। পাতকুয়োয় এক ফোঁটা জল নেই, তার হৃদয়ও শুকিয়ে গেছে। গতবারের ফসল রামস্বামীর এতটুকুও লাভ হয় নি। এবারের খাজনার টাকা রামস্বামী মৃত স্ত্রীর শেষ গয়না বিক্রি করে ধর্মাবতারের হাতে তুলে দিয়েছি। সময় শেষ হবার আগেই বিশ্বস্ত লোকের মতো টাকাটা জমা দেওয়াতে ধর্মাবতার পাঁচজন লোকের সামনে রামস্বামীর ভূয়সী প্রশংসা করেন।

নিজের বেলায় রামস্বামী ফ্যানের সঙ্গে লঙ্কা টিপে খেয়ে মহানন্দে কাটিয়ে দেয়। মেয়ের জন্যে একটা ফ্রকও কিনতে পারে নি রামস্বামী। ভেবে দু'তিন-বার চোখের জল মুছেছে। হেমার কোনো

ইচ্ছেই রামস্বামী পূরণ করতে পারে নি। এবারের ফসলের পুরো টাকা সে উশুল করবে বলে ঠিক করে। মনে মনে ভাবে বাগান ছেড়ে সে কোথায়ও যাবে না, মাটিতে সোনা ফলাবে। যোত দিয়ে জমি পরিষ্কার করে। কুঁড়ের ছাদ বদলে নেয়। কুঁড়ের সামনের চাতালের পাড় মেরামত করে বৃষ্টির মুখ চেয়ে বসে থাকে।

একদিন এক ঝাঁক কাকের মতো কালো মেঘ ঘনিয়ে আসে। রামস্বামীর চোখে জল ভরে আসে। রাতভোর ঘুমোতে পারে না; এপাশ ওপাশ করে। জমিতে খাদ দেবার মতো খাদ নেই, হাতে পয়সাও নেই। বিনা খাদে খেত কি করে করবে। মাঝরাতে ধর্মাবতারের কথা মনে হয়। নিজের হাতে জড়ো করা জঞ্জালের ঢিবির কথা মনে পড়ে যায়— কমপক্ষে পঞ্চাশ-ষাট গাড়ীর মতো খাদ হবে। রামস্বামী জানে, সে চাইলে বাবু তার কথা মেনে নেবে। ফসলের টাকা হাতে পেলেই ধার চুকিয়ে দেবে। দশ ঠেলার মতো কুঁড়োই যথেষ্ট। রামস্বামী আরামে শুয়ে পড়ে।

মঁগম্মা পুজো-পাঠ নিয়ে ব্যস্ত। কফি খেয়ে ধর্মাবতার বাইরের বারান্দায় বেরিয়ে এসে রামস্বামীকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেই চমকে ওঠেন, 'আরে! কতক্ষণ দাঁড়িয়ে? ভেতরে আসো নি কেন? এখানে হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে কেন? আচ্ছা, বলো, কি ব্যাপার?'

'আজ্ঞে, হুজুর, একটা ছোট্ট ব্যাপারে আপনার কাছে আসতে হ'লো।'

'আমার কাছে? হ্যাঁ, হেমা কেমন আছে? মাসখানেক হ'লো আর ওদিকে যেতে পারি নি। গিন্নীর ছেলেপুলে হবে বলে আর বাইরে বেরোনোই হয় না।'

'হুজুর— পুরো খেতে জোত দিয়ে দিয়েছি— আকাশে কালো মেঘ ঘনিয়ে এসেছে।'

'হ্যাঁ, তুমি খাজনাও তো দিয়ে দিয়েছো।'

'হুজুর, এবার আপনার সাহায্য চাই।'

'রামস্বামী! তোমাকে কতবার না বলেছি যে এভাবে কথা বলবে না। আমরা দু'জনে বন্ধু, নিজের নিজের জায়গায় আমরা দু'জনেই বড়ো।'

রামস্বামীর মনে এতোক্ষণ ধরে যে সব কথা তোলপাড় করছিলো তা আপনা হতে বেরিয়ে আসে: হুজুর, আসলে ব্যাপারটা হচ্ছে এই। দশ গাড়ী খাদের ব্যবস্থা করতে হবে। ফসল ফলার সঙ্গে সঙ্গেই আপনার টাকা শোধ করে দেবো। বাইরে থেকে কেনবার মতো পয়সা আমার হাতে নেই। এখন যদি জমিতে খাদ দিতে না পারি তো এবারে মাটি খেয়ে থাকতে হবে। এই অসময়ে আপনি সাহায্য করলে হেমা আর আমি ভাতের ফ্যান খেয়েও আপনার নাম করবো।' কথাগুলো শেষ হলে রামস্বামী ঘন একটা নিঃশ্বাস ফেলে।

একটু আগে মঁগম্মাও ওখানে এসে দাঁড়িয়ে ছিলেন, সব কথা শুনলেন।

ধর্মাবতার খানিকক্ষণ ছটফট করতে থাকেন, যেন বেঘোরে কোথাও চোট লেগে গেছে। চিৎকার করলেও গলা থেকে যেন স্বর বেরোয় না। খুব দুঃখ প্রকাশ করে ধর্মাধিকারী বললেন, 'রামস্বামী! কোনো জিনিস চাইবার সময় আমরা কত বিড়ম্বনায় পড়ি। আমরা যতই বড়লোক আর ভালো লোক হই না কেন লেনদেনের ব্যাপারে আমরা সবাই ছোট হয়ে যাই। এ নয় যে

আমার কাছে জিনিসটা নেই বা আমি তোমায় দিতে চাই না। কিন্তু বিজ্ঞেরা কি বলে গেছেন জান? ওঁরা বলে গেছেন যে কাউকে কিছু দেওয়া মানেই তার সঙ্গে শক্রতা ডেকে আনা। আমি চাই না যে আমাদের বন্ধুত্ব নষ্ট হয়ে যায়। ধার নেওয়া-দেওয়া আমাদের বন্ধুত্বের মধ্যে একটা কাঁটা হয়ে দাঁড়াবে। তাই এটা উচিত হবে না। আমি একটা কথা বলছিলাম— তুমিও ভেবে দেখো— ঐ যে আছেন— মন্দিরে স্বামী বেনুগোপাল— তিনি তোমাকে পথ দেখাবেন— তোমার কি মনে হয়।'

'আজ্ঞে হুজুর— আদেশ করুন তো বাড়ী ফিরি।' বলে রামস্বামী চলে গেলো। চোখে সবই অন্ধকার ঠেকে। 'ধর্মাবতার বোধ হয় ঠিকই বলেছেন— কিন্তু যদি তিনি ধারে খাদ দিতেন, তা হলে ধার আমি নিশ্চয়ই মিটিয়ে দিতাম। আমার কপালই মন্দ।' রামস্বামীর পা আর চলে না।

ধর্মাধিকারী হতবাক হয়ে ওখানেই দাঁড়িয়ে থাকেন। মঁগম্মার মনের এককোণে একটা কথা উঁকি মারে; বেচারী রামস্বামীকে খাদ দিলে বোধ হয় ভালোই হ'তো।

'হ্যাঁ গো, বেচারা মুখ ফুটে চাইতে এলো। আমাদের কাছে অজস্র খাদ তো পড়েও আছে।' মঁগম্মা স্বামীকে শুধু এই কথাটুকুই বলতে পারলেন।

'তুমি ক্ষেপেছো! তুমি তো মা হতে চলেছো। এসব চিন্তা নিয়ে মন খারাপ কোরো না। আসলে এটা ভাবাই ভুল যে আমাদের কাছে অনেক আছে। শুধু ভুলই নয়, অহঙ্কারও বটে। ভগবান কৃষ্ণ কি বলেছিলেন? "দাতাই বা কে? গ্রহীতাই বা কে? মরবারই বা কে? আর মারবারই বা কে? আমিই তো সব।" আমাদের বন্ধুত্বের

মধ্যে কোনো স্বার্থের দ্বন্দ্ব নেই। আমরা বন্ধুত্বকে এইভাবে বজায় রাখবো, না ছোটখাট লেনদেন করে নষ্ট করে ফেলবো। আগ্নেয়-হোত্রীর মতো আমাদের পবিত্র জীবনও এইভাবে কেটে যাবে। ধার দিলে বা নিলে, তা পরিশোধ করার জন্যে কুকুর কিংবা শেয়ালের জন্ম নিয়ে আবার আসতে হবে। এ জন্মেই পরমাত্মার সঙ্গে লীন হয়ে যেতে পারি ; পুনর্জন্মের কথা আমার কানেও যেন না আসে।' তাঁর বক্তৃতা সমানে চলতে থাকে।

'তুমি দেখছি তিলকে তাল করো।' মঁগম্মা বলেন।

'থাক, এবার ভেতরে চলো। বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা ঠিক নয়, তোমার পেটে এখন বাচ্চা।' ধর্মাধিকারী আদর করে বললেন।

সেদিন অমাবস্যা। মাঝরাত। আকাশ ভেঙে মুষলধারায় বৃষ্টি পড়েছে। বিদ্যুতের চমকে আর মেঘের ডাকে বুক দুরদুর করে। রামস্বামী নিজের কুঁড়েতে বিষণ্ণ মনে বসে। ক্ষুধা আর চিন্তায় সে নির্জীব হয়ে পড়েছে। খাদের অভাব আর কাল কি হবে এই চিন্তায় সে আধমরা। রামস্বামী ! রামস্বামী ! দূর থেকে চিৎকার ভেসে আসে। শব্দ শুনে রামস্বামী চমকে ওঠে। 'আমি রামস্বামী।' ধর্মাবতারের গলা সে চিনতে পারে। টলতে টলতে উঠে গিয়ে দরজা খুলে দেয়। ছাতাটা বন্ধ করে ধর্মাবতার ঘরের ভেতর ঢুকে পড়েন।

'বাবু, এই মাঝরাতে ? আপনি ? এখানে ?'

'আমার মাথায় বাজ পড়েছে, রামস্বামী। আমি জানি এই দুঃসময়ে তুমিও আমাকে সাহায্য করবে। তাই তোমার কাছে ছুটে এসেছি।'

'কি হয়েছে বাবু ?'

ধর্মাবতারের গলার আওয়াজ কাঁপতে থাকে। কাঁদতে কাঁদতে

বলেন, 'মাঠাকরুনের অবস্থা খুব খারাপ। প্রসবযন্ত্রণা সহ্য করতে পারছেন না। তোমাকে এখনই মানাপুরম থেকে বৈদ্যকে ডেকে আনতে হবে। না হলে উনি বাঁচবেন না। রামস্বামী! তুমি এখনও দাঁড়িয়ে। আমার ঘরের প্রদীপ তুমি জ্বালিয়ে রাখো।' বলতে বলতে ধর্মাবতার রামস্বামীর হাত দু'টো জড়িয়ে ধরেন।

রামস্বামী এক মিনিট ভাবে। মানাপুরম তো মাইল তিনেক দূরে। যদি বৈদ্যকে সে নিয়ে না আসে— যদি মাঠাকরুন না বাঁচেন— তা হলে আর সে ভাবতে পারে না। ধর্মাবতারও আর স্থির থাকতে পারছিলেন না।

'রামস্বামী! ভেবে সময় নষ্ট করলে ওঁকে আর বাঁচানো যাবে না; আর ও না বাঁচলে আমিও বাঁচবো না।'

'বাবুজী!'

'তুমি কি চাও!'

'ঐ টর্চটা আমাকে দিন; আমি এক্ষুণি যাচ্ছি।'

মুহূর্তের জন্যে ধর্মাধিকারীর বাকরোধ হয়ে যায়। ছাতা আর টর্চ তিনি আরো ভালো করে চেপে ধরলেন। বললেন, 'তুমি তো জোয়ান। চিতাবাঘের মতো তুমি অন্ধকারে চলে যেতে পারো। এই ছাতা আর টর্চ তো আমার পা আর দৃষ্টি। এদের ছেড়ে আমি এক পাও নড়তে পারবো না।'

রামস্বামী শুধু মাথা ঢাকার জন্যে বস্তাটা খুঁজতে থাকে। কিন্তু তার সেই একটি মাত্তর বস্তাও ধর্মাধিকারীর বাড়ীতেই থেকে গেছে। হেমা একটা চাদর গায়ে দিয়ে ঘুমোচ্ছে' সেই চাদরটা টেনে নিয়ে মাথা ঢেকে রামস্বামী তীরবেগে অন্ধকারের মধ্যে বেরিয়ে যায়। ধর্মাধিকারী মুহূর্তের জন্যে ওখানে দাঁড়িয়ে রইলেন। কপাটটা বন্ধ

করে তিনি বাড়ীর দিকে রওনা হলেন। ছোট্ট হেমা শীতে কুঁকড়ে গুটিশুটি মেরে শুলো।

মানাপুরমের বৈদ্য রামস্বামীর কথা শুনে চাগিয়ে উঠলেন। ভাবেন এতো ভালো মওকা, ছাড়া উচিত হবে না, যদি এই 'কেস্'টা ভালোভাবে উৎরে যায় তা হলে আশে-পাশের আর দশটা গাঁয়ে তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়বে। বৃষ্টিও ধরে এসেছে। সাইকেলে চেপে বেরোবার সময় বৈদ্যমশায় বলেন, 'রামস্বামী, এক মিনিটের মধ্যে আমি বাবুজীর বাড়ী পৌঁছে যাবো। তুমি আস্তে আস্তে এসো।' বৈদ্য হাওয়ায় ছুটে চলে।

রামস্বামী ঘরমুখো হ'লো। ওর মন খাঁখাঁ করছে। কিছুই ভাবতে পারে না। শরীরও দুর্বল, শিথিল হয়ে এসেছে। মনের মধ্যে বৈরাগ্যের ভাব উদয় হতে থাকে, তার মনে এই ভাব কেন বুঝতে পারে না।

বৃষ্টি থেমে গেছে। কিন্তু বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। খেতখামার সব যেন সমুদ্দুর মনে হচ্ছে। রামস্বামী ঝোপ-ঝাড়ের রাস্তা ছেড়ে খেতের মাঝ দিয়ে চলতে থাকে। নিজের বাগানের কাছে পৌঁছতেই বাজ পড়লো। রামস্বামীর মনে হয় ওর কুঁড়েঘরের ওপরেই পড়লো। সে ছুটতে আরম্ভ করে।

'হেমা, হেমা' বলে সে জোরে ডাক দেয়। ধর্মাবতারের নিজের খেতের সামনে দেবত্ব-ভূমি। ধর্মাবতারের ক্ষেতের মধ্যে দিয়ে সে ছুটে যাচ্ছিলো। পথের কাঁটা, পাথর কুচি সব অগ্রাহ্য করে সে ছুটে চলে; পথ হারিয়ে ফেলে। ভুলে যায় ঐ ক্ষেতের মধ্যে একটা পাতকুয়ো আছে। 'হেমা, হেমা বলে ডাক দিতে দিতে পাতকুয়োর মধ্যে গিয়ে পড়ে। তার শেষ ডাক আর শেষ নিঃশ্বাস এই পাতকুয়োর মধ্যেই হারিয়ে যায়।

পরের দিন ভোরে ধর্মাবতারের পুত্র হ'লো। সেদিন সন্ধ্যেবেলায় গ্রামের পঞ্চায়েতে রামস্বামীর মৃত্যু নিয়ে আলোচনা সুরু হয়। গ্রামবাসীর সঙ্গে ধর্মাবতারও রামস্বামীর মৃতদেহের সঙ্গে শ্মশান অবধি গেলেন। স্বয়ং উপস্থিত থেকে তার শেষকৃত্য করলেন। সারাদিন হেমা কাঁদতে থাকে। কাঁদতে কাঁদতে ধর্মাবতারের কাঁধে ঘুমিয়ে পড়ে। গাঁয়ের লোকেরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করে যে ধর্মাবতার গভীর শোকে আচ্ছন্ন।

'বাবুজী, তার দিন ফুরিয়েছিলো, তাই— চলে গেছে। ওর আর আপনার বন্ধুত্ব খুব গভীর ছিলো। এই ছোট মেয়েটি এবার আপনার আশ্রয়ে এলো। ওর পৃথিবীতে আর কেউ নেই।' কথাটা শ্মশানে কে একজন বলেছিলো।

'রামস্বামী বন্ধুর জন্যে প্রাণ পর্যন্ত দিতে পারে, এমন নিঃস্বার্থ বন্ধু ছিলো। কিন্তু সে বন্ধন ওর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে শেষ হয়ে গেছে। মায়ার বন্ধনে জড়িয়ে পড়লে তা থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া কঠিন। জীবন ক্ষণস্থায়ী। এই ক্ষণভঙ্গুর জীবনে এই বন্ধন ও সম্পর্ক আমি স্বীকার করতে পারি না।' ধর্মাধিকারী বাণী দিলেন।

পরে, কোনো-এক সৎব্যক্তির সাহায্যে হেমা এক অনাথালয়ে গিয়ে উঠলো। গ্রামবাসীরা আজও রামস্বামী আর ধর্মাধিকারীর গভীর সম্পর্কের কথা ফলাও করে বলে। রামস্বামীর মর্মান্তিক মৃত্যুর কথা কেউ ভাবে না।

লেখক পরিচিতি

ত্রিপুরনেনি গোপীচাঁদ

অন্ধ্রপ্রদেশে যুক্তিবাদের প্রচারক প্রসিদ্ধ রামস্বামীর পুত্র গোপীচাঁদ ছিলেন চাষার ছেলে। এঁর লেখা বিখ্যাত উপন্যাস 'অসমর্থু'নি জীব যাত্রা' একজন যুক্তিবাদীব জীবন-চরিত। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁকে 'পণ্ডিত পরমেশ্বর শাস্ত্রী বীলুনামা' উপন্যাসের জন্য সাহিত্য-আকাদেমী পুরস্কার দেওয়া হয়। কিছুদিন তিনি ছায়াছবির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এই সংকলনে তাঁর 'মমতা' গল্পটি নেওয়া হয়েছে।

পালগুম্মি পদ্‌মরাজু

এঁর লেখা 'গালিভান' (তুফান) নিউ ইয়র্ক হেরাল্ড ট্রিবিউন পত্রিকার আয়োজিত বিশ্ব-গল্প প্রতিযোগিতায প্রথম পুরস্কার পায়। তিনিই তেলেগু-গল্পকে বিশ্বের দরবারে পৌঁছে দেন। নাট্যকার ও ছায়াছবির কাহিনীকার হিসেবে খ্যাতিমান। তাঁর লেখায় অন্ধ্রবাসীদের জীবনের নিখুঁত প্রতিচ্ছবি ফুটে ওঠে। তাঁর গল্পের রচনাশৈলী আব মানবমনের বিশ্লেষণ পাঠকমনকে অভিভূত করে।

চলম্‌

শ্রীগুডিপাটি ভেঙ্কট চলম্‌ তেলেগু-সাহিত্যের অগ্রগণ্য। সমাজের অর্থহীন পূতিগন্ধময় কুসংস্কারের বিরুদ্ধেই তিনি কলম ধরেন। প্রতিটি গল্পেই এ সবের ওপর তিনি কশাঘাত করেছেন। একসময় তাঁর গল্প পুড়িয়েও ফেলা হ'তো। পাঠকদের ধারণা হয়েছিল যে তাঁর গল্প পড়লে স্ত্রীজাতির বিচারবুদ্ধি কলুষিত হবে। তিনি বিশ্বাস করতেন যে সেক্স-এর ব্যাপারেও মেয়েদের পূর্ণ স্বাধীনতা থাকা উচিত। কাহিনী ছাড়াও উপন্যাস, নাটক ও প্রবন্ধ তিনি লিখেছেন। এই সংকলনে তাঁর রচনা 'দোষগুণ' প্রকাশিত হয়েছে, সেক্সের জন্যে সর্বনাশের পথে যে স্ত্রী, তার এক করুণ অথচ জীবন্ত চিত্র এই 'দোষগুণ'।

বুচ্চিবাবু

পাশ্চাত্য সাহিত্যের প্রেরণায় আধুনিক তেলেগুর কাল্পনিক সাহিত্যরচনার নতুন পথে তেলেগু-সাহিত্যকে যাঁরা সমৃদ্ধ করেছেন, তাঁদের মধ্যে বুচ্চিবাবুর বিশিষ্ট স্থান। এঁর বলিষ্ঠ আলেখ্য তাঁর গল্প ও তেলুগু উপন্যাস-সাহিত্যের অমূল্য রত্ন 'চিবরকু মিগিলেদি' (শেষ পর্যন্ত যা বেঁচে গেছে)। 'বুচ্চিবাবু'র আসল নাম—শিবরাজু ভেঙ্কট সুব্বারাও। ইনি কিছুদিন ইংরাজি সাহিত্যের অধ্যাপনা করেন। আকাশবাণী-তে জীবনের শেষ দিন অবধি কাজ করেছেন। ইনি বেশ কয়েকটি নাটকও লেখেন।

কোডবটিগণ্টি কুটুম্ব রাও

এঁর সমস্ত গল্পেই মধ্যবিত্ত গৃহস্থ জীবনই প্রতিবিম্বিত। তেলুগুর মধ্যবিত্ত গৃহস্থ ঘরের নানা সমস্যা নিয়েই এঁর গল্পের পটভূমিকা। যুবক-যুবতীর প্রণয়কাহিনী থেকে শ্রেণীসংগ্রাম—সব রকম সমস্যা নিয়েই তিনি গল্প লিখেছেন। রাজনীতির ক্ষেত্রে তিনি মার্ক্সিস্ট চরমপন্থীর সমর্থক ছিলেন। বহু ভারতীয় ভাষায় প্রকাশিত 'চন্দামামা' পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলীর তিনি একজন ছিলেন। শিশুসাহিত্য নিয়েও তিনি লিখেছেন। তেলুগু ভাষায় লেখা 'সুলভ বিজ্ঞানম্' নামে অনেক বিজ্ঞানের বই তিনি সাধারণ পাঠকদের জন্যে সরল ভাষায় লেখেন। আধুনিক তেলুগু-সাহিত্যের নামকরা সমালোচকদের মধ্যে তিনি অন্যতম।

রাচকোণ্ড বিশ্বনাথ শাস্ত্রী

শাস্ত্রীজির পেশা ওকালতি। ঝরঝরে ও গভীর তাঁর ভাষা। নকল করা সম্ভব হলেও অনুকরণ করা যায় না। তেলুগু উপন্যাস-সাহিত্যে তাঁর পরীক্ষামূলক সফল রচনা 'অল্পজীবি' স্মরণীয়। জেমস্ জাইসের 'চৈতন্যধারা'র শৈলীতে প্রকাশিত প্রথম তেলুগু উপন্যাস 'অল্পজীবি'। তেলুগু-সাহিত্যে জেমস্ জাইসের রচনাশৈলী আমদানি করার কৃতিত্ব শাস্ত্রীজির। তাঁর কথা-সংকলন অন্ধ্রপ্রদেশের সাহিত্য-আকাদেমী পুরস্কার পেয়েছে। এই সংকলনের 'আম কা পেড' বা আমগাছ গল্পটিতে মানব প্রকৃতির বিচিত্র ভাব ও গতিপ্রকৃতি সুন্দরভাবে চিত্রিত।

দেবর কোণ্ড বাল গঙ্গাধর তিলক

তিলক আসলে কবি। 'ভাব' অর্থাৎ ভাবপ্রধান ও 'অভ্যুদয়' (প্রগতি) বা প্রগতিবাদী কবিতার সেতুবন্ধন করেন তিলক। এরপর প্রচলিত হয় 'বচন' (গদ্যকবিতা)। এই কবিতা তাঁর অদ্ভুত লেখনীতে সমৃদ্ধ! তাঁর 'অমৃতম্ কুরিসিন রাত্রি' (সুধা ঝরে যে নিশিতে) নামে কাব্যসংকলনকে সাহিত্য-আকাদেমী তাঁর মৃত্যুর পর পুরস্কার প্রদান করেন। 'আশা-কিরণ' কি কবির রচিত গল্প? না, হৃদয়-বিদারক কাব্যখণ্ড? অভুক্তের ক্ষুধা না মেটার ভাবচিত্র? না আর কিছু?

চাগণ্টী সোময়াজুলু

তেলুগু লেখকদের মধ্যে চা. সো. নামে বিখ্যাত শ্রীচাগণ্টী সোময়াজুলুকে কথাসাহিত্যিক চেখভ্ বলা হয়। ইনি সংখ্যায় বেশি লেখেননি বটে তবে যে কটা লিখেছেন তা কথাসাহিত্যে উচ্চাঙ্গের রচনা বলে গণ্য। যে গল্পটা এখানে দেওয়া হয়েছে সেটারই মতো প্রত্যেক গল্পে তিনি আলাদা ভাষা ও রচনাশৈলীর প্রয়োগ করেছেন। প্রত্যেকটি গল্পের বুনুনি ও ঘটনাসমাবেশ বিভিন্ন। ওঁর মতে গল্প যদি সামাজিক প্রয়োজন মেটাতে না পারে তা হলে তার কোনো সার্থকতা নেই। চা. সো-র শ্লেষাত্মক গল্পগুলি বিশ্বসাহিত্যের যে কোনো ভাষার শ্রেষ্ঠ গল্পের সঙ্গে তুলনীয়।

পেদিদ্ভোট্ল সুব্বরামায়া

তরুণ কাহিনীকারদের মধ্যে সুব্বরামায়ার রচনাকৌশল বেশ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। জনসাধারণের জীবনকে সূক্ষ্মভাবে নিরীক্ষণ তাঁর গল্পের আলেখ্য। কাহিনী খুব সহজ ও আড়ম্বরহীন। কিন্তু পরিসমাপ্তিতে গল্পগুলি পাঠকের মনে গভীর রেখাপাত করে।

স্থানীয় সাপ্তাহিক পত্র-পত্রিকার আয়োজিত গল্প-প্রতিযোগিতায় তিনি কয়েকবারই পুরস্কার পেয়েছেন। 'ধ্রুবতারা', 'চেন্দ্রমাত্র' (তেঁতোগুলি), 'অঙ্গার তলপাম', 'মুক্তি পঞ্জরম্' তাঁর নামকরা উপন্যাস। 'নয়নতার', 'নীল্লু' (পানি), 'মুসুরু' (শিশির) তাঁর গল্প সংগ্রহ।

অবসরাল রামকৃষ্ণা রাও

জীবনের কেন্দ্র নারী, সাহিত্যেও তাই। এই সত্যকে স্বীকার করে তেলুগু-সাহিত্যে যাঁরা গল্প লিখেছেন তাঁদের মধ্যে রামকৃষ্ণা রাও অন্যতম। লেখকের

এই দৃষ্টিভঙ্গীর ফলে তাঁর রচনায় নারীচরিত্রই প্রাধান্য পেয়েছে। 'অর্থমুন্ন কথলু' (সার্থক গল্প) অন্ধ্রপ্রদেশের সাহিত্য আকাদেমী পুরস্কার পেয়েছে। 'সঁপেঙ্গলুসন্ন জাজুলী' (চাঁপা ও যুঁইফুল) নামে তাঁর উপন্যাস পাঠকসমাজে জনপ্রিয়। 'থইদূরকাল অত্মহতয়লু' (পাঁচ রকমের আত্মহত্যা) তাঁর অদ্বিতীয় লোকপ্রিয় গল্পসংগ্রহ। তাঁর পেশা ইংরেজির অধ্যাপনা, নিবাস বরহমপুম।

কোম্মুরি বেমুগোপাল রাও

ইনি একজন চিকিৎসক। এঁর প্রথম উপন্যাস 'পেক্কুটিল্লু' (খেলার ঘর) তেলুগু ভাষা-সমিতির পুরস্কার পায়। এর পরই তাঁর 'হাউস সার্জেন' উপন্যাসটি বিশেষ লোকপ্রিয় হয়ে ওঠে। ডাক্তারদের জীবন নিয়ে লেখা এই উপন্যাস। তিনি একজন নামকরা ঔপন্যাসিক। কিন্তু কাহিনীকার হিসেবে তাঁর আরো বেশি খ্যাতি।

পুরাণম্ সূর্যপ্রকাশ রাও

ইনি অনেকগুলি গল্প ও কয়েকটি উপন্যাসও লিখেছেন। 'মারে মনুষ্য়লু' (পরিবর্তনশীল মানুষ), ও 'আড্ ব্রতুকু' (নারীজীবন) তাঁর সাম্প্রতিক-কালের উপন্যাস। 'কাকুলু' (কাক) ও 'গরিক পোচলু' (তৃণের কাঠি) তাঁর গল্পসংগ্রহ।

মুল্লপূডি ভেঙ্কট রমণ

বেশ কিছুদিন তিনি সাংবাদিক ছিলেন। ব্যবসার তাগিদে তিনি যেসব লেখা লিখেছেন তা পড়ে পাঠকদের একটা ভুল ধারণার সৃষ্টি হয় যে তিনি একজন হাস্যরসিক। চার্লি চ্যাপলিনের হাস্যরসের মতো তাঁর লেখার হাস্যরসের আবরণ থাকলেও অন্তঃসলিলার মতো একটা করুণ রসের ছোঁয়াচ আছে। 'জনতা এক্সপ্রেস', 'মহারাজ-যুবরাজ', 'সাক্ষী' প্রভৃতি গল্পই এর প্রমাণ। গত দশ বছরে তেলুগু সাহিত্যে তাঁর যেসব ব্যঙ্গরসাত্মক রচনা প্রকাশিত হয়েছে তা 'রাজকীয় মেতাল পঞ্চবিংশতি' বইতে পাওয়া যায়।

মধুরান্তকম্ রাজারাম

শ্রীমধুরান্তকম্ রাজারামের গল্পের ভাষা খুব মার্জিত ও সুন্দর। চিতুর জেলার গ্রামের শোভা তাঁর গল্পে ছড়িয়ে আছে। তাঁর গল্পে বর্ণনার বিন্যাস ও তাঁর

দৃষ্টিতে সব কিছুই অদ্ভুত ও নতুন। এঁর গল্প অন্ধ্রপ্রদেশের সাহিত্য-আকাদেমী পুরস্কার পেয়েছে।

অধ্যাপনা তাঁর জীবিকা। তাঁর গল্পগুলি কয়েকটি সংকলনে প্রকাশিত হয়েছে। 'কম্মতেম্মের', 'বক্রগতুলু-ইতর কথলু' তাঁর গল্পসংকলন। 'ত্রিশঙ্কুস্বর্গ' তাঁর প্রসিদ্ধ উপন্যাস।

অব্বূরী ছায়াদেবী

শ্রীমতী ছায়াদেবী মাঝে-মধ্যে গল্প লিখে থাকেন। ইনি নয়াদিল্লীতে লাইব্রেরিয়ানের কাজ করেন। কয়েকটা পত্রপত্রিকা ছাড়া কয়েকটি কবিতা-সংকলনের তিনি সম্পাদনা করেছেন। সংকলনের গল্পটি 'ঘুমোচ্ছি'। এই গল্পে এক গৃহিণী ঘুমের জন্যে ছট্‌ফট্‌ করছেন, তারই কাহিনী।

স্মাইল

শ্রীস্মাইলের আসল নাম ইসমাইল। শ্রীইসমাইল বেশি গল্প লেখেননি। ইনি রামচন্দ্রপুরমে কমার্শিয়াল ট্যাক্স অফিসার। তাঁর গল্পে সেক্স খুবই থাকে, কিন্তু তাঁর গল্প সেক্স নিয়ে লেখা নয়। সমাজের নীচের স্তরের দীনহীন জনতার জীবনকে কেন্দ্র করে তাঁর গল্পের কাহিনী গড়ে ওঠে, এদেব কথাই গল্পের বিষয়বস্তু। এই সংকলনের গল্প 'খালি বোতল' লিখে তিনি যশস্বী হয়েছেন।

বীরাজী

শ্রীবীরাজীকে সবাই 'তোলি মালুপূ' বা প্রথম মোড়ওয়ালা বীরাজী বলে। সাংবাদিক হিসেবে কাজ করতে করতে গল্প-উপন্যাস লিখে যে-সব তরুণরা নাম করেছেন বীরাজী তাঁদের অন্যতম। মধ্যবিত্তঘরের ছেলেমেয়েদের নিয়েই তাঁর গল্প। 'তোলি মালুপূ' (প্রথম মোড), 'প্রেম পগ্‌গাল্‌' (প্রেমের লাগাম), 'সুখম্‌ কোসম' (আরামের জন্যে), 'ইদ্দরম ওকেট' (দুজনেই এক), 'মুলগচেট্ট' (সজিনের গাছ) প্রভৃতি তাঁর প্রকাশিত জনপ্রিয় উপন্যাস।

বলিওয়াড কাণ্ডা রাও

শ্রীকাণ্ডা রাও আদর্শবাদী লেখক। বিশাখাপত্তনমের উত্তব দিকের বাসিন্দাদের জীবনযাত্রা ভালোভাবে প্রত্যক্ষ করে তাকে নিজের গল্পের মধ্যে প্রতিফলিত করার ব্যাপারে যাঁরা খ্যাতিলাভ করেছেন ইনি তাঁদের অগ্রণী। মধ্যবিত্ত

সমাজের পারিবারিক জীবনের প্রেমকে কেন্দ্র করে তাঁর গল্প লেখা সুরু হয়। এখন তা বিভিন্ন দিকে শাখা-প্রশাখা বিস্তার করেছে। 'দগা পড়িন তম্মুড়ু' (প্রতারিত বন্ধু) তাঁর প্রসিদ্ধ উপন্যাস।

বীণাদেবী

'রাধম্মা পেণ্ডিল আগি পোয়িন্দী' (রাধম্মার বিয়ে স্থগিত হয়ে গেছে) তাঁর প্রথম গল্প। এরই মাধ্যমে তিনি পাঠকসমাজে পরিচিত হন। প্রসিদ্ধ লেখক রাজকোণ্ড বিশ্বনাথ শাস্ত্রী তাঁর গুরু। সমালোচকদের মতে তাঁর গল্পের রচনা-শৈলীতে শাস্ত্রীজির ছাপ স্পষ্ট। এমন-কি, তাঁর অনেক গল্প শাস্ত্রীজির রচনার অবিকল প্রতিধ্বনি।

আচণ্ট শারদা দেবী

ইনি তিরুপতির শ্রীভেঙ্কটেশ্বর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা। নামকরা গল্প-লেখিকাদের মধ্যে অন্যতমা। এর গল্পে প্রকৃতির বর্ণনায় কাব্যরসের মাধুর্য মেলে। প্রাচীন সাহিত্য খুব ভালো চর্চা করার ফলে তাঁর গল্পে ট্রাডিশন্যালি-জিমের ছাপ খুবই সুস্পষ্ট।

কালী পট্টনম্ রামা রাও

শ্রীরামা রাও অধ্যাপক। তাঁর গল্পে বাস্তবের আধিক্য, কল্পনার স্থান খুবই কম। তেলুগু-সাহিত্যে অনেক লেখক তাঁদের লেখার সুরুতে বাংলা সাহিত্যে প্রভাবিত হয়ে বাংলা গল্প-রচনাশৈলীর অনুকরণে গল্প লিখেছেন। এই প্রভাব থেকে বেরিয়ে এসে স্বচ্ছ ও সুন্দরভাবে যাঁরা তেলুগু গল্প লিখেছেন তাঁদের মধ্যে শ্রীরামা রাও অগ্রগণ্য। শ্রীকাকুলমের আশেপাশে যে-সব লোকেরা বসবাস করে তাদের সামাজিক জীবন, আচার-ব্যবহার তাদের চিন্তাধারা ও সমস্যা, সমস্যার মূল কারণগুলো খুঁজে বের করে তা দিয়ে অনেকটা আলোচনা-মূলক গল্প-রচনাই তাঁর বৈশিষ্ট্য। এঁর অধিকাংশ গল্প ছোটখাটো উপন্যাসের মতো। 'খণ্ড', 'হিংসা', 'নো-রুম, অভিষক্তিয়া', 'পেম্পকপু মমকার ম (পালন-পোষণের মোহ), অভিমানালু' 'রাগময়ী', 'সেনাপতি বীর ন্না', 'অবিদ্যা-জ্ঞান' প্রভৃতি এঁর গল্প।

শ্রীপতি

শ্রীপতি অধ্যাপক। আজকের তরুণ লেখকদের মধ্যে উদ্দেশ্যমূলক গল্প যাঁরা লেখেন শ্রীপতি তাঁদের অন্যতম। গল্পের বিষয়বস্তু সাধারণত দয়া ও করুণরসের।

এই সংকলনের কাহিনী 'হাতলওয়ালা চেয়ার' গ্রাম্যশাসন-ব্যবস্থার ও অধিকারের মাদকতার ওপর তীব্র কটাক্ষপাত।

আদি বিষ্ণু

তরুণ উৎসাহী লেখকদের মধ্যে অল্প সময়েই যাঁরা খুব নাম করেছেন তাঁদের অন্যতম শ্রীআদি বিষ্ণু। ছাত্রসমাজে তাঁর গল্প বিশেষ সমাদৃত। আদি বিষ্ণুর রচনাশৈলী খুবই চিত্তাকর্ষক ও সুখপাঠ্য। ব্যঙ্গরস, হাস্যরস, ভাবরস আর পুরুষকার—সব মিলে এক অদ্ভুত রচনাশৈলীতে তিনি গল্প লেখেন। তাঁর গল্প কথা-প্রধান। নাট্যকার হিসাবেও এঁর খ্যাতি আছে। 'অতিথি', 'ইদি আত্মহত্যা' (এ আত্মহত্যা), 'মঞ্চুতের' (তুষারের স্তর) তাঁর নামকরা নাটক। কিছু ছোট নাটকও তিনি লিখেছেন।

মালতী চন্দূর

নামকরা এক তেলুগু সাপ্তাহিক পত্রিকায় মহিলাদের পাতায় ইনি নিয়মিত লেখেন। রান্না, সেলাই, কাটিং ও রঙ করা প্রভৃতি মেয়েদের উপযোগী লেখা ছাড়া পুস্তক-পরিচয়, ভ্রমণ-কাহিনী রম্যরচনা তিনি অতি সুন্দরভাবে সরল ভাষায় লেখেন। অনেক ভালো ভালো গল্পও লিখেছেন। এঁর লেখা 'বণ্টলু —পিণ্টিবণ্টলু' (রান্না), অল্লি কলু—কুট্লু' (বোনা ও সেলাই)' 'নবলা পরিচয়ালু' (উপন্যাস পরিচয়) প্রভৃতি বই হিসেবে প্রকাশিত।

তুরগা জানকী রাণী

শ্রীমতী জানকী রাণী গল্প লিখে স্বনামধন্যা হয়েছেন। এঁর 'গুলাবীলু' (লাল গোলাপ) তাঁর গল্পসংগ্রহ। তাঁর ভাষা খুবই সংযত। অনাবশ্যক ভাবালুতা তাঁর গল্পে স্থান পায় না।

বোম্মিরেডিড্ পল্লি সূর্য রাও

'কথাকাহিনী' ও 'সুবর্ণরেখলু' (সুবর্ণরেখা) সূর্য রাও-এর গল্প-সংগ্রহ। তাঁর গল্প আকারে ছোট হলেও তেলেগু-গল্পের সকল বৈশিষ্ট্যই এতে বিদ্যমান।

মার্ল চিরঞ্জীবী

শ্রীচিরঞ্জীবীর প্রতিভা বহুমুখী। ইনি কবি। একাধারে কাহিনীকার, নাট্যকার, শিশুসাহিত্যিক, প্রকাশক, সাংবাদিক ও ছায়াছবির গল্পলেখক। কোনোদিন কলেজের মুখ দেখেন নি। ইংরিজি এক-বর্ণও জানেন না। এঁর সমস্ত লেখা কুড়িটির বেশি সংকলন-গ্রন্থে প্রকাশিত।